উপক্রমণিকা

মহান দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র বসুর নামাঙ্কিত এই মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্মুক্ত শিক্ষাঙ্গনে আপনাকে স্বাগত। সম্প্রতি এই প্রতিষ্ঠান দেশের সর্বপ্রথম রাজ্য সরকারি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ন্যাক (NAAC) মূল্যায়নে 'এ' গ্রেড প্রাপ্ত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন প্রকাশিত নির্দেশনামায় স্নাতক শিক্ষাক্রমকে পাঁচটি পৃথক প্রকরণে বিন্যস্ত করার কথা বলা হয়েছে। এগুলি হল— 'কোর কোর্স', 'ডিসিপ্লিন স্পেসিফিক ইলেকটিভ', 'জেনেরিক ইলেকটিভ' এবং 'স্কিল'/'এবিলিটি এনহ্যান্সমেন্ট কোর্স'। ক্রেডিট পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে বিন্যস্ত এই পাঠক্রম শিক্ষার্থীর কাছে নির্বাচনাত্মক পাঠক্রমে পাঠ গ্রহণের সুবিধে এনে দেবে। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ষান্মাসিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা এবং ক্রেডিট ট্রান্সফারের সুযোগ। শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক এই ব্যবস্থা মূলত গ্রেড-ভিত্তিক যা অবিচ্ছিন্ন আভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সার্বিক মূল্যায়নের দিকে এগোবে এবং শিক্ষার্থীকে বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত সুবিধা দেবে। শিক্ষাক্রমের প্রসারিত পরিসরে বিবিধ বিষয় চয়নের সক্ষমতা শিক্ষার্থীকে দেশের অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আন্তঃব্যবস্থায় অর্জিত ক্রেডিট স্থানান্তরে সাহায্য করবে। শিক্ষার্থীর অভিযোজন ও পরিগ্রহণ ক্ষমতা অনুযায়ী পাঠক্রমের বিন্যাসই এই নতুন শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য।

'UGC (Open and Distance Learning programmes and Online Programmes Regulations, 2020' অনুযায়ী সকল উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্নাতক পাঠক্রমে এই সি.বি.সি.এস পাঠক্রম পদ্ধতি কার্যকরী করা বাধ্যতামূলক— উচ্চশিক্ষার পরিসরে এই পদ্ধতি এক বৈকল্পিক পরিবর্তনের সূচনা করেছে। আগামী ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষ থেকে স্নাতক স্তরে এই নির্বাচনভিত্তিক পাঠক্রম কার্যকরী করা হবে, এই মর্মে নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বর্তমান পাঠক্রমগুলি উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রের নির্ণায়ক কৃত্যকের যথাবিহিত প্রস্তাবনা ও নির্দেশাবলী অনুসারে রচিত ও বিন্যস্ত হয়েছে। বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে সেইসব দিকগুলির প্রতি যা ইউ.জি.সি কর্তৃক চিহ্নিত ও নির্দেশিত।

মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে স্ব-শিক্ষা পাঠ-উপকরণ শিক্ষার্থী-সহায়ক পরিষেবার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সি.বি.সি.এস. পাঠক্রমের এই পাঠ-উপকরণ মূলত বাংলা ও ইংরেজিতে লিখিত হয়েছে। শিক্ষার্থীদের সুবিধের কথা মাথায় রেখে আমরা ইংরেজি পাঠ-উপকরণের বাংলা অনুবাদের কাজেও এগিয়েছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ শিক্ষকরাই মূলত পাঠ-উপকরণ প্রস্তুতির ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন— যদিও পূর্বের মতোই অন্যান্য বিদ্যায়তনিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের সাহায্য আমরা অকুণ্ঠচিত্তে গ্রহণ করেছি। তাঁদের এই সাহায্য পাঠ-উপকরণের মানোন্নয়নে সহায়ক হবে বলেই আমার বিশ্বাস। নির্ভরযোগ্য ও মূল্যবান বিদ্যায়তনিক সাহায্যের জন্য আমি তাঁদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। এই পাঠ-উপকরণ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণ পদ্ধতি প্রকরণে নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। উন্মুক্ত শিক্ষাঙ্গনের পঠন প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত সকল শিক্ষকের সদর্থক ও গঠনমূলক মতামত আমাদের আরও সমৃদ্ধ করবে। মুক্ত শিক্ষাক্রমে উৎকর্ষের প্রশ্নে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

পাঠ-উপকরণ প্রস্তুতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই এবং এই উদ্যোগের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার

উপাচার্য

Netaji Subhas Open University

Under Graduate Degree Programme

Choice Based Credit System (CBCS)

(নির্বাচন ভিত্তিক মূল্যমান ব্যবস্থা)

বিষয়: সাম্মানিক অর্থনীতি

Subject: Honours in Economics (HEC)

পাঠক্রম: ব্যবসায় অর্থনীতি

(Business Economics)

GE-EC-11

Applicable for learners of HCO (Commerce)

First Print : August, 2021

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী এবং অর্থানুকূল্যে মুদ্রিত।

Printed in accordance with the regulations and financial assistance of the Distance Education Bureau of the University Grants Commission.

পরিচিতি

Under Graduate Degree Programme
Choice Based Credit System (CBCS)
(নির্বাচন ভিত্তিক মূল্যমান ব্যবস্থা)
বিষয়: সাম্মানিক অর্থনীতি
Subject: Honours in Economics (HEC)
পাঠক্রম: ব্যবসায় অর্থনীতি
(Business Economics)
GE-EC-11
Applicable for learners of HCO (Commerce)

: বিষয় সমিতি :
সদস্যবৃন্দ

ড. অনির্বাণ ঘোষ
Professor of Commerce
NSOU (Chairperson)

ড. উত্তম কুমার দত্ত
Professor of Commerce
NSOU

ড. সজল কুমার মাইতি
Professor of Commerce (PG Dept.)
Hooghly Mohsin College

ড. আশিষ কুমার সানা
Professor of Commerce
University of Calcutta

সি.এ. শুভায়ন বসু
Associate Professor
Ananda Mohan College

শ্রী সুদর্শন রায়
Associate Professor
NSOU

: রচনা :
ড. সেখ সেলিম
Associate Professor
NSOU

: সম্পাদনা :
ড. বিবেকানন্দ রায় চৌধুরী
Associate Professor
NSOU

: বিন্যাস সম্পাদনা :
প্রিয়ন্তী বাগচী

: রচনা :
শ্রী গোবিন্দ লাল মণ্ডল
Associate Professor of Mathematics
New Alipore College
(GE-EC-21)

: বিন্যাস সম্পাদনা :
শ্রী সুদর্শন রায়
NSOU
(GE-EC-21)

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনো অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনোভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

কিশোর সেনগুপ্ত
নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

ব্যবসায় অর্থনীতি

(Business Economics)

GE-EC-11

পর্যায় ১

একক ১ ❑ ব্যবসায় অর্থনীতি কী ও কেন 7

একক ২ ❑ ভোগকারীর আচরণ তত্ত্ব 16

একক ৩ ❑ চাহিদার নিয়ম 48

একক ৪ ❑ উৎপাদন তত্ত্ব 77

পর্যায় ২

একক ৫ ❑ ব্যয় তত্ত্ব 103

একক ৬ ❑ বাজার 121

একক ৭ ❑ বন্টন তত্ত্ব 163

একক ৮ ❑ সমষ্টিগত অর্থনীতির উপাদানসমূহ 195

ব্যবসায় গণিত
(Business Mathematics)
Course Code: GE-EC-21

পর্যায় ১

একক ১(ক)	অনুপাত (Ratio) ও সমানুপাত (Proportion)	239-268
একক ১(খ)	ভেদ (Variation)	269-281
একক ১(গ)	সূচকের -নিয়মাবলী ও করণী (Law of indices and surds)	282-301
একক ২	প্রগতি (Progression)	302-327
একক ৩	চক্রবৃদ্ধি সুদ (Compound Interest) এবং বার্ষিকী (Annuities)	328-340
একক ৪	সমীকরণ (Equation)	341-358

পর্যায় ২

একক ৫(ক)	বিন্যাস এবং সমবায় (Permulation and Combination)	359-368
একক ৫(খ)	দ্বিপদ উপপাদ্য (Binomial Theorem)	369-379
একক ৫(গ)	লগারিদম্ (Logarithm)	380-394
একক ৬	বাস্তব চলের ধারণা, অপেক্ষক, অপেক্ষকের লিমিট এবং সন্ততি (Functions, limit)	395-419
একক ৭	অবকলন ও অপেক্ষকের বিস্তৃতি (Differentiation)	420-441
একক ৮	অপেক্ষকের চরম মান, সমকলন এবং এর জ্যামিতিক তাৎপর্য (Extreme values of functions, integration and algebraic functions)	442-462

একক ১ ❑ ব্যবসায় অর্থনীতি কী ও কেন

গঠন

১.১ উদ্দেশ্য

১.২ প্রস্তাবনা

১.৩ অর্থনীতির সংজ্ঞা

১.৪ ব্যষ্টিগত অর্থনীতি ও সমষ্টিগত অর্থনীতি

১.৫ অর্থনীতির মৌল সমস্যাবলি

১.৬ ব্যবসায় অর্থনীতি : সংজ্ঞা ও প্রকৃতি

১.৭ ব্যবসায় অর্থনীতির আলোচনার পরিধি ও বিষয়বস্তু

১.৮ সারাংশ

১.৯ অনুশীলনী

১.১০ নির্বাচিত গ্রন্থতালিকা

১.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে শিক্ষার্থীরা জানতে পারবে

- অর্থনীতি বা অর্থশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়বস্তু
- কোনো দেশ বা অর্থনীতির মৌল সমস্যাবলি
- ব্যবসায় অর্থনীতির প্রকৃতি ও আলোচনার পরিধি

১.২ প্রস্তাবনা

ব্যবসায় অর্থনীতি (Business Economics) নামক এই পত্রে ব্যবসায়ের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন অর্থনৈতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে। ব্যবসায় অর্থনীতি যেহেতু অর্থনীতিরই একটি বিশেষ শাখা, সেজন্য আমাদের সর্বাগ্রে অর্থনীতি বা অর্থশাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞান থাকা দরকার। তাই এই এককের শুরুতে অর্থনীতির সংজ্ঞা ও আলোচ্য বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কোনো দেশের অর্থনীতির মৌল সমস্যাগুলি কী কী এবং অর্থশাস্ত্র সেগুলি কীভাবে সমাধানের চেষ্টা করে, তাও আমরা এই এককে

আলোচনা করব। এরপর, ব্যবসায় অর্থনীতির সংজ্ঞা, প্রকৃতি এবং আলোচনার পরিধি নিয়ে বিশ্লেষণ করা হবে।

১.৩ অর্থনীতির সংজ্ঞা

অর্থনীতি কথাটি দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রথমত, অর্থনীতি (Economy) বলতে কোনো দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক কাঠামো বা আর্থিক পরিস্থিতিকে বোঝায়। আবার, অর্থনীতি (Economics) বলতে অর্থনীতি শাস্ত্র বা অর্থশাস্ত্রকে বোঝায়। আমরা এখানে অর্থনীতি বলতে অর্থশাস্ত্রকেই বোঝাচ্ছি। বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ অর্থনীতির বা অর্থশাস্ত্রের সংজ্ঞা দেবার চেষ্টা করেছেন। যেমন, অর্থনীতি শাস্ত্রের জনক অ্যাডাম স্মিথ তাঁর বিখ্যাত Wealth of Nations (1776) বইয়ে বলেছেন : অর্থনীতি হল সম্পদের বিজ্ঞান (Economics is the science of wealth)। অধ্যাপক আলফ্রেড মার্শাল তাঁর বিখ্যাত বই Principles of Economics (1890)-এ অর্থনীতির একটি সংজ্ঞা দিয়েছেন। তাঁর মতে, যে শাস্ত্র মানুষের জীবনের দৈনন্দিন কাজকর্ম নিয়ে আলোচনা করে এবং বস্তুগত কল্যাণের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিগত ও সামাজিক কাজকর্ম নিয়ে বিশ্লেষণ করে, তাই হল অর্থনীতি।

অধ্যাপক লাওনেল রবিন্স তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ An Essay on the Nature of Economic Science (1932)-এ অর্থনীতির একটি সংজ্ঞা দিয়েছেন। তাঁর মতে, **যে বিজ্ঞান বিকল্প ব্যবহারযুক্ত সীমাবদ্ধ উপকরণকে অসংখ্য উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কীভাবে কাজে লাগানো যায় তা নিয়ে আলোচনা করে তাই হল অর্থনীতি।** (Economics is a science which studies human behaviour as a relationship between unlimited ends and scarce means which have alternative uses.)। রবিন্সের এই সংজ্ঞাকে অনেকেই সন্তোষজনক বলে মনে করেন। এই সংজ্ঞায় তিনটি বাস্তব অবস্থার উল্লেখ রয়েছে। **প্রথমত,** মানুষের অভাব সীমাহীন। একটি অভাব মিটলে আর একটি অভাব এসে পড়ে। **দ্বিতীয়ত,** উপকরণ সীমিত। তাই মানুষকে ঠিক করতে হয়, কোন্ অভাব আগে মেটানো দরকার, কোন্‌টি পরে মেটালেও চলবে। **তৃতীয়ত,** কোনো উপকরণের নানা বিকল্প ব্যবহার আছে। তাই উপকরণের সর্বোত্তম ব্যবহারের চেষ্টা করতে হয়। অর্থনীতি এই কাজটিই করে থাকে।

১.৪ ব্যষ্টিগত অর্থনীতি ও সমষ্টিগত অর্থনীতি

অর্থনীতির যাবতীয় আলোচ্য বিষয়বস্তুকে আমরা প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করতে পারি : ব্যষ্টিগত অর্থনীতি (Microeconomics) এবং সমষ্টিগত অর্থনীতি (Macroeconomics)। ইংরেজি Micro শব্দটি এসেছে গ্রিক শব্দ Mikros থেকে যার অর্থ ক্ষুদ্র। অর্থনীতির যে শাখা একক কোনো অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের বা সুনির্দিষ্ট সমজাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ বিশ্লেষণ করে তাকে ব্যষ্টিগত অর্থনীতি বলে। এই ব্যষ্টিগত অর্থনীতির প্রধান আলোচ্য বিষয়গুলি হল— ক্রেতা বা ভোগকারীর আচরণ, ফার্ম বা

উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের আচরণ, বাজারে ক্রেতা ও বিক্রেতার আচরণ, উৎপাদনের উপকরণের দাম নির্ধারণ, উৎপন্ন দ্রব্যের দাম নির্ধারণ প্রভৃতি। এক কথায়, ব্যষ্টিগত অর্থনীতির আলোচ্য বিষয় হল উৎপন্ন ও উপকরণের দাম নির্ধারণ সংক্রান্ত বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করা। তাই ব্যষ্টিগত অর্থনীতিকে দাম তত্ত্বও বলা হয়। অন্যদিকে, ইংরাজি Macro শব্দটি এসেছে গ্রিক শব্দ Makros থেকে যার অর্থ হল বৃহৎ। অর্থনীতির যে শাখা সমগ্র দেশের বা বৃহৎ সমাজের দিক থেকে অর্থ ব্যবস্থার বা অর্থনৈতিক সমস্যার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করে তাকে বলে সমষ্টিগত অর্থনীতি। এই সমষ্টিগত অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়গুলি হল সমগ্র দেশের বা দেশের কোনো অঞ্চলের জাতীয় আয় নির্ধারণ, মোট কর্মসংস্থান ও দামস্তর নির্ধারণ, ব্যাংক ব্যবস্থা ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বিশ্লেষণ, সরকারের আর্থিক নীতি ও উন্নয়ন পরিকল্পনা নির্ধারণ ইত্যাদি।

১.৫ অর্থনীতির মৌল সমস্যাবলি

অর্থনীতিবিদ স্যামুয়েলসন-এর মতে, কোনো দেশের মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা হল তিনটি :

(i) কোন্ কোন্ দ্রব্যসামগ্রী কত কত পরিমাণে উৎপাদন করা হবে (What to produce and how much to produce),

(ii) কীভাবে দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করা হবে (How to produce) এবং

(iii) কাদের জন্য দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করা হবে (For whom to produce)। প্রতিটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থাতেই এই তিনটি সমস্যার সমাধানেরর চেষ্টা করা হয়। আমরা জানি, বর্তমান পৃথিবীতে তিন ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দেখা যায় : ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বা ধনতন্ত্র (বা বাজার ব্যবস্থা), সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বা সমাজতন্ত্র (বা পরিকল্পিত ব্যবস্থা) এবং মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যা ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের মিশ্র রূপ। মিশ্র অর্থব্যবস্থা হল বাজার ব্যবস্থা ও পরিকল্পনার সহাবস্থান। এখন, এই তিন রকম অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় মৌলিক সমস্যা তিনটির কীভাবে সমাধান করা হয় তা দেখা যাক।

আমাদের প্রথম সমস্যা হ'ল, কোন্ কোন্ দ্রব্য কত পরিমাণে উৎপাদন করা হবে। আমরা জানি, উপকরণের পরিমাণ সীমিত। সুতরাং, এই সীমিত উপকরণকে বিভিন্ন বিকল্প দ্রব্য উৎপাদনে সর্বোত্তমভাবে ব্যবহার করতে হবে। সীমিত উপকরণের এই সর্বোত্তম বণ্টন ঘটানোই অর্থনীতির প্রথম মৌল সমস্যা। ধনতন্ত্রে দাম ব্যবস্থা বা বাজার ব্যবস্থার মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান করা হয়। অন্যদিকে, সমাজতন্ত্রে এই সমস্যার সমাধান করা হয় পরিকল্পনার মাধ্যমে। আর মিশ্র অর্থনীতিতে উপকরণের বণ্টন নির্ধারিত হয় কিছুটা পরিকল্পনার দ্বারা ও কিছুটা দাম ব্যবস্থার দ্বারা।

দ্বিতীয় সমস্যা হল, কোন্ পদ্ধতিতে দ্রব্যগুলি উৎপন্ন করা হবে। এক এক রকমের উৎপাদন পদ্ধতিতে উপকরণ নিয়োগের পরিমাণ এক এক রকমের হবে। কোনো একটি দেশ কোন্ উৎপাদন পদ্ধতি নির্বাচন

করবে তা সেই দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ, জনসংখ্যা, মূলধনের পরিমাণ, প্রযুক্তি প্রভৃতি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। এই বিষয়গুলি বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকমের। তাই সর্বোত্তম উৎপাদন পদ্ধতির নির্বাচন বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। ধনতন্ত্রে ব্যক্তিগত উৎপাদকেরাই উৎপাদন পদ্ধতি নির্বাচন করে থাকে। সমাজতন্ত্রে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ। আর মিশ্র অর্থনীতিতে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ এবং ব্যক্তিগত উদ্যোক্তা উভয়েই।

কোনো অর্থনীতির তৃতীয় মৌলিক সমস্যা হল, কাদের জন্য দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করা হবে অর্থাৎ উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রী কে বা কারা ভোগ করবে তা স্থির করা। ব্যক্তির ভোগ তার ক্রয়ক্ষমতা বা আয়ের উপর নির্ভর করে। আবার, ব্যক্তি আয় করে উৎপাদনের উপকরণ জোগান দিয়ে। সুতরাং, আয় বণ্টনের সাথে উপকরণের মালিকানার প্রশ্নটি জড়িত। ধনতন্ত্রে উৎপাদনের উপকরণের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালিকানা থাকে যেখানে উপকরণের দাম বাজারের শক্তির দ্বারা নির্ধারিত হয়। সমাজতন্ত্রে আয় বণ্টনের ধরন নির্ধারণ করে পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ। মিশ্র অর্থনীতিতে আয় বণ্টনে পরিকল্পনা ও বাজার উভয়েরই ভূমিকা থাকে।

১.৬ ব্যবসায় অর্থনীতি : সংজ্ঞা ও প্রকৃতি

অর্থনীতির যে শাখা ব্যবসায়ের বাস্তব সমস্যাবলির সমাধানের উদ্দেশ্যে অর্থনীতির তত্ত্ব, যুক্তি ও বিশ্লেষণ প্রয়োগ করে তাকে ব্যবসায় অর্থনীতি বলে। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপকদের উৎপাদন, ক্রয়, বিক্রয় প্রভৃতি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে ব্যবসায় অর্থনীতি সাহায্য করে। তাই ব্যবসায় অর্থনীতিকে ব্যবস্থাপনা অর্থনীতি (Managerial Economics)ও বলা হয়। বস্তুতপক্ষে, ব্যবস্থাপনা অর্থনীতি বা Managerial Economics নামটিই বেশি প্রচলিত।

ব্যবসায় অর্থনীতির সংজ্ঞা থেকেই ব্যবসায় অর্থনীতির প্রকৃতি বা প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি জানা যায়। সংক্ষেপে এই বৈশিষ্ট্যগুলো হ'ল :

1. ব্যবসায় অর্থনীতি হল অর্থনীতি শাস্ত্রেরই একটি শাখা।

2. ব্যবসায় অর্থনীতি লক্ষ্যভিত্তিক কেননা ইহা ব্যবসায়ের কিছু নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে পরামর্শ দেয়। সুতরাং, একে পরামর্শপ্রদায়ীও (prescriptive) বলা যেতে পারে।

3. ব্যবসায় অর্থনীতি মূলত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বা ফার্মের নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে। ব্যষ্টিগত অর্থনীতিই ফার্ম বা উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে। সুতরাং ব্যবসায় অর্থনীতি মূলত ব্যষ্টিগত অর্থনীতি।

4. মূলত ব্যষ্টিগত অর্থনীতি হলেও ব্যবসায় অর্থনীতি সমষ্টিগত অর্থনীতিরও কিছু বিষয় আলোচনা করে। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে পরামর্শ দিতে গেলে দেশের সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থা, দামস্তর, বাণিজ্যচক্র,

সরকারের আর্থিক ও রাজস্ব নীতি প্রভৃতি সম্পর্কেও জানতে হয়। এগুলি সমষ্টিগত অর্থনীতির বিষয়। তাই ব্যবসায় অর্থনীতি কিছুটা সমষ্টিগত অর্থনীতিও বটে।

5. ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য পূরণের জন্য কী করা উচিৎ যে সম্পর্কে ব্যবসায় অর্থনীতি পরামর্শ দেয়। যে অর্থনৈতিক তত্ত্ব কী করা উচিত এবং কী করা উচিৎ নয় তা আলোচনা করে, তাকে আদর্শনিষ্ঠ অর্থনীতি বলে। সুতরাং, ব্যবসায় অর্থনীতি হল আদর্শনিষ্ঠ অর্থনীতি (Normative economics)।

6. ব্যবসায় অর্থনীতি ব্যবসায়ের বাস্তব সমস্যাবলি নিয়ে আলোচনা করে। সুতরাং এটি প্রায়োগিক (pragmatic) এবং ফলিত বা ব্যবহারিক (applied) বিজ্ঞান।

7. ব্যবসায় অর্থনীতি মূলত পরিমাপভিত্তিক (metrical)। সাধারণত পরিমাপযোগ্য ধারণাগুলিই ব্যবসায় অর্থনীতিতে ব্যবহার করা হয়।

8. ব্যবসায় অর্থনীতি একটি পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত (interdisciplinary) বিষয়। এর অর্থ হল ব্যবসায় অর্থনীতি যেমন একদিকে বিশুদ্ধ অর্থনীতির তত্ত্ব ও ধারণা ব্যবহার করে, অন্যদিকে তেমনি গণিত, হিসাবশাস্ত্র, রাশিবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের নানা ধারণার সাহায্য নিয়ে থাকে।

১.৭ ব্যবসায় অর্থনীতির আলোচনার পরিধি ও বিষয়বস্তু

ব্যবসায় অর্থনীতির প্রধান কাজ হল ফার্ম বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করা। এটি করতে হলে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সমস্যাগুলিকে বুঝতে হবে এবং সেগুলির সমাধানের উপায় নির্দেশ করতে হবে। তাই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বা ফার্মের সমস্যাগুলির বিশ্লেষণ ও সমাধান করাই হল ব্যবসায় অর্থনীতির প্রধান আলোচ্য বিষয়।

এখন, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সমস্যাগুলিকে দু'ভাগে ভাগ করা যায় : অভ্যন্তরীণ সমস্যা ও বাহ্যিক সমস্যা। ফার্ম কোনো দ্রব্য কতটা, কীভাবে, কখন উৎপাদন করবে, কাঁচামাল কোথা থেকে সংগ্রহ করবে, কী দামে উৎপন্ন দ্রব্য কতটা বিক্রি করবে এবং কতটা মজুত করবে ইত্যাদি হ'ল ফার্মের অভ্যন্তরীণ সমস্যা। এই সমস্যাগুলির সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নরূপ :

1. চাহিদার পূর্বানুমান ও বিশ্লেষণ

2. ফার্মের উৎপাদন ও ব্যয় বিশ্লেষণ

3. ফার্মের বিকল্প লক্ষ্যসমূহ

4. বাজারের তত্ত্ব

5. মুনাফা তত্ত্ব

6. উপাদানের দাম নিরূপণ তত্ত্ব এবং

7. বিনিয়োগ ও মূলধন বাজেটিং।

এগুলি ফার্মের অভ্যন্তরীণ বিষয়। এই বিষয়গুলি ব্যষ্টিগত অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়। ব্যবসায় অর্থনীতি এই বিষয়গুলি আলোচনা করে থাকে। তবে কোনো ফার্ম শূন্যে বিরাজ করে না। ফার্ম যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশে কাজ করে, সেই পরিবেশ থেকেও নানা বাহ্যিক সমস্যা উদ্ভূত হয়। তাই ফার্মের বাহ্যিক পরিবেশ নিয়েও ব্যবসায় অর্থনীতিকে আলোচনা করতে হয়। সেই বাহ্যিক বিষয়গুলির সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নরূপ :

1. দেশের আয় ও কর্মসংস্থান

2. অর্থের জোগান ও দামস্তর

3. সরকারের আর্থিক ও রাজস্ব নীতি,

4. সরকারের বৈদেশিক বাণিজ্য নীতি,

5. সরকারের শিল্পনীতি

6. টাকার ও মূলধনের বাজার প্রভৃতি।

এই বিষয়গুলি সমষ্টিগত অর্থনীতির অন্তর্ভুক্ত। ফার্মের বাহ্যিক সমস্যা নিয়ে আলোচনার জন্য ব্যবসায় অর্থনীতি এই বিষয়গুলিও আলোচনা করে। সুতরাং, ব্যবসায় অর্থনীতি আংশিক ব্যষ্টিগত অর্থনীতি এবং আংশিক সমষ্টিগত অর্থনীতি।

এখন, ব্যবসায় অর্থনীতির কাজ হল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করা। সুতরাং সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিভিন্ন হাতিয়ার ও কৌশল নিয়েও ব্যবসায় অর্থনীতি আলোচনা করে। সেই হাতিয়ারগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ ল : (ক) সরলরৈখিক প্রোগ্রামিং, (খ) ক্রীড়া তত্ত্ব (গ) সম্ভাবনা তত্ত্ব (ঘ) ব্যয়-পরিমাণ মুনাফা বিশ্লেষণ (Cost-Volume Profit Analysis বা CVP Analysis) (ঙ) মজুত বহন তত্ত্ব প্রভৃতি। এছাড়া, গণিতশাস্ত্র, রাশিবিজ্ঞান, সিদ্ধান্তগ্রহণ তত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ের নানা ধারণা ব্যবসায় অর্থনীতি ব্যবহার করে থাকে। তাই ব্যবসায় অর্থনীতিকে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত (interdisciplinary) বিষয় বলা হয়। বস্তুত, এটি একটি অপেক্ষাকৃত নতুন বিষয়। তা সত্ত্বেও ব্যবসায় অর্থনীতির আলোচনার পরিধি বেশ ব্যাপক। বিগত কয়েক দশকে ব্যবসায় অর্থনীতি বিষয়টি গড়ে উঠেছে এবং এর আলোচনার পরিধি দিন দিন প্রসারিত হচ্ছে।

১.৮ সারাংশ

১. অর্থনীতির সংজ্ঞা (Definition of Economics) : অর্থনীতি সম্পর্কিত বিভিন্ন সংজ্ঞার মধ্যে রবিন্স প্রদত্ত সংজ্ঞাটিই সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য। রবিন্সের মতে, যে বিজ্ঞান বিকল্প ব্যবহারসম্পন্ন সীমাবদ্ধ উপকরণকে অসংখ্য উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কীভাবে কাজে লাগানো যায় তা নিয়ে আলোচনা করে তাই হল অর্থনীতি।

২. ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত অর্থনীতি (Microeconomics and Macroeconomics) : অর্থনীতির বিষয়বস্তুকে আমরা প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করে থাকি : ব্যষ্টিগত অর্থনীতি ও সমষ্টিগত অর্থনীতি। অর্থনীতির যে শাখা একক কোনো অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের বা সমজাতীয় অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা কাজ করে তাকে ব্যষ্টিগত অর্থনীতি বলে। অন্যদিকে, অর্থনীতির যে শাখা সমগ্র দেশের বা সমগ্র অর্থনীতির দিক থেকে অর্থব্যবস্থার বিশ্লেষণ করে তাকে বলে সমষ্টিগত অর্থনীতি।

৩. অর্থনীতির মৌল সমস্যাবলি (Basic Problems of an Economy) : স্যামুয়েলসন-এর মতে, প্রত্যেক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মৌলিক সমস্যাবলি তিনটি : (i) কোন্ কোন্ দ্রব্যসামগ্রী কত পরিমাণে উৎপাদন করা হবে (ii) কীভাবে উৎপাদন করা হবে এবং (iii) কাদের জন্য উৎপাদন করা হবে।

৪. ব্যবসায় অর্থনীতি : সংজ্ঞা ও প্রকৃতি (Business Economics : Definition and Nature) : ব্যবসায়ের বাস্তব সমস্যাবলির সমাধানের উদ্দেশ্যে অর্থনীতির যে শাখা অর্থনীতির তত্ত্ব, যুক্তি ও বিশ্লেষণ প্রয়োগ করে তাকে ব্যবসায় অর্থনীতি বলে। ইহা ব্যবস্থাপনা অর্থনীতি নামে সমধিক পরিচিত। ব্যবসায় অর্থনীতির মূল বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ : (i) ইহা অর্থনীতিরই একটা অংশ। (ii) ইহা অংশত ব্যষ্টিগত ও অংশত সমষ্টিগত অর্থনীতি। (iii) ইহা লক্ষ্যভিত্তিক এবং পরামর্শপ্রদায়ী। (iv) ইহা আদর্শনিষ্ঠ অর্থনীতি। (v) ইহা ফলিত বিজ্ঞান। (vi) ইহা মূলত পরিমাপভিত্তিক। (vii) ব্যবসায় অর্থনীতি একটি পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত বিষয়।

৫. ব্যবসায় অর্থনীতির আলোচনার পরিধি ও বিষয়বস্তু (Scope and Subjectmatter of Business Economics) : ব্যষ্টিগত অর্থনীতি হিসাবে ব্যবসায় অর্থনীতি যে সমস্ত বিষয় আলোচনা করে সেগুলি হল : চাহিদা বিশ্লেষণ, উৎপাদন ও ব্যয় বিশ্লেষণ, ফার্মের লক্ষ্য, বাজারের তত্ত্ব, উপাদানের দাম নিরূপণ, বিনিয়োগ ও মূলধন বাজেটিং প্রভৃতি। সমষ্টিগত অর্থনীতি হিসাবে ব্যবসায় অর্থনীতি যে সমস্ত বিষয় আলোচনা করে সেগুলি হল : দেশের আয় ও কর্মসংস্থান, অর্থ ও দামস্তর, সরকারের আর্থিক ও রাজস্ব নীতি, বৈদেশিক বাণিজ্য নীতি প্রভৃতি। এছাড়া, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণের কয়েকটি হাতিয়ার নিয়েও ব্যবসায় অর্থনীতি আলোচনা করে। সেগুলি হল : সরলরৈখিক প্রোগ্রামিং, ক্রীড়া তত্ত্ব, সিদ্ধান্ত গ্রহণ তত্ত্ব, মজুত বহন তত্ত্ব প্রভৃতি।

১.৯ অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্নাবলি : প্রতিটি দুই নম্বরের। (Short Answer Type Questions : Each of 2 Marks)

১. অর্থশাস্ত্রের জনক কে? তাঁর বিখ্যাত বইয়ের নাম কী?

২. অ্যাডাম স্মিথ প্রদত্ত অর্থনীতির সংজ্ঞাটি কী?

৩. মার্শালের বিখ্যাত বইয়ের নাম কী? এটি কোন্ সালে প্রকাশিত হয়?

৪. অধ্যাপক মার্শাল কীভাবে অর্থনীতির সংজ্ঞা দিয়েছেন?

৫. অধ্যাপক রবিন্স প্রদত্ত অর্থনীতির সংজ্ঞাটি উল্লেখ করুন।

৬. অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়বস্তুকে কয় ভাগে ভাগ করা যায় ও কী কী?

৭. ব্যষ্টিগত অর্থনীতি কাকে বলে?

৮. সমষ্টিগত অর্থনীতি কাকে বলে?

৯. ব্যবসায় অর্থনীতির সংজ্ঞা দাও।

১০. ব্যবসায় অর্থনীতিকে আদর্শনিষ্ঠ অর্থনীতি বলা হয় কেন?

মাঝারি দৈর্ঘ্যের উত্তরের প্রশ্নাবলি : প্রতিটি ৫ নম্বরের। (Medium Answer Type Questions : Each of 5 Marks)

১. ব্যষ্টিগত অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়বস্তুগুলি উল্লেখ করুন।

২. সমষ্টিগত অর্থনীতির প্রধান আলোচ্য বিষয়গুলি উল্লেখ করুন।

৩. প্রত্যেক অর্থনীতির মৌলিক সমস্যাবলি কী কী?

৪. ব্যবসায় অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করুন।

দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্নাবলি : প্রতিটি ১০ নম্বরের। (Long Answer Type Questions : Each of 10 Marks)

১. অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়বস্তুগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

২. ব্যবসায় অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়বস্তু ও পরিধি ব্যাখ্যা করুন।

১.১০ নির্বাচিত গ্রন্থতালিকা

১. সরখেল, জয়দেব (১৯৯৮) : আধুনিক অর্থনীতির ভূমিকা, বুক সিণ্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড।

২. Samuelson, P.A. and William Nordhaus (1985) : Economics, McGraw Hill.

৩. সরখেল, জয়দেব ও সেখ সেলিম (২০১৫) : ব্যবসায় অর্থনীতি ও ভারতের আর্থিক ব্যবস্থা, বুক সিণ্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড।

৪. Stonier, A.W. & D.C. Hague (1957) : A Text Book of Economic Theory, Orient Longman.

৫. Ahuja, H.L. (1979) : Advanced Economic Theory, S. Chand & Co.

একক ২ ❑ ভোগকারীর আচরণ তত্ত্ব

গঠন

২.১ উদ্দেশ্য

২.২ প্রস্তাবনা

২.৩ মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগ

২.৩.১ মার্শালের ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগের বিধি বা নিয়ম

২.৩.২ নিয়মটির সীমাবদ্ধতা

২.৪ মার্শালের তত্ত্বে ভোগকারীর ভারসাম্য ও আচরণের ব্যাখ্যা

২.৪.১ মার্শালের তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা

২.৫ ভোগকারীর উদ্বৃত্তের ধারণা ও তার সীমাবদ্ধতা

২.৬ ভোগকারীর আচরণ সম্পর্কে হিক্স-এর তত্ত্ব

২.৬.১ নিরপেক্ষ রেখা ও নিরপেক্ষ মানচিত্র

২.৬.২ নিরপেক্ষ রেখার বৈশিষ্ট্যসমূহ ও সেগুলির প্রমাণ

২.৬.৩ সম্পূর্ণ পরিবর্ত ও সম্পূর্ণ পরিপূরক দ্রব্যের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ রেখার আকৃতি

২.৭ বাজেট রেখা (বা দাম রেখা) ও তার বৈশিষ্ট্য

২.৮ নিরপেক্ষ রেখা তত্ত্বে ভোগকারীর ভারসাম্য

২.৮.১ কয়েকটি বিশেষ অবস্থায় ভোগকারীর ভারসাম্য

২.৯ নিরপেক্ষ রেখা তত্ত্বের সাহায্যে ভোগকারীর আচরণের বা চাহিদার নিয়মের ব্যাখ্যা

২.৯.১ দাম ভোগ রেখা ও দাম প্রভাব

২.৯.২ আয় ভোগ রেখা ও আয় প্রভাব

২.৯.৩ পরিবর্ত প্রভাব

২.৯.৪ আয় প্রভাব ও পরিবর্ত প্রভাবের সমষ্টি হিসাবে দাম প্রভাব বা হিক্স কর্তৃক চাহিদার নিয়মের ব্যাখ্যা

২.৯.৫ নিকৃষ্ট দ্রব্য ও গিফেন দ্রব্য

২.১০ দাম ভোগ রেখা থেকে চাহিদা রেখা অঙ্কন

২.১১ সারাংশ

২.১২ অনুশীলনী

২.১৩ নির্বাচিত গ্রন্থাবলি

২.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারবে

- মোট ও প্রান্তিক উপযোগের ধারণা
- ভোগকারীর আচরণ সম্পর্কে মার্শালের ব্যাখ্যা
- ভোগকারীর উদ্বৃত্তের ধারণা
- নিরপেক্ষ রেখা ও বাজেট লাইনের সাহায্যে ভোগকারীর ভারসাম্য
- ভোগকারীর আচরণ সম্পর্কে হিক্স-এর ব্যাখ্যা।

২.২ প্রস্তাবনা

কোনো দ্রব্যের দাম কমলে ওই দ্রব্যের ভোগকারী সাধারণত দ্রব্যটির বেশি পরিমাণ কিনতে চায়। এটি ভোগকারীর সাধারণ আচরণ। কেন ভোগকারী এরূপ আচরণ করে থাকে, তার বিভিন্ন ব্যাখ্যা বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ দিয়েছেন। এই ব্যাখ্যা বা তত্ত্বগুলির মধ্যে সবচেয়ে পুরনো অথচ রীতিবদ্ধ (systematic) তত্ত্ব দিয়েছেন অধ্যাপক আলফ্রেড মার্শাল। তাঁর তত্ত্বের নাম হল প্রান্তিক উপযোগিতা তত্ত্ব। মার্শালের তত্ত্বের অবশ্য কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। সেই সীমাবদ্ধতাগুলি উল্লেখ করে অধ্যাপক জন হিক্স ভোগকারীর আচরণ ব্যাখ্যা করার জন্য অপর একটি তত্ত্বের অবতারণা করেন। তাঁর তত্ত্বের নাম হল নিরপেক্ষ রেখা তত্ত্ব। বর্তমান এককে আমরা মার্শাল-এর প্রান্তিক উপযোগিতা তত্ত্ব (Marginnal Utility Analysis) এবং হিক্স-এর নিরপেক্ষ রেখা তত্ত্ব (Indifference Curve Theory) আলোচনা করব।

২.৩ মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগ

ভোগকারীর আচরণ সম্পর্কে মার্শালের তত্ত্বে দুটি কেন্দ্রীয় ধারণা হল মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগ।

কোনো দ্রব্যের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ভোগ করে ক্রেতা যে পরিমাণ উপযোগ বা উপযোগিতা পায় তাকেই মোট উপযোগ বা মোট উপযোগিতা বলে। অন্যদিকে, কোনো দ্রব্যের অতিরিক্ত এক ইউনিট ভোগ করলে মোট উপযোগের পরিমাণে যে পরিবর্তন ঘটে, তাকেই প্রান্তিক উপযোগ বা প্রান্তিক উপযোগিতা বলে। এই প্রান্তিক উপযোগিতা ঋণাত্মক, শূন্য অথবা ধনাত্মক হতে পারে। কোনো দ্রব্যের ভোগ এক একক বাড়ালে যদি ভোগকারীর মোট উপযোগিতা বাড়ে, তাহলে দ্রব্যটির প্রান্তিক উপযোগ ধনাত্মক। যদি মোট উপযোগ অপরিবর্তিত থাকে, তাহলে প্রান্তিক উপযোগিতা শূন্য হবে। আবার, দ্রব্যটির ভোগ এক একক বাড়ালে যদি ভোগকারীর মোট উপযোগিতার পরিমাণ কমে যায়, তাহলে প্রান্তিক উপযোগ ঋণাত্মক। মার্শালের মতে, কোনো দ্রব্যের ভোগ বাড়ালে সেই দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ ক্রেতার বা ভোগকারীর নিকট ক্রমাগত কমতে থাকে। একেই ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযেগের নিয়ম বা বিধি বলে। আমরা এই নিয়মটি নিয়ে এবার আলোচনা করব।

২.৩.১ মার্শালের ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি বা নিয়ম

ক্রেতা বা ভোগকারীর আচরণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মার্শাল ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি বা নিয়মের অবতারণা করেন। এই নিয়মটির মূল কথা হল, ভোগকারী যদি কোনো দ্রব্যের ভোগ ক্রমাগত বাড়ায়, তাহলে ঐ দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ ক্রমাগত কমতে থাকবে অর্থাৎ মোট উপযোগ বাড়বে বটে কিন্তু ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়বে। নিম্নলিখিত অনুমানের সাপেক্ষে বিধিটি কার্যকরী হবে :

(i) উপযোগিতা একটি সংখ্যাবাচক বিষয়।

(ii) কোনো দ্রব্য থেকে প্রাপ্ত উপযোগ কেবলমাত্র সেই দ্রব্যের ভোগের পরিমাণের উপর নির্ভর করে।

(iii) ক্রেতার আচরণ স্বাভাবিক ও যুক্তিসিদ্ধ।

(iv) ক্রেতার রুচি ও পছন্দ অপরিবর্তিত থাকছে।

সারণি ২.১

দ্রব্যের ইউনিট	মোট উপযোগ (টাকায়)	প্রান্তিক উপযোগ (টাকায়)
১	১০	১০
২	১৮	৮
৩	২২	৪
৪	২৪	২
৫	২৪	০
৬	২২	–২

ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি ব্যাখ্যা করার জন্য আমরা একটা উদাহরণ দিচ্ছি (সারণি ২.১)। আমরা অনুমান করছি যে, মোট উপযোগ (TU) ও প্রান্তিক উপযোগ (MU)-কে টাকার অঙ্কে পরিমাপ করা যায়। আমাদের তালিকায় দেখছি যে, দ্রব্যটির ভোগের ইউনিট যত বাড়ছে, TU প্রথমে বাড়ছে, সর্বোচ্চ অবস্থায় পৌঁছাচ্ছে এবং তারপর কমছে। এখন, প্রান্তিক উপযোগিতা (MU) হল, কোনো দ্রব্যের ভোগ এক একক বৃদ্ধি পেলে মোট উপযোগিতার যা পরিবর্তন ঘটে। আমরা দেখছি, প্রান্তিক উপযোগ বা MU ক্রমাগত কমছে। যখন TU বা মোট উপযোগ সর্বাধিক, MU = 0। এরপর TU কমলে MU ঋণাত্মক হচ্ছে। আমাদের উদাহরণটি ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি বা নিয়ম প্রকাশ করছে।

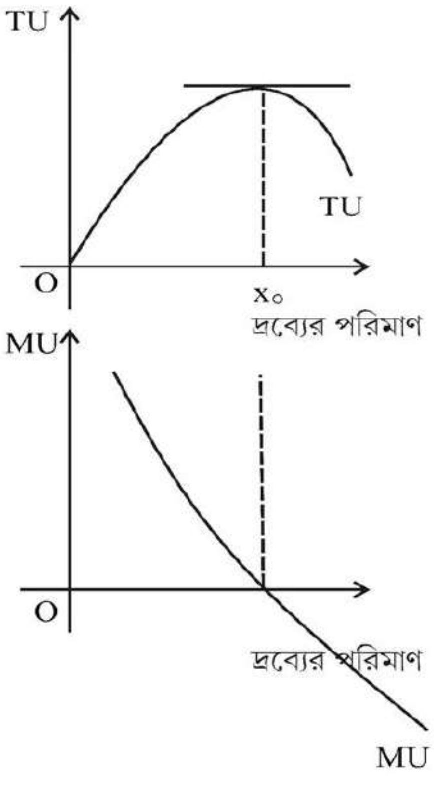

চিত্র ২.১

আমরা মোট ও প্রান্তিক উপযোগের মধ্যে সম্পর্ক একটি রেখাচিত্রের মাধ্যমে দেখাতে পারি (চিত্র ২.১)। আমরা দেখছি যে, মোট উপযোগিতা প্রথমে বাড়ে, সর্বাধিক হয় এবং তারপর কমে। অর্থাৎ মোট উপযোগিতা (TU) রেখা দ্রব্যের অক্ষের বা অনুভূমিক অক্ষের দিকে অবতল হবে। এখন, মোট উপযোগিতা রেখার উপর কোনো বিন্দুতে ওই রেখার ঢালই প্রান্তিক উপযোগিতার পরিমাণ। চিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে, যত দ্রব্যের ভোগের পরিমাণ বাড়ছে, TU রেখার ঢাল কমছে অর্থাৎ MU ক্রমাগত কমছে। যখন দ্রব্যের পরিমাণ Ox_0, তখন TU রেখার

ঢাল বা MU শূন্য হবে। দ্রব্যের ভোগ Ox_0 অপেক্ষা বেশি হলে TU রেখার ঢাল ঋণাত্মক অর্থাৎ MU ঋণাত্মক। দেখা যাচ্ছে, যত x দ্রব্যটির ভোগের পরিমাণ বাড়ছে, এর MU কমছে অর্থাৎ MU ক্রমহ্রাসমান হয়েছে।

২.৩.২ নিয়মটির সীমাবদ্ধতা

ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিটির কয়েকটি সীমাবদ্ধতা আছে। এই বিধিটি কয়েকটি শর্তাধীনে প্রযোজ্য হবে। সেগুলি নিম্নরূপ :

(i) ক্রেতার রুচি ও পছন্দ অপরিবর্তিত থাকতে হবে।

(ii) দ্রব্যটি একই সময়ে ভোগ করা হলে তবেই বিধিটি কার্যকর হবে।

(iii) নেশার দ্রব্যের ক্ষেত্রে বিধিটি কার্যকর নাও হতে পারে।

(iv) কোনো দ্রব্যের MU প্রথম দিকে বাড়তে পারে এবং ভোগের একটা স্তর পার হয়ে গেলে তারপর MU কমতে পারে।

২.৪ মার্শালের তত্ত্বে ভোগকারীর ভারসাম্য ও আচরণের ব্যাখ্যা

কোনো দ্রব্যের দাম কমলে ভোগকারী সাধারণত দ্রব্যটি বেশি কেনে। এটি ভোগকারীর আচরণ বা চাহিদার নিয়ম। মার্শাল ভোগকারীর এই আচরণ ব্যাখ্যা করার যে তত্ত্বের অবতারণা করেছেন তার নাম হল প্রান্তিক উপযোগিতা বিশ্লেষণ। এই তত্ত্বের সাহায্যে ভোগকারীর আচরণ বা চাহিদার নিয়ম ব্যাখ্যা করার জন্য আমরা প্রথমে ক্রেতার ভারসাম্য অবস্থা নির্ণয় করব এবং তারপর চাহিদার নিয়ম ব্যাখ্যা করব। মার্শালের প্রান্তিক উপযোগিতার তত্ত্বটি কয়েকটি অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত। সেগুলি সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

(i) উপযোগিতা একটি সংখ্যাবাচক বিষয়। একে সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করা যায়।

(ii) উপযোগ অপেক্ষকগুলি স্বাধীন। এর অর্থ হ'ল, কোনো দ্রব্য থেকে প্রাপ্ত উপযোগ কেবলমাত্র সেই দ্রব্যের ভোগের পরিমাণের উপর নির্ভর করে, অন্য দ্রব্যের ভোগের পরিমাণের উপর নির্ভর করে না।

(iii) ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি কাজ করছে। এর অর্থ হল, ভোগকারী যদি কোনো দ্রব্যের ভোগের পরিমাণ ক্রমাগত বাড়ায় তাহলে ক্রেতার নিকট সেই দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ ক্রমাগত কমতে থাকবে। অর্থাৎ মোট উপযোগ বাড়বে বটে, তবে কম কম হারে বাড়বে।

(iv) টাকার প্রান্তিক উপযোগিতা স্থির থাকে (constant)।

(v) দ্রব্যের দাম ও ক্রেতার আয় জানা আছে।

(vi) ক্রেতার আচরণ স্বাভাবিক। তার লক্ষ্য হল নিট উপযোগ সর্বাধিক করা।

(vii) দ্রব্যের উপযোগিতাকে টাকার অঙ্কে পরিমাপ করা যায়।

এখন, ভোগকারী সেই বিন্দুতে ভারসাম্যে থাকবে যেখানে নিট উপযোগিতা সর্বাধিক। নিট উপযোগিতা সর্বাধিক করার প্রথম ক্রমের শর্তটি হল : MU = দাম (P)। যদি MU > P হয়, তাহলে ভোগকারী ঐ দ্রব্যের ক্রয়ের পরিমাণ বাড়াবে। যদি MU < P হয়, তাহলে ভোগকারী ওই দ্রব্যের ক্রয়ের পরিমাণ কমাবে। সুতরাং ভোগকারীর ভারসাম্যর শর্ত হল : MU = P। এটি ভারসাম্যর প্রয়োজনীয় বা প্রথম ক্রমের শর্ত। ভারসাম্যর দ্বিতীয় বা পর্যাপ্ত শর্তটি হল : MU ক্রমহ্রাসমান হতে হবে অর্থাৎ MU রেখাকে নিম্নমুখী হতে হবে।

2.2 নং চিত্রে আমরা ভোগকারীর ভারসাম্য দেখিয়েছি। আমরা অনুভূমিক অক্ষে দ্রব্যের পরিমাণ (x) এবং উল্লম্ব অক্ষে প্রান্তিক উপযোগিতা (MU) এবং দাম (P) পরিমাপ করছি। এখন, মনে করি, দ্রব্যের দাম OP_0। তাহলে MU = P এই শর্ত পূরণ হয়েছে A বিন্দুতে। আর MU রেখা ওই বিন্দুতে নিম্নমুখী। তাহলে A বিন্দু হল ভারসাম্য বিন্দু। ক্রেতা OP_0 দামে দ্রব্যটি Ox_0 পরিমাণ ক্রয় করবে।

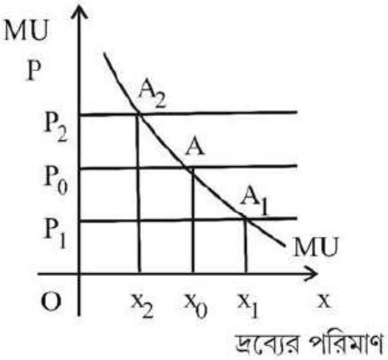

চিত্র ২.২

এখন, দ্রব্যটির চাহিদার উপর দাম পরিবর্তনের প্রভাব কেমন হয় তা দেখা যাক। মনে করি, দ্রব্যটির দাম OP_0 থেকে কমে OP_1 হল। তাহলে MU = P এই শর্ত এখন পূরণ হবে A_1 বিন্দুতে। সুতরাং A_1 হল নতুন ভারসাম্য বিন্দু। তখন ভোগকারীর চাহিদা বেড়ে Ox_1 হবে অর্থাৎ দাম কমলে সে বেশি কিনছে। তেমনি, দাম বেড়ে OP_2 হলে MU = P এই শর্ত পূরণ হচ্ছে A_2 বিন্দুতে। সুতরাং A_2 হল নতুন ভারসাম্য বিন্দু। ভোগকারী তখন দ্রব্যটি Ox_2 পরিমাণ ক্রয় করবে অর্থাৎ দাম বাড়লে দ্রব্যটির চাহিদা কমছে। এভাবে, দাম কমলে চাহিদা বাড়ছে এবং দাম বাড়লে চাহিদা কমছে। মার্শাল এভাবে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগিতার নিয়মের দ্বারা চাহিদার নিয়মকে ব্যাখ্যা করেছেন। মার্শালের যুক্তি হল, কোনো দ্রব্যের ভোগ বাড়ালে ঐ দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগিতা ভোগকারীর কাছে কমে যায়। সুতরাং, ভোগকারী বাড়তি ইউনিট কিনবে যদি তাকে কম দাম দিতে হয়। অর্থাৎ দাম কমলে তবেই চাহিদা বাড়বে। তেমনি, বিপরীত ক্ষেত্রে, দাম বাড়লে চাহিদা কমবে। মার্শাল এভাবেই ভোগকারীর আচরণ বা চাহিদার নিয়মকে ব্যাখ্যা করেছেন।

২.৪.১ মার্শালের তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা

মার্শালের তত্ত্বের কয়েকটি সীমাবদ্ধতা আছে। সংক্ষেপে সেগুলি হ'ল :

(i) এই তত্ত্বে ধরা হয় যে, উপযোগ সংখ্যা দ্বারা পরিমাপ করা যায়। কিন্তু উপযোগ একটি মানসিক বিষয়। একে সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। (ii) এই তত্ত্বে অর্থের প্রান্তিক উপযোগিতাকে ধ্রুবক বলে ধরা হয়েছে। এটিও অবাস্তব অনুমান। (iii) মার্শাল অনুমান করেছেন যে, কোনো দ্রব্য থেকে প্রাপ্ত উপযোগ কেবলমাত্র সেই দ্রব্যের ভোগের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। এটিও অবাস্তব অনুমান। বাস্তবে কোনো দ্রব্য থেকে প্রাপ্ত উপযোগের পরিমাণ সেই দ্রব্যের পরিবর্ত ও পরিপূরক দ্রব্যের ভোগের পরিমাণের উপরও নির্ভর করে। (iv) মার্শালের তত্ত্বে দামের পরিবর্তনের প্রভাবকে আয় প্রভাব ও পরিবর্ত প্রভাবে ভাগ করে দেখানো যায় না। (v) এই তত্ত্বে আয় প্রভাবকে আলাদাভাবে দেখানো যায় না। এখন, নিকৃষ্ট ও গিফেন দ্রব্যের ক্ষেত্রে আয় প্রভাব ঋণাত্মক। মার্শালের তত্ত্ব এই নিকৃষ্ট ও গিফেন দ্রব্যের চাহিদা ব্যাখ্যা করতে পারে না।

অধ্যাপক হিক্স এবং অধ্যাপক অ্যালেন নিরপেক্ষ রেখা তত্ত্বের সাহায্যে মার্শালের তত্ত্বের এই ত্রুটিগুলি দূর করার চেষ্টা করেছেন।

২.৫ ভোগকারীর উদ্বৃত্তের ধারণা ও তার সীমাবদ্ধতা

মার্শালের প্রান্তিক উপযোগিতার তত্ত্ব থেকে আমরা ভোগকারীর উদ্বৃত্তের ধারণা পেতে পারি। মার্শালকে অনুসরণ করে বলা যায়, কোনো দ্রব্য পাবার জন্য ভোগকারী সর্বাধিক যে দাম দিতে ইচ্ছুক এবং যে দাম তাকে প্রকৃতই দিতে হয়, এই দুই দামের পার্থক্যই হল ভোগকারীর উদ্বৃত্ত বা ভোগ-উদ্বৃত্ত। কোনো দ্রব্য এক ইউনিট পাবার জন্য ক্রেতা সর্বাধিক যে দাম দিতে রাজি থাকে তাকে বলে ব্যক্তিগত চাহিদা-দাম। বাস্তবে ভোগকারীকে ওই সর্বোচ্চ দাম না-ও দিতে হতে পারে। বাজারে প্রচলিত ওই দাম ভোগকারীর সর্বোচ্চ চাহিদা-দাম অপেক্ষা কম হতে পারে। আমরা বাজারে প্রচলিত দামকে প্রকৃত দাম বলে অভিহিত করতে পারি। তাহলে, কোনো দ্রব্যের ব্যক্তিগত চাহিদা-দাম ও প্রকৃত দামের যে পার্থক্য, সেই পার্থক্যকেই বলা হয় ভোগকারীর উদ্বৃত্ত বা ভোগ-উদ্বৃত্ত। উদাহরণস্বরূপ, মনে করি, কোনো ভোগকারী তার পছন্দের এক জোড়া জুতোর জন্য সর্বাধিক 1500 টাকা দিতে রাজি আছে। আরও মনে করি যে, ওই জুতো জোড়ার বাজারে দাম 1200 টাকা। তাহলে ওই জুতো জোড়া কিনলে ভোগকারীর ভোগ-উদ্বৃত্ত হবে (1500-1200) টাকা বা 300 টাকা।

আমরা রেখাচিত্রের মাধ্যমে ভোগ-উদ্বৃত্তের পরিমাণ পরিমাপ করতে পারি। ২.৩ নং চিত্রে আমরা অনুভূমিক অক্ষে দ্রব্যের পরিমাণ (x) এবং উল্লম্ব অক্ষে দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগিতা (MU) এবং দাম (P) পরিমাপ করছি। ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগিতার নিয়ম অনুযায়ী আমাদের MU রেখা বাঁদিক থেকে ডানদিকে নিম্নমুখী। এখন, বাজারে দ্রব্যটির ইউনিট প্রতি দাম OP_0 হলে ক্রেতার ভারসাম্য বিন্দু হল C। ঐ বিন্দুতে MU = P এবং MU রেখা নিম্নমুখী। অর্থাৎ C বিন্দুতে ভোগকারীর ভারসাম্যের দুটো শর্তই

পালিত হচ্ছে। সুতরাং, OP_0 দামে ভোগকারী Ox_0 পরিমাণ দ্রব্যটি ক্রয় করবে। ফলে তার মোট ব্যয় = $OP_0 \times Ox_0 = OP_0CX_0$ এই অঞ্চলের ক্ষেত্রফল। ভোগকারী Ox_0 ইউনিটের জন্য প্রকৃতই এই দাম দিচ্ছে। এখন, Ox_0 ইউনিটের জন্য ভোগকারী সর্বাধিক কত দাম দিতে রাজি ছিল তা দেখা যাক। আমরা জানি, MU রেখার নীচের অঞ্চলের ক্ষেত্রফল হল মোট উপযোগ (TU)। সুতরাং দ্রব্যটি Ox_0 পরিমাণ ভোগ করলে ভোগকারী মোট উপযোগিতা পায় $OACX_0$ অঞ্চল। যদি ধরা হয় যে, মোট উপযোগকে টাকার অঙ্কে প্রকাশ করা যায়, তাহলে বলা যায় যে, ক্রেতা Ox_0 পরিমাণ দ্রব্যটি কেনার জন্য সর্বাধিক $OACx_0$ পরিমাণ টাকা দিতে রাজি ছিল। কিন্তু বাস্তবে তাকে দিতে হয়েছে OP_0Cx_0 পরিমাণ। সুতরাং ভোগকারীর উদ্বৃত্তের পরিমাণ হল $(OACx_0 - OP_0Cx_0) = AP_0C$ এই ত্রিভুজাকৃতি অঞ্চল। লক্ষণীয় যে, প্রান্তিক উপযোগিতা অপরিবর্তিত অবস্থায়, দ্রব্যের দাম কমলে ভোগকারীর উদ্বৃত্তের পরিমাণ বাড়ে এবং দ্রব্যের দাম বাড়লে ভোগকারীর উদ্বৃত্তের পরিমাণ কমে।

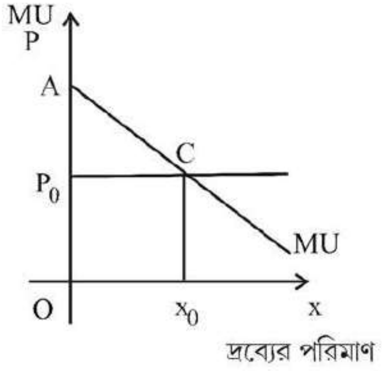

চিত্র ২.৩

❑ ভোগ-উদ্বৃত্তের ধারণার সীমাবদ্ধতা (Limitations of the Concept of Consumer Surplus)

ভোগ উদ্বৃত্তের ধারণার কয়েকটি সীমাবদ্ধতা আছে। সংক্ষেপে সেগুলি নিম্নরূপ :

(i) ভোগ উদ্বৃত্ত পরিমাপ করতে হলে আমাদের টাকার প্রান্তিক উপযোগিতাকে স্থির বলে ধরতে হয়। এটি অবাস্তব।

(ii) ভোগ-উদ্বৃত্তের ধারণা একটি মানসিক ধারণা। একে সংখ্যার দ্বারা বা টাকার অঙ্কে পরিমাপ করা যায় না।

(iii) অত্যাবশকীয় কোনো দ্রব্যের ক্ষেত্রে ভোগকারী অসীম দাম দিতে রাজি হতে পারে। সেক্ষেত্রে ভোগকারীর উদ্বৃত্তের পরিমাণ অসীম হবে এবং তা পরিমাপ করা যাবে না।

(iv) একই দ্রব্যের ভোগ উদ্বৃত্তের পরিমাণ বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন হবে। স্বাভাবিক অবস্থায় ভোগকারী এক গ্লাস জলের জন্য যা দাম দিতে চাইবে, সেই ভোগকারীই মরুভূমিতে এক গ্লাস জলের জন্য অনেক বেশি দাম দিতে রাজি হবে। ফলে এক গ্লাস জলের ভোগ-উদ্বৃত্তের পরিমাণ দুই পরিস্থিতিতে দুই রকম হবে। অর্থাৎ, ভোগ-উদ্বৃত্তের পরিমাপ বস্তুনিষ্ঠ নয়।

এ সমস্ত কারণে ভোগ-উদ্বৃত্তের ব্যবহারিক গুরুত্ব খুবই কম। I.M.D. Little ভোগ-উদ্বৃত্তের ধারণাটিকে "সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় তাত্ত্বিক খেলনা" (a totally useless theoretical toy) বলে অভিহিত করেছেন।

অনেক অর্থনীতিবিদই ভোগ-উদ্বৃত্তের ধারণাটিকে অর্থনীতির আলোচনা থেকে বাদ দিতে চান।

২.৬ ভোগকারীর আচরণ সম্পর্কে হিক্স-এর তত্ত্ব

আমরা জানি, মার্শাল-এর প্রান্তিক উপযোগিতা তত্ত্বে নানা অবাস্তব অনুমান করা হয়েছে। অধ্যাপক হিক্স এই অনুমানগুলির বদলে আরো বাস্তবসম্মত অনুমান গ্রহণ করে ভোগকারীর আচরণ বা চাহিদার নিয়মকে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি তাঁর তত্ত্বে নিরপেক্ষ রেখা বা অপক্ষপাত রেখার ধারণা ব্যবহার করেছেন। তাই তাঁর তত্ত্বের নাম হল নিরপেক্ষ রেখা তত্ত্ব বা নিরপেক্ষ রেখা বিশ্লেষণ (Indifference curve theory or Indifference curve analysis)। এজন্য এই তত্ত্বের শুরুতে আমরা নিরপেক্ষ রেখা সম্পর্কে আলোচনা করব।

২.৬.১ নিরপেক্ষ রেখা ও নিরপেক্ষ মানচিত্র

নিরপেক্ষ রেখা বা অপক্ষপাত রেখা হল সেই সমস্ত দ্রব্য সমন্বয়ের সঞ্চারপথ যা থেকে ভোগকারী একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ তৃপ্তি পেয়ে থাকে। এই রেখার উপর প্রতিটি বিন্দুতে ভোগকারীর তৃপ্তি সমান। তৃপ্তির দিক থেকে ভোগকারী এই বিন্দুগুলির প্রতি নিরপেক্ষ। তাই এই বিন্দুগুলির সংযোজক রেখাকে বলা হয় নিরপেক্ষ রেখা বা অপক্ষপাত রেখা। এই রেখার ধারণাটিকে একটি সারণি ও একটি রেখাচিত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। মনে করি, ভোগকারী 1 একক x এবং 20 একক y পেলে যা তৃপ্তি পায় (২.২ নং সারণি দ্রষ্টব্য), 2 একক x এবং 15 একক y, বা 3 একক x এবং 11 এবং y থেকেও তাই তৃপ্তি পায়, ইত্যাদি। সুতরাং, এই দ্রব্য-সমন্বয়গুলির প্রতি ভোগকারী তৃপ্তির দিক থেকে নিরপেক্ষ। দুটি দ্রব্যের এই সমন্বয়গুলিকে রেখাচিত্রে স্থাপন করে আমরা যথাক্রমে A, B, C, D প্রভৃতি বিন্দুগুলি পেয়েছি। এই বিন্দুগুলিকে যোগ করলে আমরা যে রেখা পাই, তাই হল নিরপেক্ষ রেখা। ২.৪ নং চিত্রে I_1 হল ভোগকারীর এরূপ একটি নিরপেক্ষ রেখা। একটি নিরপেক্ষ রেখার উপর ভোগকারীর তৃপ্তি অপরিবর্তিত বা ধ্রুবক। সুতরাং, এক একটি তৃপ্তির স্তরের জন্য আমরা এক একটি নিরপেক্ষ রেখা পাই। যদি আমরা একাধিক নিরপেক্ষ রেখা কোনো রেখাচিত্রে আঁকি, তাহলে পাই নিরপেক্ষ মানচিত্র (চিত্র ২.৫)। এই নিরপেক্ষ মানচিত্র ভোগকারীর রুচি, পছন্দ প্রভৃতি প্রকাশ করে।

সারণি ২.২

x	y
1	20
2	15
3	11
4	8
5	6

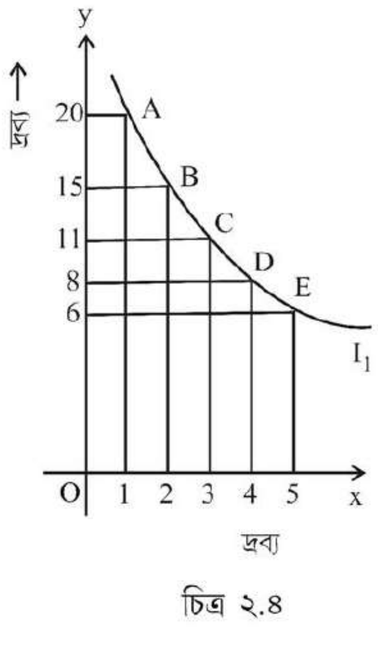

চিত্র ২.৪

২.৬.২ নিরপেক্ষ রেখার বৈশিষ্ট্যসমূহ ও সেগুলির প্রমাণ

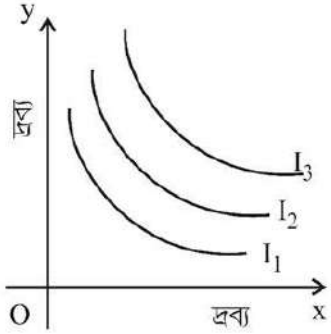

চিত্র ২.৫

নিরপেক্ষ রেখার চারটি বৈশিষ্ট্য আছে। সেগুলি হ'ল :

(i) নিরপেক্ষ রেখা বাঁদিক থেকে ডানদিকে নিম্নমুখী হবে, অর্থাৎ এর ঢাল ঋণাত্মক হবে।

(ii) নিরপেক্ষ রেখা মূলবিন্দুর দিকে উত্তল হবে।

(iii) দুটি নিরপেক্ষ রেখা একে অপরকে ছেদ বা স্পর্শ করবে না।

(iv) উচ্চতর নিরপেক্ষ রেখা উচ্চতর তৃপ্তির স্তর নির্দেশ করে।

এই বৈশিষ্ট্যগুলি প্রমাণ করার জন্য আমরা কয়েকটি অনুমান করে নিচ্ছি। সংক্ষেপে সেগুলি নিম্নরূপ :

(ক) অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত অবস্থায়, ক্রেতা কোনো দ্রব্যের কম পরিমাণ অপেক্ষা বেশি পরিমাণ সর্বদাই পছন্দ করবে। অন্যভাবে বলতে গেলে, কোনো দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ (MU) ধনাত্মক। একে বলা হয় অ-পরিতৃপ্তির অনুমান (non-satiety assumption)।

(খ) ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক পরিবর্ততার হারের নিয়ম (law of diminishing marginal rate of substitution বা MRS) কাজ করছে। এই নিয়মটির মূলকথা হল, ভোগকারী যদি y দ্রব্য ছেড়ে x দ্রব্য বেশি বেশি ভোগ করে, তাহলে তৃপ্তি অপরিবর্তিত রাখতে ভোগকারী বাড়তি এক এক ইউনিট x দ্রব্যের বিনিময়ে y দ্রব্য কম কম পরিমাণে ছাড়তে রাজি হবে।

(গ) পছন্দ ও নিরপেক্ষতার সম্পর্কগুলি (Preference and indifference relations) পরস্পর তুলনীয়। মনে করি, তিনটি দ্রব্য সমন্বয় আছে—A, B ও C। তাহলে বলা হচ্ছে যে, যদি $A \gtreqless B$ এবং $B \geqslant C$ হয় তাহলে $A \geqslant C$ হবে। একে তুল্যতার অনুমান (transitivity assumption) বলা হয়।

(ঘ) দ্রব্য দুটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইউনিটে সম্পূর্ণরূপে বিভাজ্য (Perfectly divisible)।

(ঙ) ভোগকারীর আচরণ যুক্তিসিদ্ধ (rational)। সে তার তৃপ্তিকে সর্বাধিক করতে চায়।

এই অনুমানগুলির সাহায্যে আমরা নিরপেক্ষ রেখার বৈশিষ্ট্যগুলি প্রমাণ করবো।

বৈশিষ্ট্য (i) : **নিরপেক্ষ রেখা বাঁদিক থেকে ডানদিকে নিম্নমুখী বা ঋণাত্মক ঢালবিশিষ্ট হবে।**

প্রমাণ : নিরপেক্ষ রেখা যদি ২.৬ নং চিত্রের ন্যায় অনুভূমিক হয়, তাহলে A ও B বিন্দুতে তৃপ্তির স্তর একই হবে। কিন্তু A বিন্দুর তুলনায় B বিন্দুতে ভোগকারী বেশি পরিমাণ x দ্রব্য এবং সমপরিমাণ y দ্রব্য ভোগ করছে। সুতরাং অ-পরিতৃপ্তির অনুমান অনুসারে B বিন্দুতে তৃপ্তির পরিমাণ A বিন্দুতে তৃপ্তির তুলনায় বেশি হবে। তাই A ও B বিন্দু যোগ করে কোনো নিরপেক্ষ রেখা পাওয়া যাবে না অর্থাৎ নিরপেক্ষ

রেখা অনুভূমিক হবে না। তেমনি, নিরপেক্ষ রেখা ২.৭ নং চিত্রের ন্যায় উল্লম্ব হতে পারে না। এখানে, B বিন্দুতে ভোগকারী A বিন্দুর তুলনায় বেশি পরিমাণ y-দ্রব্য এবং সমপরিমাণ x দ্রব্য পাচ্ছে। সুতরাং B বিন্দুতে তৃপ্তির পরিমাণ A বিন্দুর তুলনায় বেশি। তাহলে A ও B বিন্দু একই নিরপেক্ষ রেখার উপর থাকতে পারে না অর্থাৎ নিরপেক্ষ রেখা উল্লম্ব হতে পারে না। তেমনি, নিরপেক্ষ রেখা ২.৮ নং চিত্রের ন্যায় ঊর্ধ্বমুখীও হতে পারে না। এই রেখার উপর B বিন্দুতে A বিন্দুর তুলনায় উভয় দ্রব্যেরই পরিমাণ বেশি। সুতরাং B বিন্দুতে তৃপ্তি A বিন্দুর তুলনায় বেশি। তাই A ও B যোগ করে কোনো নিরপেক্ষ রেখা হবে না অর্থাৎ নিরপেক্ষ রেখা ঊর্ধ্বমুখী হবে না।

এখন, নিরপেক্ষ রেখা যদি অনুভূমিক, উল্লম্ব অথবা ঊর্ধ্বমুখী না হয়, তাহলে এটি ২.৯ নং চিত্রের ন্যায় বাঁদিক থেকে ডানদিকে নিম্নমুখী হবে। ভোগকারী যদি A বিন্দুতে থেকে B বিন্দুতে সরে যায় তাহলে তার x দ্রব্যের ভোগের পরিমাণ বাড়ে। এতে তার তৃপ্তি বাড়ে। তৃপ্তি অপরিবর্তিত রাখতে হলে তাকে y-দ্রব্যের ভোগ কমাতে হবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, ভোগকারী একটি দ্রব্যের ভোগ বাড়ালে (কমালে) তৃপ্তি অপরিবর্তিত রাখতে অপর দ্রব্যের ভোগ কমাতে (বাড়াতে) হবে। এর তাৎপর্য হল, নিরপেক্ষ রেখা বাঁদিক থেকে ডানদিকে নিম্নমুখী হবে বা ঋণাত্মক ঢালবিশিষ্ট হবে।

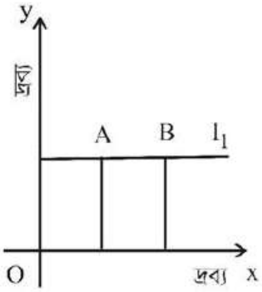

চিত্র ২.৬

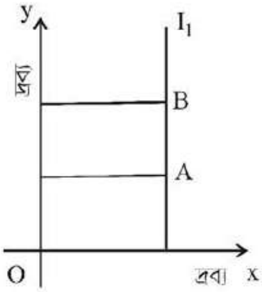

চিত্র ২.৭

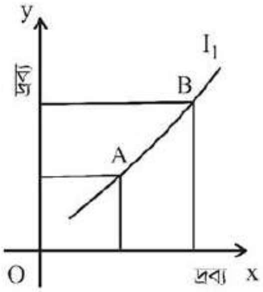

চিত্র ২.৮

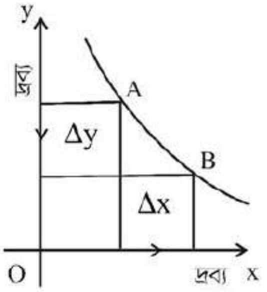

চিত্র ২.৯

আমরা সহজ গাণিতিক যুক্তি দিয়েও এটি প্রমাণ করতে পারি। ২.৯ নং চিত্রে ভোগকারী A বিন্দু থেকে B বিন্দুতে গেলে তার x দ্রব্যের ভোগ Δx পরিমাণ বাড়ে। ফলে তার তৃপ্তি বাড়ে $Mu_x \times \Delta x$ পরিমাণ। এখন নির্দিষ্ট নিরপেক্ষ রেখার উপর তৃপ্তির পরিমাণ অপরিবর্তিত। সুতরাং, $-MU_y \times \Delta y = MU_x \times \Delta x$ $\therefore \frac{\Delta y}{\Delta x} = -\frac{MU_x}{MU_y} < 0$ যেহেতু আমাদের অনুমান অনুযায়ী $MU_x > 0$ এবং $MU_y > 0$, $\therefore$ নিরপেক্ষ রেখার ঢাল < 0 অর্থাৎ নিরপেক্ষ রেখা নিম্নমুখী বা ঋণাত্মক ঢাল বিশিষ্ট হবে। আবার $-\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{MU_x}{MU_y} > 0$।

একে বলা হয় প্রান্তিক পরিবর্ততার হার বা MRS। সুতরাং $MRS = -\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{MU_x}{MU_y}$.

বৈশিষ্ট্য (ii) : নিরপেক্ষ রেখা মূল বিন্দুর দিকে উত্তল হবে।

প্রমাণ : নিরপেক্ষ রেখা যদি ২.১০ নং চিত্রের ন্যায় অবতল হয়, তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, ভোগকারী এক এক ইউনিট x-এর জন্য ক্রমাগত বেশি বেশি ইউনিট y ছাড়ছে। এর অর্থ হল, প্রান্তিক পরিবর্ততার হার বা MRS ক্রমবর্ধমান। এটি আমাদের অনুমানের বিরুদ্ধে। আবার, নিরপেক্ষ রেখা যদি ২.১১ নং চিত্রের ন্যায় নিম্নমুখী সরলরেখা হয়, তাহলে ভোগকারী বাড়তি এক এক ইউনিট x-এর জন্য প্রত্যেকবার সমপরিমাণ y ছাড়তে রাজি আছে। এক্ষেত্রে প্রান্তিক পরিবর্ততার হার (MRS) স্থির থাকছে। যদি নিরপেক্ষ রেখা মূলবিন্দুর দিকে উত্তল হয় (চিত্র ২.১২), কেবল তাহলেই ভোগকারী অতিরিক্ত এক এক ইউনিট x-এর জন্য ক্রমাগত কম কম পরিমাণ y ছাড়তে চাইছে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে প্রান্তিক পরিবর্ততার হার (MRS) ক্রমহ্রাসমান। এক্ষেত্রেই আমাদের অনুমান পূরণ হচ্ছে। সুতরাং, MRS ক্রমহ্রাসমান হবে এটা ধরে নিলে নিরপেক্ষ রেখা মূল বিন্দুর দিকে উত্তল হবে।

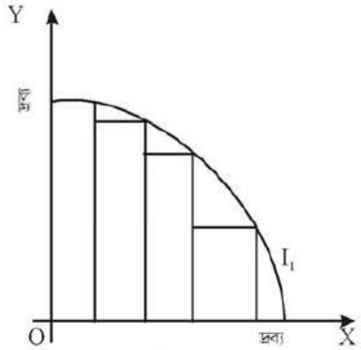

চিত্র ২.১০

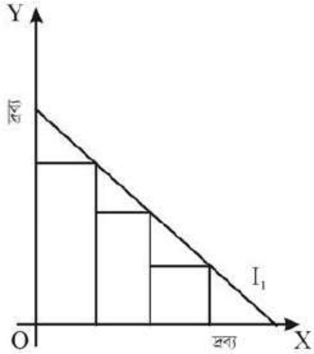

চিত্র ২.১১

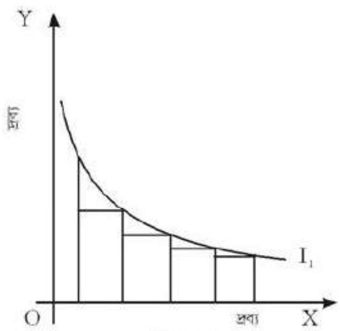

চিত্র ২.১২

বৈশিষ্ট্য (iii) : দুটি নিরপেক্ষ রেখা একে অপরকে ছেদ বা স্পর্শ করবে না।

প্রমাণ : যুক্তির খাতিরে আমরা ধরে নিচ্ছি যে, দুটি নিরপেক্ষ রেখা একে অপরকে B বিন্দুতে ছেদ (চিত্র ২.১৩) বা স্পর্শ (চিত্র ২.১৪) করেছে। এখন, যেহেতু A ও B বিন্দু একই নিরপেক্ষ রেখা I_1-এর উপর অবস্থিত, সুতরাং, A বিন্দুতে উপযোগিতা = B বিন্দুতে উপযোগিতা।

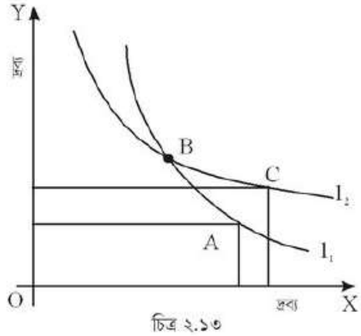

চিত্র ২.১৩

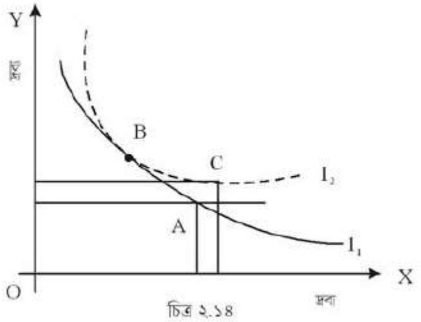

চিত্র ২.১৪

আবার, B ও C বিন্দু যেহেতু একই নিরপেক্ষ রেখা I_2-এর উপর অবস্থিত, অতএব B বিন্দুতে উপযোগ = C বিন্দুতে উপযোগ। সুতরাং, A বিন্দুতে উপযোগ = C বিন্দুতে উপযোগ। কিন্তু চিত্র দুটি থেকে দেখা যাচ্ছে যে, A বিন্দুর তুলনায় C বিন্দুতে ভোগকারী উভয় দ্রব্যই বেশি পাচ্ছে। সুতরাং, C বিন্দুতে উপযোগ > A বিন্দুতে উপযোগ। তাহলে একটি স্ববিরোধ বা অসঙ্গতি দেখা দিচ্ছে। এই অসঙ্গতি এড়াতে গেলে দুটি নিরপেক্ষ রেখা ছেদ বা স্পর্শ করলে চলবে না। অর্থাৎ দুটি নিরপেক্ষ রেখার কোনো সাধারণ বিন্দু থাকবে না।

বৈশিষ্ট্য (iv) : উচ্চতর নিরপেক্ষ রেখা উচ্চতর তৃপ্তির স্তর নির্দেশ করে।

প্রমাণ : 2.15 নং চিত্রে আমরা I_1 ও I_2 এই দুটি নিরপেক্ষ রেখা এঁকেছি। আমাদের প্রমাণ করতে হবে যে, I_2 রেখা I_1 রেখা অপেক্ষা বেশি তৃপ্তির স্তর নির্দেশ করে। আমরা একটি মূলবিন্দুগামী সরলরেখা OA টেনেছি। B বিন্দুর তুলনায় C বিন্দুতে ভোগকারী উভয় দ্রব্যই বেশি পায়। সুতরাং, C বিন্দুতে তৃপ্তি B বিন্দুর তুলনায় বেশি। আবার, D বিন্দুতে তৃপ্তি C বিন্দুতে তৃপ্তির সমান। অতএব, D বিন্দুতে তৃপ্তি B বিন্দুতে তৃপ্তির চেয়ে বেশি। আবার, E বিন্দুতে তৃপ্তি B বিন্দুতে তৃপ্তির সমান। সুতরাং, D বিন্দুতে তৃপ্তি E বিন্দুতে তৃপ্তির চেয়ে বেশি। তাহলে দেখা যাচ্ছে, I_2 রেখার উপর যে-কোনো বিন্দু I_1 রেখার উপর যে-কোনো বিন্দুর তুলনায় বেশি তৃপ্তির স্তর নির্দেশ করে। এক কথায়, উচ্চতর নিরপেক্ষ রেখা উচ্চতর তৃপ্তির স্তর নির্দেশ করে।

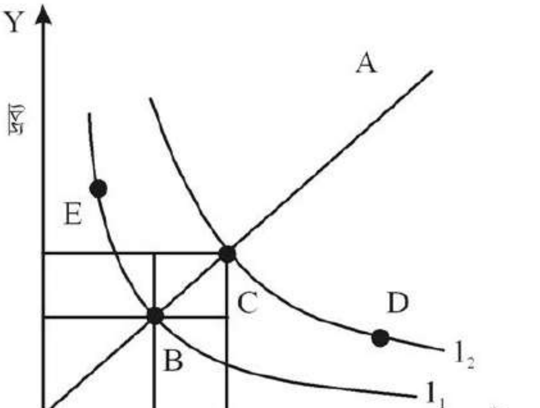

চিত্র ২.১৫

২.৬.৩ সম্পূর্ণ পরিবর্ত ও সম্পূর্ণ পরিপূরক দ্রব্যের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ রেখার আকৃতি

আমরা জানি, সাধারণভাবে নিরপেক্ষ রেখা নিম্নমুখী এবং মূলবিন্দুর দিকে উত্তল হয়। সেক্ষেত্রে দ্রব্য দুটি একে অপরের পরিবর্ত কিন্তু সম্পূর্ণ পরিবর্ত নয়। এখন, দুটি বিশেষ অবস্থার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে। প্রথমত, মনে করি, x এবং y দ্রব্য দুটি একে অপরের সম্পূর্ণ পরিবর্ত। সেক্ষেত্রে ভোগকারী এক এক ইউনিট x দ্রব্যের জন্য প্রত্যেক বার সমান পরিমাণ y-দ্রব্য ছাড়তে রাজি হবে। অর্থাৎ প্রান্তিক

পরিবর্ততার হার (MRS) স্থির থাকবে। সেক্ষেত্রে নিরপেক্ষ রেখাগুলি ২.১৬ নং চিত্রের ন্যায় নিম্নমুখী সরলরেখা হবে। দ্বিতীয়ত,x ও y দ্রব্য দুটি একে অপরের সম্পূর্ণ পরিপূরক অর্থাৎ তাদের একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে ভোগ বা ব্যবহার করতে হয়। ভোগকারী যদি একটি দ্রব্যের ভোগ বাড়ায় তাহলে তার তৃপ্তি বাড়ে না। তৃপ্তি বাড়তে পারে যদি ভোগকারী অপর দ্রব্যেরও ভোগ বাড়ায়। এক্ষেত্রে নিরপেক্ষ রেখাগুলি ইংরাজি L-অক্ষরের বা সমকোণের মতো হবে (চিত্র ২.১৭)। এদের কৌণিক বিন্দুগুলি একটি মূলবিন্দুগামী সরলরেখার (OR) উপর অবস্থান করবে। এই OR সরলরেখার ঢাল থেকে জানা যায় দ্রব্য দুটি কী অনুপাতে ব্যবহৃত হবে।

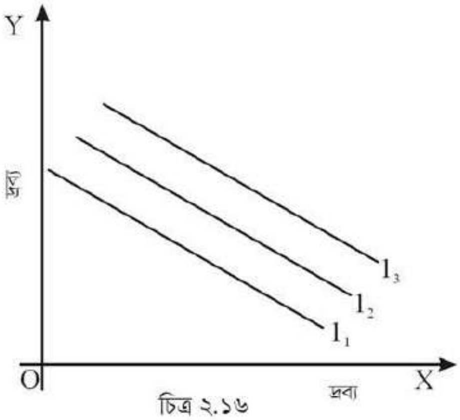

চিত্র ২.১৬

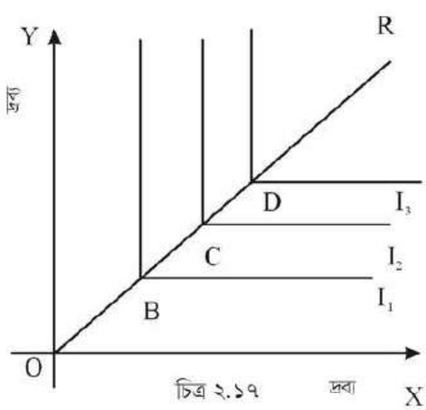

চিত্র ২.১৭

২.৭ বাজেট রেখা (বা দাম রেখা) ও তার বৈশিষ্ট্য

বাজেট রেখা বা দাম রেখা হল সেই সমস্ত দ্রব্য সমন্বয়ের সঞ্চারপথ যা নির্দিষ্ট দামে কিনতে ক্রেতার একই ব্যয় পড়ে। মনে করি, দুটি দ্রব্য আছে : 1 এবং 2 এবং এদের পরিমাণ যথাক্রমে x ও y। এদের ইউনিট প্রতি দাম যথাক্রমে p_1 ও p_2। আরও ধরা যাক যে, ভোগকারী দ্রব্য দুটি কিনতে M টাকা ব্যয় করছে। তাহলে আমরা বলতে পারি, 1নং দ্রব্যের উপর ব্যয় + 2নং দ্রব্যের উপর ব্যয় = ক্রেতার মোট ব্যয়, অর্থাৎ $p_1x + p_2y = M$ এটিই হল বাজেট রেখা বা দাম রেখার সমীকরণ। এটিকে আমরা লিখতে পারি।

$$p_2y = -p_1x + M$$

$$\text{বা, } y = -\frac{p_1}{p_2}.x + M/p_2$$

এটি একটি সরলরেখার সমীকরণ যার উল্লম্ব ছেদিতাংশ হল $M/_{p_2}$ এবং ঢাল $\left(-\frac{p_1}{p_2}\right) < 0$। সুতরাং বাজেট রেখা বা দাম রেখা নিম্নমুখী সরলরেখা হবে। ২.১৮ নং চিত্রে AB হল এরূপ একটি বাজেট রেখা বা দাম রেখা।

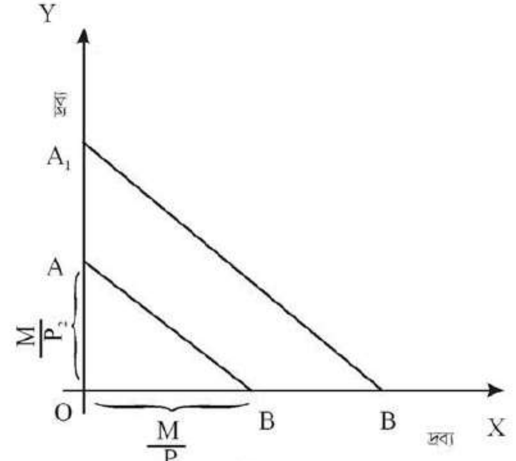

চিত্র ২.১৮

এখন, ভোগকারীর আয় অথবা ব্যয়ের (M) পরিবর্তন হলে বাজেট রেখার কেমন পরিবর্তন হবে দেখা যাক। মনে করি M বাড়ল, কিন্তু দ্রব্য দুটির দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। তাহলে M/p_1 এবং $\frac{M}{p_2}$ উভয়ই একই অনুপাতে বাড়বে অর্থাৎ উল্লম্ব এবং অনুভূমিক উভয় ছেদিতাংশই বাড়বে। কিন্তু বাজেট রেখার ঢাল $\left(-\frac{p_1}{p_2}\right)$ একই থাকবে। ফলে বাজেট রেখা সমান্তরালভাবে উপরের দিকে উঠে যাবে। মনে করি, এর নতুন অবস্থান হল A_1B_1। বিপরীত ক্ষেত্রে, M কমলে বাজেট লাইন সমান্তরালভাবে নীচের দিকে নেমে আসবে।

তেমনি, যদি কেবলমাত্র 1নং দ্রব্যের দাম ($= p_1$) কমে, তাহলে M/p_1 বাড়বে। ফলে বাজেট রেখার অনুভূমিক ছেদিতাংশ বাড়বে। কিন্তু উল্লম্ব ছেদিতাংশের $\left(M/p_2\right)$ কোনো পরিবর্তন হবে না। ফলে A বিন্দুকে কেন্দ্র করে বাজেট রেখার ডানদিকে ঘূর্ণন (rotation) হবে। মনে করি, তখন এর নতুন অবস্থান AB_1 হবে (চিত্র ২.১৯)। বিপরীত ক্ষেত্রে, যদি P_1 বাড়ে, বাজেট রেখার অনুভূমিক ছেদিতাংশ কমবে। তখন এর বাঁদিকে ঘূর্ণন হবে। মনে করি, তখন এর নতুন অবস্থান হবে AB_2। তেমনি, একইভাবে যদি ২নং দ্রব্যের দাম (p_2) কমে, বাজেট লাইনের উল্লম্ব ছেদাংশ $\left(M/p_2\right)$ বাড়বে। তখন এর নতুন অবস্থান হবে A_1B (মনে করি)। আবার, p_2 বাড়লে M/p_2 কমবে। তখন বাজেট রেখার নতুন অবস্থান হবে, মনে করি, A_2B (চিত্র ২.২০)।

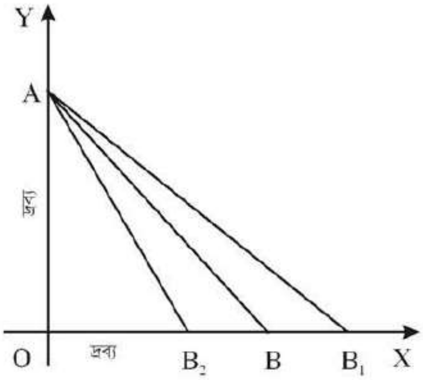

চিত্র ২.১৯

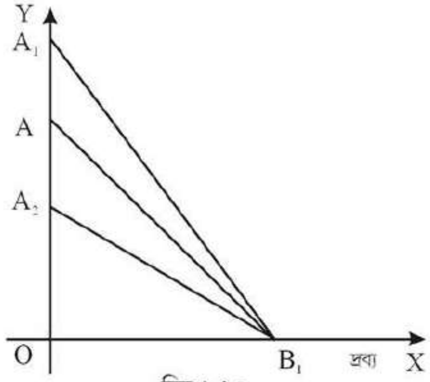

চিত্র ২.২০

এখন, ক্রেতার ব্যয় (M) এবং দ্রব্য দুটির দাম একই অনুপাতে পরিবর্তিত হলে দাম রেখা বা বাজেট রেখার কীরূপ পরিবর্তন হবে দেখা যাক। মনে করি, ভোগকারী বা ক্রেতার ব্যয় (বা আয়) এবং দ্রব্য দুটির দাম t গুণ বাড়ল। তাহলে বাজেট রেখা দাম রেখার নতুন সমীকরণ হবে, $tp_1x + tp_2y = tM$ বা, $p_1x + p_2y = M$। দেখা যাচ্ছে, এক্ষেত্রে বাজেট রেখার সমীকরণের কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না। সুতরাং, দ্রব্য দুটির ব্যয় এবং ভোগকারীর ব্যয়ের একই অনুপাতে পরিবর্তন ঘটলে বাজেট রেখা বা দাম রেখা অপরিবর্তিত থাকবে।

২.৮ নিরপেক্ষ রেখা তত্ত্বে ভোগকারীর ভারসাম্য

কোনো ভোগকারী বা ক্রেতার ভারসাম্য বলতে আমরা সেই অবস্থাকে বুঝি যেখানে সে সর্বাধিক তৃপ্তি লাভ করে। এক্ষেত্রে ভোগকারী একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দুটি দ্রব্যের উপর কীভাবে বণ্টন করবে অথবা দুটি দ্রব্যের ক্রয়ের পরিমাণ সে কীভাবে নির্ধারণ করবে আমরা সেটি বিবেচনা করব। ক্রেতার এই ভারসাম্য অবস্থা নির্ধারণ করার জন্য আমরা কয়েকটি অনুমান করছি।

(i) উপযোগ একটি ক্রমবাচক বিষয়। এর অর্থ হ'ল, উপযোগের বিভিন্ন স্তরকে ক্রম অনুসারে সাজানো যায়। তাদের সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করা যায় না।

(ii) উপযোগ অপেক্ষকগুলি পরস্পর নির্ভরশীল। এর অর্থ হল, কোনো দ্রব্য থেকে প্রাপ্ত উপযোগ কেবলমাত্র সেই দ্রব্যেরই ভোগের পরিমাণের উপর নির্ভর করে না, এর সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের ভোগের পরিমাণের উপরও নির্ভর করে।

(iii) ভোগকারী নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দুটি দ্রব্যের উপর ব্যয় করছে। এই দুটি দ্রব্যের দাম দেওয়া আছে।

(iv) ভোগকারী দ্রব্য দুটির সমস্ত সম্ভাব্য বিকল্পগুলিকে তৃপ্তির ক্রম অনুসারে সাজাতে পারে।

(v) দ্রব্য দুটি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এককে বিভাজ্য।

(vi) অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত অবস্থায় ভোগকারী কোনো দ্রব্যের কম পরিমাণ অপেক্ষা বেশি পরিমাণ সর্বদাই পছন্দ করে। অন্যভাবে বলতে গেলে, কোনো দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ ধনাত্মক। একে বলা হয় অ-পরিতৃপ্তির অনুমান।

(vii) ভোগকারী কোনো একটি দ্রব্যের ভোগ বাড়ালে তৃপ্তি অপরিবর্তিত রাখতে সে অপর দ্রব্যটি এর বিনিময়ে কম কম পরিমাণে ছাড়তে চাইবে। একেই বলা হয় ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক পরিবর্ততার হারের নিয়ম (Law of diminishing Marginal Rate of Substitution বা MRS)।

(viii) বিভিন্ন উপযোগ স্তরকে পছন্দ বা নিরপেক্ষতার মাধ্যমে তুলনা করা যাবে। একে বলা হয় তুল্যতার বা তুলনীয়তার অনুমান (Assumption of transitivity)।

(ix) ভোগকারীর রুচি এবং পছন্দ আমাদের জানা আছে এবং তা অপরিবর্তিত থাকছে।

(x) ক্রেতা যুক্তিসিদ্ধ আচরণ করে। সে মোট উপযোগ সর্বাধিক করতে চায়।

এখন, ভোগকারীর আর্থিক আয় এবং দ্রব্য দুটির দাম দেওয়া আছে। সুতরাং, আমরা ভোগকারীর বাজেট লাইন বা দাম রেখা টানতে পারি। ধরা যাক, দ্রব্য দুটির পরিমাণ হল x ও y এবং তাদের দাম যথাক্রমে p_1 ও p_2 এবং M হল ভোগকারীর মোট ব্যয়। তাহলে বাজেট রেখার সমীকরণ হল, $p_1x + p_2y = M$

বা, $p_2y = -p_1x + M$, বা, $y = -\frac{p_1}{p_2}.x + \frac{M}{p_2}$ এটি একটি নিম্নমুখী সরলরেখার সমীকরণ যার ঢাল $= \left(-\frac{p_1}{p_2}\right)$ এবং উল্লম্ব ছেদাংশ $= \frac{M}{p_2}$ ২.২১ নং চিত্রে আমরা একটি বাজেট রেখা AB টেনেছি। এই বাজেট রেখার প্রত্যেক বিন্দুতে ভোগকারীর ব্যয়ের পরিমাণ M টাকা।

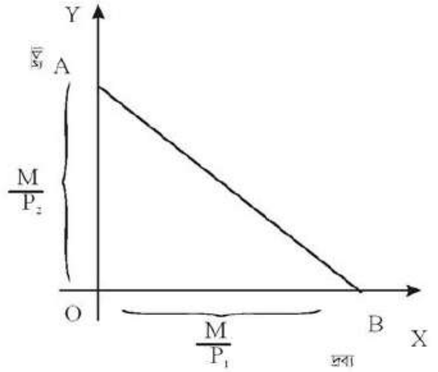

চিত্র ২.২১

এখন, ভোগকারী কোন্ বিন্দুতে তার ক্রয় নির্ধারণ করবে তা দেখার জন্য আমরা তার নিরপেক্ষ মানচিত্র ও বাজেট রেখা একই চিত্রে স্থাপন করলাম (চিত্র ২.২২)। এখন, ভোগকারী তার বাজেট রেখার উপর যে-কোনো বিন্দুতে ক্রয় নির্ধারণ করতে পারে। C, D, E, F, G প্রভৃতি বিন্দুতে ব্যয়ের পরিমাণ একই। ভোগকারী সেই বিন্দুটিই নির্বাচন করবে যে বিন্দু তাকে সর্বাধিক তৃপ্তি দেয়। সুতরাং সে সর্বোচ্চ নিরপেক্ষ রেখার উপর থাকতে চাইবে। সেটি সম্ভব হবে E বিন্দুতে। তাই E বিন্দু হল ভোগকারীর ভারসাম্য বিন্দু। ঐ বিন্দুতে সে OS পরিমাণ x দ্রব্য এবং OT পরিমাণ y দ্রব্য ক্রয় করবে। এভাবে ভোগকারী তার নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দুটি দ্রব্যের উপর ব্যয় করবে বা দুটি দ্রব্যের ক্রয়ের পরিমাণ নির্ধারণ করবে। H বিন্দুতে তৃপ্তি E বিন্দু অপেক্ষা বেশি, কিন্তু H বিন্দু ভোগকারীর নাগালের বা সামর্থ্যের বাইরে।

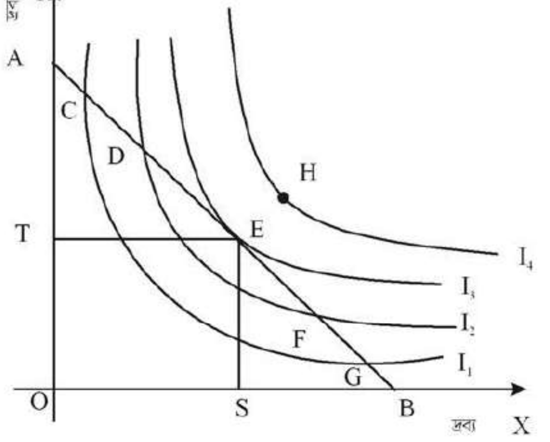

চিত্র ২.২২

আমরা দেখছি, ভোগকারী সেই বিন্দুতে ভারসাম্যে থাকবে বা তার তৃপ্তি সর্বাধিক হবে যেখানে তার বাজেট রেখা নিরপেক্ষ রেখাকে স্পর্শ করে। ঐ বিন্দুতে, নিরপেক্ষ রেখার ঢাল = বাজেট রেখার ঢাল।

বা, $\frac{MU_x}{MU_y} = \frac{p_1}{p_2}$, অর্থাৎ দ্রব্য দুটির প্রান্তিক উপযোগের অনুপাত দ্রব্য দুটির দামের অনুপাতের সমান হতে হবে। অন্যভাবে MRS = $\frac{p_1}{p_2}$ । এটি ভারসাম্যর প্রয়োজনীয় বা প্রথম ক্রমের শর্ত। কিন্তু এটি পর্যাপ্ত নয়। যেমন, ২.২৩ নং চিত্রে বাজেট রেখা AB নিরপেক্ষ রেখা I_1 কে E বিন্দুতে স্পর্শ করেছে। কিন্তু ঐ বিন্দুতে তৃপ্তি সর্বাধিক নয়, ভোগকারী যদি E বিন্দু থেকে ডানদিকে অথবা বাঁদিকে সরে যায় তাহলে তার তৃপ্তি বাড়ে। সুতরাং, বাজেট রেখা ও নিরপেক্ষ রেখার স্পর্শ বিন্দুতে তৃপ্তি সর্বাধিক হবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। তৃপ্তি সর্বাধিক হতে গেলে একটি পর্যাপ্ত বা দ্বিতীয় ক্রমের শর্ত পূরণ হওয়া দরকার। পর্যাপ্ত শর্তটি হল : নিরপেক্ষ রেখাকে মূল বিন্দুর দিকে উত্তল হতে হবে।

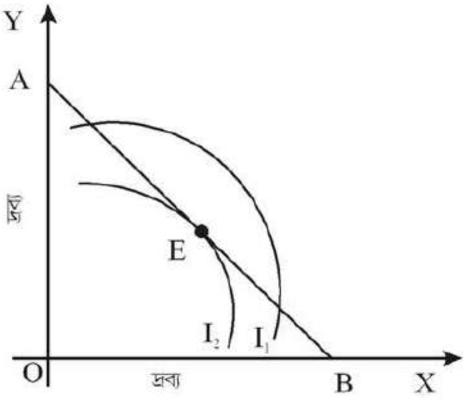

চিত্র ২.২৩

২.৮.১ কয়েকটি বিশেষ অবস্থায় ভোগকারীর ভারসাম্য

এই বিভাগে আমরা কয়েকটি বিশেষ বা অস্বাভাবিক ক্ষেত্রে ভোগকারীর ভারসাম্য আলোচনা করব। **প্রথমত**, এরূপ হতে পারে যে, ভোগকারীর নিরপেক্ষ রেখাগুলি উত্তল কিন্তু সেগুলি সর্বদাই বাজেট রেখা অপেক্ষা বেশি বা কম খাড়া। সেক্ষেত্রে ভারসাম্যের দ্বিতীয় বা পর্যাপ্ত শর্ত পূরণ হচ্ছে কিন্তু প্রথম ক্রমের শর্তটি পূরণ হচ্ছে না। বিষয়টি আমরা ২.২৪ ও ২.২৫ চিত্রে দেখিয়েছি। যদি নিরপেক্ষ রেখাগুলি বাজেট লাইন অপেক্ষা বেশি খাড়া হয় (চিত্র ২.২৪), তাহলে ক্রেতার সর্বাধিক তৃপ্তির বিন্দু হল B। সুতরাং B বিন্দু হল ভোগকারীর ভারসাম্য বিন্দু। এক্ষেত্রে ক্রেতা কেবলমাত্র OB পরিমাণ x দ্রব্য ক্রয় করবে। বিপরীত ক্ষেত্রে, নিরপেক্ষ রেখাগুলি যদি বাজেট রেখা অপেক্ষা চেটালো হয় (চিত্র ২.২৫) তাহলে A বিন্দু হল সর্বাধিক তৃপ্তির বিন্দু বা ভারসাম্য বিন্দু। এক্ষেত্রে ভোগকারী কেবলমাত্র y দ্রব্য OA পরিমাণ ক্রয় করবে। এই ধরনের ভারসাম্য অবস্থাকে বলা হয় কৌণিক সমাধান (Corner solution) এরূপ ভারসাম্য ভোগকারীর কোনো একটি দ্রব্যের প্রতি আসক্তি (Case of monomania) প্রকাশ করছে।

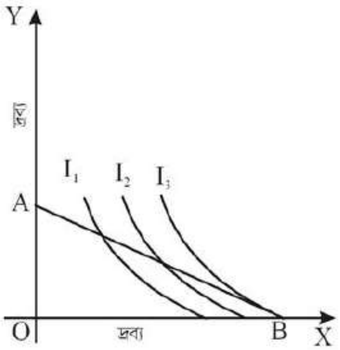

চিত্র ২.২৪

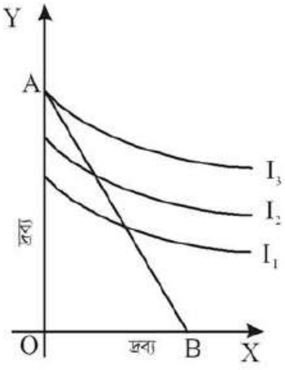

চিত্র ২.২৫

দ্বিতীয় বিশেষ বা অস্বাভাবিক ভারসাম্য দেখা যায় যখন নিরপেক্ষ রেখা মূল বিন্দুর দিকে অবতল। এরূপ

অবতল নিরপেক্ষ রেখার ক্ষেত্রে দ্রব্য দুটির প্রান্তিক পরিবর্ততার হার বা MRS ক্রমবর্ধমান। এর অর্থ হল, কোনো দ্রব্য অতিরিক্ত এক এক ইউনিট পাওয়ার বিনিময়ে তৃপ্তি অপরিবর্তিত রাখতে ভোগকারী অপর দ্রব্যটি বেশি বেশি পরিমাণে ছাড়তে চায়। নেশার দ্রব্যের ক্ষেত্রে এরূপ ঘটতে পারে। ২.২৬ নং চিত্রে ভোগকারীর অবতল নিরপেক্ষ রেখা I_1 বাজেট লাইন AB কে E বিন্দুতে স্পর্শ করেছে। কিন্তু E বিন্দু ভারসাম্য বিন্দু নয় কারণ এখানে তৃপ্তি সর্বাধিক নয়। ভোগকারীর তৃপ্তি সর্বাধিক হবে যদি সে B বিন্দুতে অবস্থান করে অর্থাৎ কেবলমাত্র x দ্রব্য কেনে। সুতরাং, নিরপেক্ষ রেখা অবতল হলে আমরা কৌণিক সমাধান বা একটি দ্রব্যের উপর আসক্তির বিষয়টি পাই। তেমনি, যদি সম্ভাব্য সর্বোচ্চ নিরপেক্ষ রেখা A বিন্দু দিয়ে যায়, তাহলে ভোগকারীর ভারসাম্য বিন্দু হবে A এবং তখন সে কেবলমাত্র y দ্রব্য কিনবে।

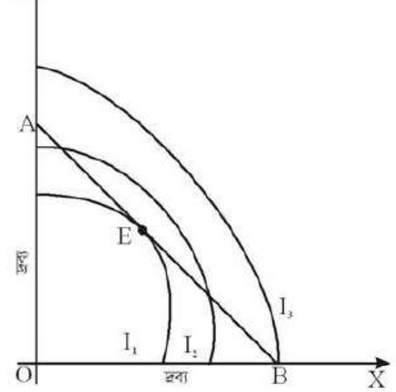

চিত্র ২.২৬

তৃতীয় অস্বাভাবিক বা বিশেষ ভারসাম্য অবস্থার উদ্ভব ঘটে পূর্ণাঙ্গ বা সম্পূর্ণ পরিবর্ত দ্রব্যের ক্ষেত্রে। সম্পূর্ণ পরিবর্ত দ্রব্যের ক্ষেত্রে MRS স্থির থাকে বা ধ্রুবক হয়। ফলে এক্ষেত্রে নিরপেক্ষ রেখাগুলি পরস্পর সমান্তরাল সরলরেখা হয়। এখন, যদি নিরপেক্ষ রেখাগুলি বাজেট রেখা অপেক্ষা বেশি খাড়া হয় তাহলে ভোগকারী B বিন্দুতে ভারসাম্যে থাকবে এবং কেবলমাত্র x দ্রব্য কিনবে (চিত্র ২.২৭)। তেমনি, যদি বাজেট রেখা নিরপেক্ষ রেখাগুলি অপেক্ষা বেশি খাড়া হয়, তাহলে ভোগকারী A বিন্দুতে ভারসাম্যে থাকবে এবং কেবলমাত্র y দ্রব্য কিনবে (চিত্র ২.২৮)। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, সম্পূর্ণ পরিবর্ত দ্রব্যের ক্ষেত্রে ভোগকারী ভারসাম্য অবস্থায় সাধারণত একটি মাত্র দ্রব্য ক্রয় করে। এক্ষেত্রেও আমরা পাই কৌণিক সমাধান (Corner solution) বা একটি দ্রব্যের প্রতি আসক্তির বিষয়টি (Case of monomania)।

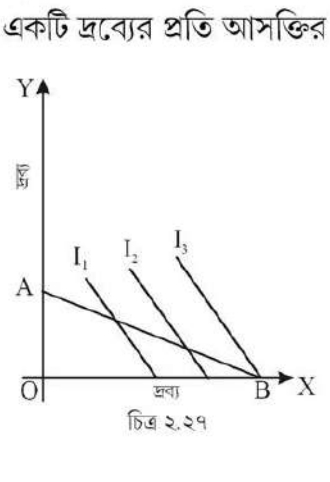

চিত্র ২.২৭

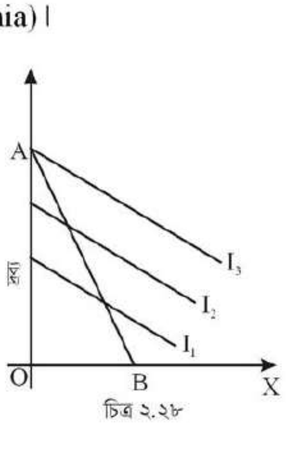

চিত্র ২.২৮

চতুর্থ অস্বাভাবিক বা বিশেষ ভারসাম্য অবস্থার উদ্ভব হয় পূর্ণাঙ্গ বা সম্পূর্ণ পরিপূরক দ্রব্যের ক্ষেত্রে। যদি দুটি দ্রব্য একে অপরের সম্পূর্ণ পরিপূরক হয়, তাহলে তাদের মধ্যে কোনো পরিবর্ততার সম্ভাবনা থাকে না। এক্ষেত্রে দ্রব্য দুটিকে একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে ভোগ করতে হয় (যেমন, তরল চা এবং চিনি)। সম্পূর্ণ পরিপূরক দ্রব্যের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ রেখাগুলি ইংরাজি L-অক্ষরের মতো বা সমকোণ আকৃতির হয় (চিত্র ২.২৯)। আমাদের চিত্রে দেখা যাচ্ছে যে, ভোগকারী সম্ভাব্য সর্বোচ্চ নিরপেক্ষ রেখায় অবস্থান করে E বিন্দুতে। সুতরাং, E বিন্দু হল ভারসাম্য বিন্দু। ভোগকারী C অথবা D বিন্দুতে ভারসাম্যে থাকবে না কারণ ঐ বিন্দুগুলিতে তৃপ্তির স্তর কম। এক্ষেত্রে সে দ্রব্য দুটিকে একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে ভোগ করে এবং সেই অনুপাত OR রেখার ঢালের সমান। লক্ষণীয় যে, সম্পূর্ণ পরিপূরক দ্রব্যের ক্ষেত্রে কৌণিক সমাধান বা একটি মাত্র দ্রব্য ক্রয়ের ঘটনা ঘটতে পারে না। ভোগকারী এক্ষেত্রে দুটি দ্রব্যই ক্রয় করে এবং তাদের একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে ভোগ করে।

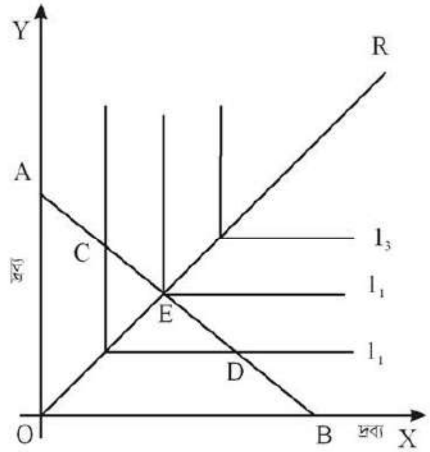

চিত্র ২.২৯

২.৯ নিরপেক্ষ রেখা তত্ত্বের সাহায্যে ভোগকারীর আচরণের বা চাহিদার নিয়মের ব্যাখ্যা

অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত অবস্থায় কোনো দ্রব্যের দাম কমলে ঐ দ্রব্যের ভোগকারী সাধারণত দ্রব্যটি বেশি কেনে। এটিই ভোগকারীর আচরণ বা চাহিদার সাধারণ নিয়ম। নিরপেক্ষ রেখা তত্ত্বের সাহায্যে ভোগকারীর এই আচরণকে বা চাহিদার সাধারণ নিয়মকে ব্যাখ্যা করা যায়। সেটি জানতে হলে আমাদের দাম প্রভাব, আয় প্রভাব এবং পরিবর্ত প্রভাব সম্পর্কে জানা দরকার। আমরা এই ধারণাগুলি নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করব এবং তারপর চাহিদার নিয়ম বা ক্রেতার আচরণ ব্যাখ্যা করব।

২.৯.১ দাম ভোগ রেখা ও দাম প্রভাব

অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত অবস্থায় কোনো দ্রব্যের দামের পরিবর্তনের ফলে ক্রেতার চাহিদার যে পরিবর্তন ঘটে তাকে দাম প্রভাব বলে। এই দাম প্রভাব ক্রেতার দাম ভোগ রেখা (Price Consumption Curve) বা PCC থেকে জানা যায়। কোনো একটি দ্রব্যের দামের পরিবর্তনের ফলে ক্রেতার ভারসাম্য অবস্থার যে পরিবর্তন ঘটে, সেই পরপর নতুন ভারসাম্য বিন্দুগুলির সঞ্চারপথকে বলা হয় দাম ভোগ রেখা বা PCC। বিষয়টিকে ২.৩০ নং চিত্রে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মনে করি ভোগকারীর প্রাথমিক বাজেট রেখা ছিল AB এবং E হল প্রাথমিক ভারসাম্য বিন্দু। ক্রেতা OS পরিমাণ x দ্রব্য এবং ES পরিমাণ y দ্রব্য ক্রয় করছিল। এখন, মনে করি, অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত অবস্থায় x দ্রব্যের দাম কমল। ফলে বাজেট লাইন AB থেকে AB_1-এ সরে গেল। তখন নতুন ভারসাম্য বিন্দু হল E_1 যেখানে নতুন বাজেট রেখা AB_1 উচ্চতর নিরপেক্ষ রেখা I_1 কে স্পর্শ করেছে। এই বিন্দুতে ভোগকারী OS_1 পরিমাণ x কিনছে অর্থাৎ x-এর চাহিদা SS_1 পরিমাণ বেড়েছে। x-এর দাম আরো কমলে আমরা নতুন ভারসাম্য পাই E_2। তখন S_1S_2 হল দাম প্রভাব। E, E_1, E_2 প্রভৃতি ভারসাম্য বিন্দুগুলি পরপর যোগ করলে আমরা পাই দাম ভোগ রেখা (P.C.C)। এই দাম ভোগ রেখা থেকে ভোগকারীর দাম প্রভাব জানা যায়।

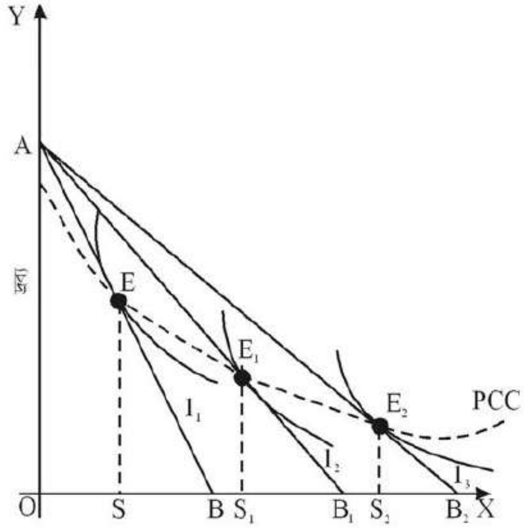

চিত্র ২.৩০ দ্রব্য

দাম ভোগ রেখা নিম্নমুখী, ঊর্ধ্বমুখী, অনুভূমিক, উল্লম্ব এমনকি পশ্চাৎমুখী হতে পারে। x দ্রব্যের দাম কমলে যদি x এবং y উভয় দ্রব্যেরই চাহিদা বাড়ে, তাহলে দাম ভোগ রেখা PCC ঊর্ধ্বমুখী হবে। যদি x-এর দাম কমলে x-এর চাহিদা বাড়ে কিন্তু y দ্রব্যের দাম কমে, তাহলে PCC আমাদের চিত্রের ন্যায় নিম্নমুখী হবে। যদি x দ্রব্যের দাম কমলে শুধুই x দ্রব্যের চাহিদা বাড়ে, y দ্রব্যের চাহিদা অপরিবর্তিত থাকে, তাহলে PCC অনুভূমিক সরলরেখা হবে। আবার, যদি x দ্রব্যের দামের পরিবর্তনের শুধু y-দ্রব্যের চাহিদার পরিবর্তন ঘটে এবং x দ্রব্যের চাহিদার কোনো পরিবর্তন না ঘটে, তাহলে PCC উল্লম্ব সরলরেখা

হবে। আবার, ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে x দ্রব্যের দাম কমলে x দ্রব্যের চাহিদা কমে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে PCC পশ্চাৎমুখী (backward bending) হবে।

২.৯.২ আয় ভোগ রেখা ও আয় প্রভাব

অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত অবস্থায় ভোগকারীর আয়ের পরিবর্তনের ফলে তার চাহিদার যে পরিবর্তন ঘটে তাকে আয় প্রভাব বলে। ক্রেতা বা ভোগকারীর আয় ভোগ রেখা (Income Consumption Curve বা ICC) থেকে আয় প্রভাব জানা যায়। বিষয়টিকে ২.৩১ নং ছবির সাহায্যে বোঝানো হয়েছে। মনে করি, ভোগকারীর প্রাথমিক ভারসাম্য বিন্দু হল E যেখানে AB বাজেট রেখা সম্ভাব্য সর্বোচ্চ নিরপেক্ষ রেখা E_o কে স্পর্শ করেছে। ঐ বিন্দুতে ভোগকারী OS পরিমাণ x দ্রব্য এবং OT পরিমাণ y দ্রব্য ক্রয় করেছে। এখন মনে করি, ক্রেতার আয় বাড়ল। দ্রব্য দুটির দাম অপরিবর্তিত আছে। তাহলে বাজেট রেখা সমান্তরালভাবে ডানদিকে সরে যাবে। মনে করি, এর নতুন অবস্থান হল A_1B_1। এই রেখা উচ্চতর নিরপেক্ষ রেখা I_1 কে E_1 বিন্দুতে স্পর্শ করেছে। সুতরাং E_1 হল নতুন ভারসাম্য বিন্দু। ভোগকারীর x দ্রব্যের চাহিদা SS_1 পরিমাণ এবং y-দ্রব্যের চাহিদা TT_1 পরিমাণ বাড়ল। এগুলি হল আয় প্রভাব। তেমনি, ভোগকারীর আয় আরো বাড়লে নতুন ভারসাম্য বিন্দু হবে E_2। এই E, E_1, E_2 প্রভৃতি বিন্দুগুলিকে যোগ করে আমরা পাই আয় ভোগ রেখা বা ICC। সুতরাং ICC হল পরপর সমান্তরাল বাজেট রেখা এবং নিরপেক্ষ রেখার স্পর্শবিন্দুগুলির সঞ্চারপথ। এই ICC হতেই ভোগকারীর আয় প্রভাব অর্থাৎ ভোগের উপর আয়ের পরিবর্তনের প্রভাব জানা যায়।

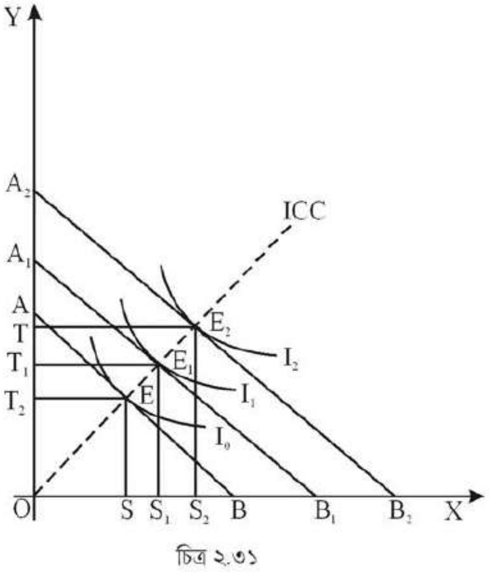

চিত্র ২.৩১

আমাদের চিত্রে ভোগকারীর আয় বাড়ার ফলে x এবং y উভয় দ্রব্যেরই চাহিদা বেড়েছে। এক্ষেত্রে x এবং y হল স্বাভাবিক দ্রব্য এবং ICC উর্ধ্বমুখী। কিন্তু যদি x দ্রব্যটি ক্রেতার নিকৃষ্ট দ্রব্য হয় তাহলে ক্রেতার আয় বাড়লে x দ্রব্যের চাহিদা কমবে এবং y দ্রব্যের চাহিদা বাড়বে। সেক্ষেত্রে ICC হবে y অক্ষের

দিকে অবতল। তেমনি, যদি y দ্রব্য নিকৃষ্ট দ্রব্য হয়, তাহলে ভোগকারীর আয় বাড়লে y দ্রব্যের চাহিদা কমবে এবং x দ্রব্যের চাহিদা বাড়বে। তখন ICC হবে x অক্ষের দিকে অবতল। x দ্রব্যের উপর আয় প্রভাব শূন্য হলে ICC হবে y অক্ষের সমান্তরাল। আর, y দ্রব্যের উপর আয় প্রভাব শূন্য হলে ICC হবে x অক্ষের সমান্তরাল।

২.৯.৩ পরিবর্ত প্রভাব

প্রকৃত আয় অপরিবর্তিত অবস্থায় দুটি দ্রব্যের আপেক্ষিক দামের পরিবর্তনের ফলে ভোগকারীর চাহিদার উপর যে প্রভাব পড়ে, তাকে পরিবর্ত প্রভাব বলে। আমরা ২.৩২ নং ছবিতে বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছি। মনে করি, ভোগকারীর প্রাথমিক বাজেট রেখা হল AB এবং প্রাথমিক ভারসাম্য বিন্দু হল E। তখন ভোগকারী OS পরিমাণ x দ্রব্য এবং OT পরিমাণ y দ্রব্য ক্রয় করছে। এখন, মনে করি, x দ্রব্যের দাম কমল। অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত রয়েছে। ফলে ভোগকারীর বাজেট লাইন AC-তে সরে গেল। এই AC রেখার ঢালের পরম মান হল x-দ্রব্যের আপেক্ষিক দাম। বাজেট রেখা AB থেকে AC তে সরে যাওয়ার ফলে x-এর আপেক্ষিক দাম কমে গেছে। আগে x-এর আপেক্ষিক দাম ছিল OA/AB। এখন, x-এর আপেক্ষিক দাম হল OA/OC। এই নতুন আপেক্ষিক দামে ভোগকারীর চাহিদার পরিবর্তনকে বলা হবে পরিবর্ত প্রভাব। কিন্তু তখন ভোগকারীর প্রকৃত আয় একই থাকতে হবে। Hicks-এর মতে, ভোগকারীর প্রকৃত আয় একই থাকবে যদি সে একই নিরপেক্ষ রেখার উপর অবস্থান করে। এজন্য আমরা AC বাজেট রেখাকে সমান্তরালভাবে DF-এ নামিয়ে আনলাম যাতে তা I_0 কে স্পর্শ করে। চিত্রে এই স্পর্শবিন্দু হল E_1। E হতে E_1 বিন্দুতে ভারসাম্যর পরিবর্তনকেই বলা হবে পরিবর্ত প্রভাব। এই পরিবর্ত প্রভাবের ফলে x দ্রব্যের চাহিদা SS_1 পরিমাণ বাড়ছে এবং y-দ্রব্যের চাহিদা TT_1 পরিমাণ কমেছে। এখানে x-দ্রব্য আপেক্ষিকভাবে সস্তা হয়েছে বলে তার চাহিদা বেড়েছে এবং y দ্রব্য আপেক্ষিকভাবে দামী হয়েছে বলে তার চাহিদা কমেছে।

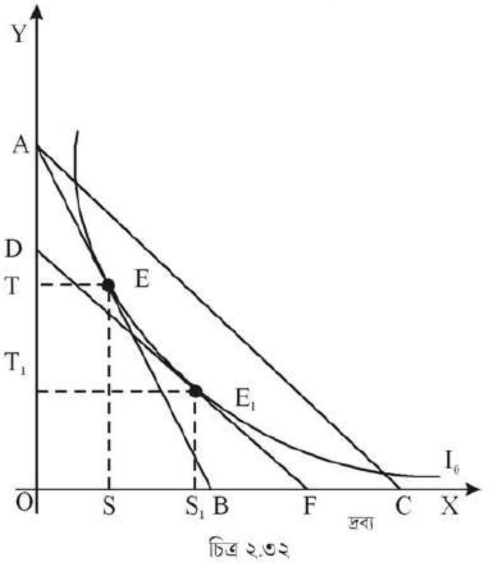

চিত্র ২.৩২

২.৯.৪ আয় প্রভাব এবং পরিবর্ত প্রভাবের সমষ্টি হিসাবে দাম প্রভাব বা, হিক্স কর্তৃক চাহিদার নিয়মের ব্যাখ্যা

অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত অবস্থায় কোনো দ্রব্যের দাম কমলে তার চাহিদা বাড়ে। এটিই হল চাহিদার নিয়ম। দামের পরিবর্তনের ফলে কোনো দ্রব্যের চাহিদার পরিবর্তনকে বলে দাম প্রভাব। হিক্স-এর মতে, চাহিদার নিয়মের পিছনে বা দাম প্রভাবের পিছনে দুটি শক্তি কাজ করে। **প্রথমত,** কোনো দ্রব্যের দাম কমলে দ্রব্যটি তার পরিবর্ত দ্রব্যের তুলনায় সস্তা হয়ে যায় অর্থাৎ এর আপেক্ষিক দাম কমে। ফলে ভোগকারী পরিবর্ত দ্রব্য কিছুটা কমিয়ে ঐ বিশেষ দ্রব্যটি কিছুটা বেশি কেনে। এটি পরিবর্ত প্রভাব। **দ্বিতীয়ত,** কোনো দ্রব্যের দাম কমলে ঐ দ্রব্যের অঙ্কে ক্রেতার আয় বা প্রকৃত আয় বেড়ে যায়। স্বাভাবিক দ্রব্যের ক্ষেত্রে আয় বাড়লে চাহিদা বাড়ে। এটি আয় প্রভাব। এই দুই প্রভাবের ফলে চাহিদার নিয়ম বা দাম প্রভাব কাজ করে। অর্থাৎ দাম প্রভাব হল আয় প্রভাব ও পরিবর্ত প্রভাবের সমষ্টি। (দাম প্রভাব = আয় প্রভাব + পরিবর্ত প্রভাব)।

২.৩৩ নং চিত্রে আমরা এটিকে ব্যাখ্যা করেছি। মনে করি, AB হল প্রাথমিক বাজেট রেখা এবং E হল প্রাথমিক ভারসাম্য বিন্দু। তখন ক্রেতা OS পরিমাণ x দ্রব্য ক্রয় করছে। এখন, অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত অবস্থায় x দ্রব্যের দাম কমল। ফলে বাজেট রেখা AC তে সরে গেল। নতুন ভারসাম্য বিন্দু হল E_2 যেখানে ভোগকারীর x দ্রব্যের চাহিদা হল OS_2। এখানে E ও E_2 বিন্দু যোগ করে আমরা পাই দাম ভোগ রেখা বা PCC। এই PCC থেকে দাম প্রভাব জানা যায় অর্থাৎ SS_2 হল দাম প্রভাব। এই দামপ্রভাব হল আয় প্রভাব ও পরিবর্ত প্রভাবের সমষ্টি। আমরা প্রথমে পরিবর্ত প্রভাব পরিমাপ করব।

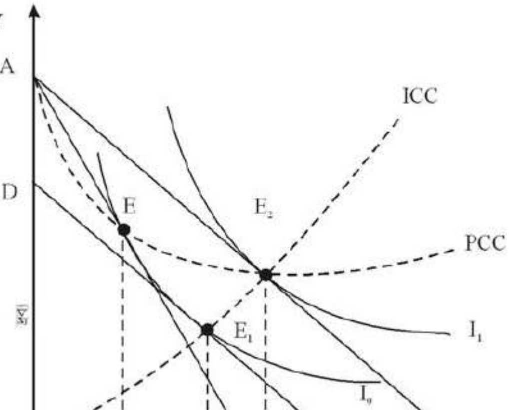

চিত্র ২.৩৩

পরিবর্ত প্রভাব পরিমাপ করতে হলে ক্রেতার প্রকৃত আয় অপরিবর্তিত রাখতে হবে। x দ্রব্যের দাম কমার ফলে ক্রেতার প্রকৃত আয় বেড়ে গেছে। হিক্স-এর মতে, ভোগকারী বা ক্রেতার প্রকৃত আয় অপরিবর্তিত

থাকবে যদি ক্রেতাকে পুরনো তৃপ্তির স্তরে রাখা যায়। তাই আমরা ক্রেতার AC বাজেট রেখাকে সমান্তরালভাবে নীচের দিকে নামিয়ে আনলাম যতক্ষণ না তা পুরনো নিরপেক্ষ রেখা I_0 কে স্পর্শ করে। চিত্রে DF বাজেট রেখা I_0 রেখাকে E_1 বিন্দুতে স্পর্শ করেছে। E_0 থেকে E_1-তে গমনকে বলা হবে পরিবর্ত প্রভাব। এই প্রভাবের ফলে ভোগকারী বাড়তি SS_1 পরিমাণ x দ্রব্য ক্রয় করছে। এখন, ভোগকারীকে যদি পূর্বের কমিয়ে দেওয়া আয় ফিরিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে তার বাজেট রেখা হবে AC এবং ভারসাম্য বিন্দু হবে E_2। এখানে E_1 ও E_2 বিন্দু যোগ করে আমরা পাই আয় ভোগ রেখা বা ICC। এই ICC থেকে আয় প্রভাব জানা যায়। সুতরাং, E_1 থেকে E_2তে গমন হল আয় প্রভাব। এর ফলে ভোগকারী S_1S_2 পরিমাণ বাড়তি x দ্রব্য ক্রয় করছে। অতএব, $SS_2 = SS_1 + S_1S_2$ অর্থাৎ দাম প্রভাব = পরিবর্ত প্রভাব + আয় প্রভাব। অন্যভাবে বলতে গেলে, দাম প্রভাব হল পরিবর্ত প্রভাব ও আয় প্রভাবের সমষ্টি। এভাবে নিরপেক্ষ রেখা তত্ত্বের প্রবক্তারা (হিক্স, অ্যালেন, এজওয়ার্থ, পারেতো প্রমুখ) চাহিদার নিয়মকে ব্যাখ্যা করেছেন।

আমাদের চিত্রে আয় প্রভাবের দরুন ভোগকারী x দ্রব্য বেশি কিনেছে। অর্থাৎ x এখানে স্বাভাবিক দ্রব্য। যে সকল দ্রব্যের ক্ষেত্রে ভোগকারীর আয় বাড়লে দ্রব্যের চাহিদা বাড়ে, তাদের স্বাভাবিক দ্রব্য বলে। কিন্তু কিছু দ্রব্যের ক্ষেত্রে ভোগকারীর আয় বাড়লে চাহিদা কমে। তাদের নিকৃষ্ট দ্রব্য বলে। এক্ষেত্রে আয় প্রভাব ঋণাত্মক। এখন, এই ঋণাত্মক আয় প্রভাব যদি পরিবর্ত প্রভাব অপেক্ষা ছোটো হয় তাহলেও দাম কমলে চাহিদা বাড়বে অর্থাৎ চাহিদার নিয়ম কাজ করবে। কিন্তু কিছু দ্রব্যের ক্ষেত্রে আয় প্রভাব শুধু ঋণাত্মকই নয়, সেই ঋণাত্মক আয় প্রভাব, পরিবর্ত প্রভাব অপেক্ষা বড়ো। এক্ষেত্রে দ্রব্যটির দাম কমলে চাহিদাও কমে যায়। এদের গিফেন দ্রব্য বলা হয়। সুতরাং গিফেন দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদার নিয়ম কাজ করে না। এভাবে, নিরপেক্ষ রেখা তত্ত্বের সাহায্যে শুধু চাহিদার নিয়মকেই ব্যাখ্যা করা হয় না, চাহিদার নিয়মের ব্যতিক্রমও ব্যাখ্যা করা যায়।

২.৯.৫ নিকৃষ্ট দ্রব্য ও গিফেন দ্রব্য

☐ **নিকৃষ্ট দ্রব্য :** ভোগকারীর আয় বাড়লে যে সকল দ্রব্যের চাহিদা কমে, তাদের নিকৃষ্ট দ্রব্য বলা হয়। অন্যভাবে, নিকৃষ্ট দ্রব্যের ক্ষেত্রে আয় প্রভাব ঋণাত্মক। এই ঋণাত্মক আয় প্রভাব পরিবর্ত প্রভাব অপেক্ষা ছোটো, সমান অথবা বড়ো হতে পারে। তবে নিরপেক্ষ রেখা তত্ত্বে নিকৃষ্ট দ্রব্য সেগুলিকে বলা হয় যাদের ক্ষেত্রে দাম কমলে পরিবর্ত প্রভাবের ফলে চাহিদা যতটা বাড়ে, আয় প্রভাবের ফলে চাহিদা ততটা কমে না। ফলে নিকৃষ্ট দ্রব্যের ক্ষেত্রে দাম কমলে চাহিদা বাড়ে অর্থাৎ চাহিদার নিয়ম কার্যকরী হয়। নিকৃষ্ট দ্রব্যের ক্ষেত্রেও চাহিদা রেখা বাঁদিক থেকে ডানদিকে নিম্নমুখী হয়।

☐ **গিফেন দ্রব্য :** গিফেন দ্রব্য হল সেই সমস্ত জোরালো নিকৃষ্ট দ্রব্য যাদের ক্ষেত্রে আয় প্রভাব শুধু ঋণাত্মকই নয়, এই ঋণাত্মক আয় প্রভাব পরিবর্ত প্রভাব অপেক্ষা বড়। লক্ষ করার বিষয় যে, গিফেন দ্রব্যের ক্ষেত্রেও আয় প্রভাব ঋণাত্মক অর্থাৎ গিফেন দ্রব্যও নিকৃষ্ট দ্রব্য। তবে এক্ষেত্রে ঋণাত্মক আয় প্রভাব

পরিবর্ত প্রভাবের চেয়ে বেশি শক্তিশালী। অন্যভাবে বলতে গেলে, সমস্ত গিফেন সমস্ত গিফেন দ্রব্যই নিকৃষ্ট দ্রব্য, কিন্তু সমস্ত নিকৃষ্ট দ্রব্যই গিফেন দ্রব্য নয়। গিফেন দ্রব্যের ক্ষেত্রে দাম কমলে পরিবর্ত প্রভাবের জন্য চাহিদা যতটা বাড়ে, আয় প্রভাবের জন্য চাহিদা তার চেয়ে বেশি কমে। ফলে দ্রব্যটির দাম কমলে চাহিদাও কমে যায় অর্থাৎ চাহিদার নিয়ম কাজ করে না। এক্ষেত্রে চাহিদা রেখা বাঁদিক থেকে ডানদিকে ঊর্ধ্বমুখী হয়।

২.১০ দাম ভোগ রেখা থেকে চাহিদা রেখা অঙ্কণ

দাম ভোগ রেখা বা PCC হল ভোগকারীর বাজেট রেখা ও নিরপেক্ষ রেখার স্পর্শবিন্দুর সঞ্চারপথ যখন অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত অবস্থায় কেবলমাত্র একটি দ্রব্যের দামের পরিবর্তন ঘটে। এই PCC বা Price Consumption Curve থেকে ভোগকারীর চাহিদা রেখা টানা যায়। বিষয়টি ২.৩৪ নং ছবিতে দেখানো হয়েছে। এই চিত্রের উপরের অংশ আমরা উল্লম্ব অক্ষে অর্থের (M) পরিমাণ এবং অনুভূমিক অক্ষে x দ্রব্যের পরিমাণ পরিমাপ করছি। মনে করি, ভোগকারীর অর্থের পরিমাণ হল OA এবং এর দ্বারা OB পরিমাণ x দ্রব্য পাওয়া যায়। সুতরাং ভোগকারীর বাজেট রেখা হল AB। তখন ভোগকারীর ভারসাম্য বিন্দু হল E এবং x দ্রব্য ক্রয়ের পরিমাণ হল OS। এখন, মনে করি, x দ্রব্যের দাম কমল। ফলে বাজেট রেখা হল AB_1। তখন ভারসাম্য বিন্দু হল E_1। দ্রব্যের দাম আরও কমলে বাজেট রেখা হল AB_2 এবং নতুন ভারসাম্য বিন্দু হল E_2। E, E_1, E_2 প্রভৃতি বিন্দুগুলি যোগ করে আমরা দাম ভোগ রেখা বা PCC পাই।

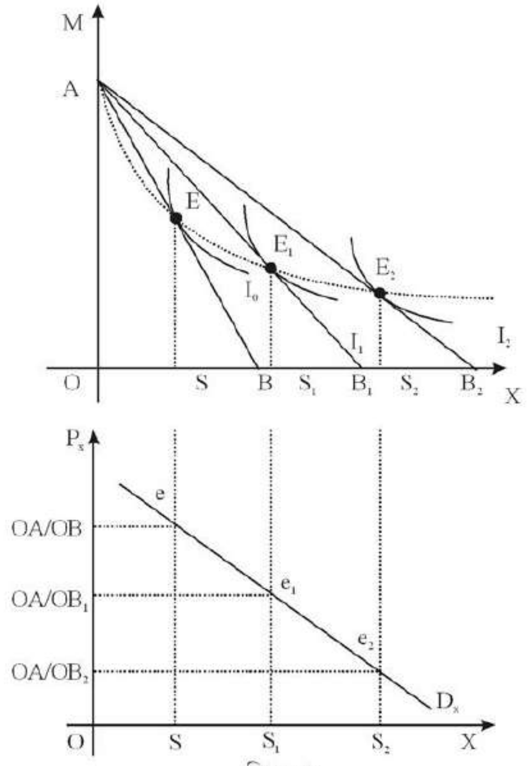

চিত্র ২.৩৪

এখন, PCC রেখা থেকে কীভাবে চাহিদা রেখা টানা যায় তা দেখা যাক। E বিন্দুতে ভোগকারীর চাহিদার পরিমাণ হল OS। তখন x দ্রব্যের দাম = OA/OB। দাম ও চাহিদার পরিমাণের এই সমন্বয়কে আমরা চিত্রের নীচের অংশে e বিন্দু দ্বারা প্রকাশ করেছি। তেমনি, যখন বাজেট রেখা AB_1, তখন দ্রব্যের ইউনিট প্রতি দাম হল OA/OB_1 এবং ভোগকারীর চাহিদার পরিমাণ হল OS_1। দাম ও চাহিদার এই সমন্বয়কে আমরা চিত্রের নীচের অংশে e_1 বিন্দু দ্বারা প্রকাশ করেছি। তেমনি E_2 বিন্দু থেকে পাই e_2 বিন্দু। e, e_1, e_2 প্রভৃতি বিন্দুগুলি যোগ করে আমরা ভোগকারীর চাহিদা রেখা (Dx) পাই। এই চাহিদা রেখা সাধারণত বাঁদিক থেকে ডানদিকে নিম্নমুখী হয়।

২.১১ সারাংশ

১. মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগ (Total Utility and Marginal Utility) : কোনো দ্রব্যের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ভোগ করে ভোগকারী যে পরিমাণ উপযোগ পায় তাই হল ঐ পরিমাণ দ্রব্যের মোট উপযোগ। অন্যদিকে, কোনো দ্রব্যের অতিরিক্ত এক একক ভোগ করলে মোট উপযোগের যে পরিবর্তন ঘটে তাকে ঐ অতিরিক্ত এককের প্রান্তিক উপযোগ বলে।

২. ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি বা নিয়ম (Law of Diminishing Marginal Utility) : অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত অবস্থায় ভোগকারী যদি কোনো দ্রব্যের ভোগ ক্রমাগত বাড়ায় তাহলে দ্রব্যটির প্রান্তিক উপযোগিতা ক্রমাগত কমতে থাকবে। একেই মার্শালের ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগের নিয়ম বা বিধি বলে।

৩. মার্শালের তত্ত্বে ভোগকারীর ভারসাম্য ও আচরণের ব্যাখ্যা (Explanation of Consumer's Equilibrium and Consumer's Behaviour in Marshallian Theory) : মার্শালের তত্ত্বে ভোগকারীর ভারসাম্যর শর্ত হল : (i) দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগিতা = দ্রব্যের দাম (MU = P)। (ii) MU কে ক্রমহ্রাসমান হতে হবে। এখন দাম কমলে ভারসাম্য বজায় রাখতে MU কে কমতে হবে। আর মার্শালের তত্ত্বে MU কমতে পারে যদি ভোগকারী দ্রব্যটির ভোগ বাড়ায়। সুতরাং দ্রব্যের দাম কমলে ভোগকারীর দ্রব্যটির চাহিদা বাড়বে। এটাই মার্শাল প্রদত্ত ভোগকারীর আচরণের বা চাহিদার নিয়মের ব্যাখ্যা।

৪. ভোগকারীর উদ্বৃত্ত (Consumer Surplus) : কোনো দ্রব্য পাবার জন্য ভোগকারী সর্বাধিক যে দাম দিতে ইচ্ছুক এবং যে দাম তাকে প্রকৃতই দিতে হয়, এই দুয়ের পার্থক্যকে বলা হয় ভোগকারীর উদ্বৃত্ত।

৫. নিরপেক্ষ রেখা ও নিরপেক্ষ মানচিত্র (Indifference Curve and Indifference Map) : নিরপেক্ষ রেখা হল সেই সমস্ত দ্রব্য সমন্বয়ের সঞ্চারপথ যা থেকে ভোগকারী একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ তৃপ্তি পেয়ে থাকে। একটি নির্দিষ্ট নিরপেক্ষ রেখার উপর সকল বিন্দুতে ভোগকারীর তৃপ্তির পরিমাণ সমান। একাধিক নিরপেক্ষ রেখা নিয়ে গঠিত হয় নিরপেক্ষ মানচিত্র। এই মানচিত্র ভোগকারীর রুচি, পছন্দ, অভ্যাস প্রভৃতি প্রকাশ বা বর্ণনা করে।

৬. নিরপেক্ষ রেখার বৈশিষ্ট্যসমূহ (Properties of an Indifference Curve) : নিরপেক্ষ রেখার বৈশিষ্ট্য চারটি : (i) নিরপেক্ষ রেখা বাঁদিক থেকে ডানদিকে নিম্নমুখী হবে। (ii) নিরপেক্ষ রেখা মূলবিন্দুর দিকে উত্তল হবে। (iii) দুটি নিরপেক্ষ রেখা একে অপরকে ছেদ বা স্পর্শ করবে না। (iii) উচ্চতর নিরপেক্ষ রেখা উচ্চতর তৃপ্তির স্তর নির্দেশ করবে। তবে দুটি দ্রব্য একে অপরের সম্পূর্ণ পরিবর্ত হলে নিরপেক্ষ রেখা নিম্নমুখী সরলরেখা হবে। আর, দুটি দ্রব্য একে অপরের সম্পূর্ণ পরিপূরক হলে নিরপেক্ষ রেখা ইংরাজি L অক্ষরের ন্যায় বা সমকোণবিশিষ্ট হবে।

৭. বাজেট রেখা বা দাম রেখা (Budget Line or Price Line) : বাজেট রেখা বা দাম রেখা হল সেই সমস্ত দ্রব্য সমন্বয়ের সঞ্চারপথ যা নির্দিষ্ট দামে কিনতে ক্রেতার একই ব্যয় পড়ে। ভোগকারীর আয় বা ব্যয় বাড়লে বাজেট রেখা সমান্তরালভাবে উপরের দিকে সরে যাবে। বিপরীত ক্ষেত্রে, বাজেট রেখা সমান্তরালভাবে নীচের দিকে সরে আসবে। তেমনি, কেবলমাত্র একটি দ্রব্যের দামের পরিবর্তন ঘটলে বাজেট রেখার একটি ছেদিতাংশ স্থির অবস্থায় অপর ছেদিতাংশের দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন ঘটবে।

৮. নিরপেক্ষ রেখা তত্ত্বে ভোগকারীর ভারসাম্য (Consumer's Equilibrium in Indifference Curve Theory) : নিরপেক্ষ রেখা তত্ত্বে ভোগকারীর ভারসাম্যর শর্ত হল দুটি : (i) প্রয়োজনীয় বা প্রথম ক্রমের শর্ত : নিরপেক্ষ রেখার ঢাল = বাজেট লাইনের ঢাল, বা $MU_1/MU_2 = P_1/P_2$ বা, $MRS = P_1/P_2$ । (ii) পর্যাপ্ত বা দ্বিতীয় ক্রমের শর্ত : নিরপেক্ষ রেখাকে মূলবিন্দুর দিকে উত্তল হতে হবে।

৯. নিরপেক্ষ রেখা তত্ত্বের সাহায্যে ভোগকারীর আচরণের বা চাহিদার নিয়মের ব্যাখ্যা (Explanation of Consumer's Behaviour or, Law of Demand in Indifference Curve Theory) : অধ্যাপক হিক্স-এর মতে, কোনো দ্রব্যের দাম কমলে ভোগকারীর চাহিদা বা ভোগ বাড়ার পিছনে দুটি শক্তি কাজ করে। **প্রথমত,** দাম কমলে দ্রব্যটি তার পরিবর্ত দ্রব্যের তুলনায় সস্তা হয়ে যায়। ফলে ভোগকারী পরিবর্ত দ্রব্যের ক্রয় কমিয়ে ঐ বিশেষ দ্রব্যটি কিছুটা বেশি কেনে। এটি হল পরিবর্ত প্রভাব। **দ্বিতীয়ত,** কোনো দ্রব্যের দাম কমলে ঐ দ্রব্যের অঙ্কে ভোগকারীর আয় অর্থাৎ প্রকৃত আয় বেড়ে যায়। প্রকৃত আয় বা ক্রয়ক্ষমতার পরিবর্তন হলেও চাহিদার পরিবর্তন ঘটে। একে বলে আয় প্রভাব। পরিবর্ত প্রভাব এবং আয় প্রভাবের সম্মিলিত ফল হল দাম প্রভাব। এই দুই প্রভাবের ফলেই দাম প্রভাব বা চাহিদার নিয়ম কাজ করে।

১০. নিকৃষ্ট দ্রব্য ও গিফেন দ্রব্য (Inferior Goods and Giffen Goods) : ভোগকারীর আয় বাড়লে যে সকল দ্রব্যের চাহিদা কমে তাদের নিকৃষ্ট দ্রব্য বলা হয়। এক্ষেত্রে দ্রব্যটির চাহিদার উপর আয় প্রভাব ঋণাত্মক। অন্যদিকে, গিফেন দ্রব্য হল সেই সমস্ত জোরালো নিকৃষ্ট দ্রব্য যার ক্ষেত্রে আয় প্রভাব শুধু ঋণাত্মকই নয়, তা পরিবর্ত প্রভাব অপেক্ষা বড়। সুতরাং, সব গিফেন দ্রব্যই নিকৃষ্ট দ্রব্য, কিন্তু সব নিকৃষ্ট দ্রব্যই গিফেন দ্রব্য নয়। নিকৃষ্ট দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদার নিয়ম খাটে, কিন্তু গিফেন দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদার নিয়ম খাটে না।

২.১২ অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্নাবলি (প্রতিটি প্রশ্ন ২ নম্বরের) (Short Answer Type Questions : Each of 2 Marks)

১. মোট উপযোগ কাকে বলে?

২. প্রান্তিক উপযোগ কাকে বলে?

৩. ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিটি বিবৃত করুন।

৪. মার্শালের তত্ত্বে ভোগকারীর ভারসাম্যর শর্ত কী কী?

৫. ভোগকারীর উদ্বৃত্ত কাকে বলে?

৬. নিরপেক্ষ রেখা কাকে বলে?

৭. নিরপেক্ষ মানচিত্র কী?

৮. বাজেট রেখা বা দাম রেখা কাকে বলে?

৯. নিরপেক্ষ রেখা তত্ত্বে ভোগকারীর ভারসাম্যর শর্তগুলি কী কী?

১০. নিরপেক্ষ রেখা তত্ত্বে কৌণিক সমাধান কাকে বলে?

১১. দাম ভোগ রেখার সংজ্ঞা দিন।

১২. দাম প্রভাব কাকে বলে?

১৩. আয় ভোগ রেখার সংজ্ঞা দিন।

১৪. আয় প্রভাব কাকে বলে?

১৫. পরিবর্ত প্রভাব কাকে বলে?

১৬. দাম প্রভাব, আয় প্রভাব ও পরিবর্ত প্রভাবের মধ্যে সম্পর্ক কী?

১৭. নিকৃষ্ট দ্রব্য কাকে বলে?

১৮. গিফেন দ্রব্য কাকে বলে?

১৯. মোট উপযোগ সর্বাধিক হলে বা স্থির থাকলে প্রান্তিক উপযোগ কত হবে?

২০. প্রান্তিক উপযোগিতা তত্ত্বের দুটি সীমাবদ্ধতা উল্লেখ করুন।

২১. সম্পূর্ণ পরিবর্ত দুটি দ্রব্যের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ রেখার আকৃতি কেমন হবে?

২২. সম্পূর্ণ পরিপূরক দুটি দ্রব্যের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ রেখার আকৃতি কীরূপ?

২৩. ভোগকারীর আয়ের পরিবর্তন ঘটলে বাজেট রেখার কীরূপ পরিবর্তন ঘটবে?

২৪. বাজেট রেখার সমীকরণটি লিখুন।

২৫. প্রান্তিক পরিবর্তনের হার (MRS) কাকে বলে?

২৬. ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক পরিবর্ততার নিয়মটি বিবৃত করুন।

২৭. অ-পরিতৃপ্তির অনুমান কাকে বলে?

মাঝারি দৈর্ঘ্যের উত্তরের প্রশ্নাবলি (প্রতিটি ৫ নম্বরের) (Medium Answer Type Questions : Each of 5 Marks)

১. ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিটি বর্ণনা করুন।

২. ভোগকারীর উদ্বৃত্ত আপনি কীভাবে পরিমাপ করবেন।

৩. দেখাও যে, নিরপেক্ষ রেখা বাঁদিক থেকে ডানদিকে নিম্নমুখী হবে।

৪. প্রমাণ করুন যে, নিরপেক্ষ রেখা মূলবিন্দুর দিকে উত্তল হবে।

৫. দুটি নিরপেক্ষ রেখা একে অপরকে ছেদ বা স্পর্শ করতে পারে না, এটা প্রমাণ করুন।

৬. দেখান যে উচ্চতর নিরপেক্ষ রেখা উচ্চতর তৃপ্তির স্তর নির্দেশ করে।

৭. দাম ভোগ রেখার ধারণা ব্যাখ্যা করুন।

৮. আয় ভোগ রেখা ও আয় প্রভাবের সম্পর্ক দেখান।

৯. পরিবর্ত প্রভাবের ধারণাটি বুঝিয়ে বলুন।

১০. সম্পূর্ণ পরিবর্ত দ্রব্যের ক্ষেত্রে ক্রেতার ভারসাম্য দেখান।

১১. সম্পূর্ণ পরিপূরক দ্রব্যের ক্ষেত্রে ক্রেতার ভারসাম্য আলোচনা করুন।

১২. ভোগকারীর নিরপেক্ষ রেখা মূলবিন্দুর দিকে অবতল হলে ঐ ভোগকারীর ভারসাম্য অবস্থা দেখান।

১৩. নিকৃষ্ট ও গিফেন দ্রব্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন।

১৪. প্রান্তিক উপযোগিতা তত্ত্বের সীমাবদ্ধতাগুলি উল্লেখ করুন।

১৫. নিরপেক্ষ রেখা তত্ত্বের প্রধান অনুমানগুলি বিবৃত করুন।

১৬. প্রান্তিক উপযোগ তত্ত্বের অনুমানগুলি উল্লেখ করুন।

১৭. ভোগকারীর উদ্বৃত্ত কাকে বলে? এই ধারণার কয়েকটি সীমাবদ্ধতা বলুন।

দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্নাবলি (প্রতিটি প্রশ্ন ১০ নম্বরের) (Long Answer Type Questions : Each of 10 Marks)

১. প্রান্তিক উপযোগ তত্ত্বে ভোগকারীর ভারসাম্য আলোচনা করুন।

২. প্রান্তিক উপযোগ তত্ত্বের মাধ্যমে ভোগকারীর আচরণ ব্যাখ্যা করুন।

৩. নিরপেক্ষ রেখার বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করুন এবং সেগুলি প্রমাণ করুন।

৪. নিরপেক্ষ রেখা তত্ত্বে ক্রেতার ভারসাম্য আলোচনা করুন।

৫. বাজেট রেখা এবং এর স্থানান্তর সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন।

৬. নিরপেক্ষ রেখা তত্ত্বের সাহায্যে চাহিদার নিয়ম ব্যাখ্যা করুন।

৭. দেখান যে, দাম প্রভাব = পরিবর্ত প্রভাব + আয় প্রভাব।

৮. কয়েকটি অস্বাভাবিক ক্ষেত্রে ক্রেতার ভারসাম্য আলোচনা করুন।

৯. দাম ভোগ রেখা থেকে ভোগকারীর চাহিদা রেখা অঙ্কন করুন।

১০. সম্পূর্ণ পরিবর্ত এবং সম্পূর্ণ পরিপূরক দ্রব্যের ক্ষেত্রে ভোগকারীর ভারসাম্য দেখান।

২.১৩ নির্বাচিত গ্রন্থতালিকা

১. Samuelson, P.A. and William Nordhaus (1985) : Economics, McGraw Hill.

২. Stonier A.W. & D.C. Hague (1957) : A Text Book of Economic Theory, Orient Longman.

৩. সরখেল, জয়দেব (১৯৯৮) : আধুনিক অর্থনীতির ভূমিকা, বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড।

৪. Ahuja, H.L. (1979) : Advanced Economic Theory, S. Chand & Co.

৫. Koutsoyiannis, A. (1979) : Modern Microeconomics, Macmillan.

৬. Lipsey, R. (1983) : An Introduction to Positive Economics, ELBS

৭. Mankiw, N. G. (2007) : Economics, Cengage Learning.

একক ৩ ❑ চাহিদার নিয়ম

গঠন

৩.১ উদ্দেশ্য

৩.২ প্রস্তাবনা

৩.৩ চাহিদার সংজ্ঞা

৩.৩.১ ব্যক্তিগত চাহিদা ও বাজার চাহিদা

৩.৩.২ চাহিদা নির্ধারণকারী বিষয়সমূহ

৩.৪ চাহিদার নিয়ম

৩.৪.১ চাহিদা তালিকা : ব্যক্তিগত ও বাজার চাহিদা তালিকা

৩.৪.২ চাহিদা রেখা : ব্যক্তিগত ও বাজার চাহিদা রেখা

৩.৪.৩ চাহিদার নিয়মের ব্যাখ্যা বা চাহিদার নিয়ম কেন কার্যকরী হয়

৩.৪.৪ চাহিদার নিয়মের ব্যতিক্রম

৩.৫ চাহিদা অপেক্ষক

৩.৫.১ সরলরৈখিক ও বক্ররৈখিক চাহিদা রেখা

৩.৫.২ চাহিদা রেখার স্থানান্তর বা, চাহিদার পরিমাণে পরিবর্তন ও চাহিদায় পরিবর্তন

৩.৬ চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা

৩.৬.১ চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার প্রকারভেদ

৩.৬.২ চাহিদার নিজস্ব দামগত স্থিতিস্থাপকতা

৩.৬.৩ চাহিদার আয়গত স্থিতিস্থাপকতা

৩.৬.৪ চাহিদার আয়গত স্থিতিস্থাপতার পরিমাপ

৩.৬.৫ চাহিদার পারস্পরিক (দামগত) স্থিতিস্থাপকতা

৩.৭ মার্শালের পদ্ধতি বা মোট ব্যয় দ্বারা চাহিদার দামগত স্থিতিস্থাপকতার পরিমাপ

৩.৭.১ জ্যামিতিক পদ্ধতির দ্বারা চাহিদার দামগত স্থিতিস্থাপকতার পরিমাপ

৩.৮ মান অনুসারে চাহিদার দামগত স্থিতিস্থাপকতার প্রকারভেদ

৩.৯ চাহিদার দামগত স্থিতিস্থাপকতা নির্ধারণকারী বিষয়সমূহ

৩.১০ অর্থশাস্ত্রে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ধারণাটির ব্যবহার বা গুরুত্ব

৩.১১ সারাংশ

৩.১২ অনুশীলনী

৩.১৩ নির্বাচিত গ্রন্থতালিকা

৩.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে শিক্ষার্থীরা জানতে পারবে

- চাহিদার নিয়ম ও তার ব্যাখ্যা
- চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ও তার প্রকারভেদ
- চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা নির্ধারণকারী বিষয়সমূহ
- অর্থশাস্ত্রে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ধারণাটির প্রয়োগ বা গুরুত্ব

৩.২ প্রস্তাবনা

অর্থনীতিতে সর্বত্র কাজ করে এমন দুটি অমোঘ শক্তি হল চাহিদা ও জোগান। এই দুই শক্তি দ্বারাই যাবতীয় অর্থনৈতিক কাজকর্ম প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। বর্তমান এককে চাহিদার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হবে। প্রথমে আমরা চাহিদা বলতে কী বুঝি এবং তা কী কী বিষয়ের উপর নির্ভর করে তা উল্লেখ করব। চাহিদার নিয়মটি কী এবং তা প্রকাশ করার জন্য যে চাহিদা তালিকা, চাহিদা রেখা এবং চাহিদা অপেক্ষকের ধারণা ব্যবহার করা হয়, তাও এই এককে আলোচনা করা হবে। চাহিদার নিয়মের কিছু ব্যতিক্রম আছে। সেগুলিও এই প্রসঙ্গে বিবেচনা করা হবে। চাহিদার আলোচনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা হল চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা। এই চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার প্রকারভেদ, পরিমাপ এবং নির্ধারক বিষয়গুলি নিয়েও আলোচনা করা হবে। সবশেষে, অর্থশাস্ত্রে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ধারণাটির গুরুত্ব সম্পর্কেও ইঙ্গিত দেওয়া হবে।

৩.৩ চাহিদার সংজ্ঞা

অর্থনীতিতে চাহিদা হল ক্রয়ক্ষমতা দ্বারা সমর্থিত ক্রয়ের ইচ্ছা (Desire backed by purchasing power)। সাধারণ অর্থে আমরা চাহিদা বলতে বুঝি কোনো দ্রব্য পাবার ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু অর্থনীতিতে শুধু পাবার ইচ্ছাকেই চাহিদা বলা হবে না। ঐ দ্রব্যটি পাবার জন্য উপযুক্ত অর্থমূল্য দেবার ক্ষমতা ভোগকারীর থাকতে হবে। সুতরাং, অর্থনীতিতে চাহিদা বলতে বুঝি ক্রয়ের ইচ্ছা ও ক্রয়ের ক্ষমতার একত্র উপস্থিতি (willingness to purchase and ability to purchase)। ভোগকারী যদি কোনো দ্রব্য বা সেবাকার্য কিনতে চায় এবং সেই দ্রব্য বা সেবাকার্য কেনার জন্য উপযুক্ত অর্থমূল্য দেবার ক্ষমতাও যদি ভোগকারীর থাকে, তবেই তাকে অর্থনীতিতে চাহিদা বলা হবে।

৩.৩.১ ব্যক্তিগত চাহিদা ও বাজার চাহিদা

চাহিদার আলোচনা দুটি স্তরে হতে পারে : ব্যক্তিগত স্তরে এবং সামগ্রিক বা বাজার স্তরে। ব্যক্তিগত চাহিদা বলতে কোনো ব্যক্তি বা পরিবার কোনো বিশেষ দ্রব্য বা সেবাকার্য কী পরিমাণ কিনতে চায় তাকেই বোঝায়। আর বাজার চাহিদা বলতে সমস্ত ব্যক্তি বা পরিবার মিলে ঐ দ্রব্য বা সেবাকার্য মোট যতটা পরিমাণ কিনতে চাইছে তাকেই বোঝায়। ব্যক্তিগত চাহিদা থেকেই মোট বা বাজার চাহিদা জানা যায়। কোনো একটি অবস্থায় ব্যক্তিগত চাহিদাগুলিকে যোগ করলেই মোট বা বাজার চাহিদা পাওয়া যায়।

৩.৩.২ চাহিদা নির্ধারণকারী বিষয়সমূহ

কোনো দ্রব্যের চাহিদা একাধিক বিষয়ের উপর নির্ভর করে। এই চাহিদা আবার ব্যক্তিগত চাহিদা হতে পারে অথবা মোট বা বাজার চাহিদা হতে পারে। সুতরাং চাহিদা কী কী বিষয়ের উপর নির্ভর করে তার আলোচনা দুটি স্তরে করা দরকার : একটি হল ব্যক্তিগত স্তরে এবং অপরটি হল সামগ্রিক স্তরে।

☐ ব্যক্তিগত চাহিদা নির্ধারণকারী বিষয়সমূহ (Factors determining individual demand) : ব্যক্তিগত চাহিদা প্রধানত নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর নির্ভর করে :

১. দ্রব্য বা সেবাকার্যের দাম : কোনো দ্রব্য বা সেবাকার্যের ব্যক্তিগত চাহিদা ঐ দ্রব্য বা সেবাকার্যের দামের উপর নির্ভর করে। সাধারণত দাম কমলে চাহিদা বাড়ে এবং দাম বাড়লে চাহিদা কমে। একেই চাহিদার নিয়ম বলা হয়। এই বিষয়ে পরের বিভাগে বিশদে আলোচনা করা হয়েছে।

২. ব্যক্তির আয় : ব্যক্তির আয়ের উপরও ব্যক্তিগত চাহিদা নির্ভর করে। সাধারণত, আয় বাড়লে ব্যক্তির চাহিদা বাড়ে কারণ তখন ব্যক্তির ক্রয়ক্ষমতা বাড়ে। ভোগকারীর আয় বাড়লে যে সকল দ্রব্যের চাহিদা বাড়ে, তাদের স্বাভাবিক দ্রব্য (normal goods) বলা হয়। তবে, কোনো কোনো দ্রব্যের ক্ষেত্রে ভোগকারীর আয় বাড়লে ঐ সকল দ্রব্যের চাহিদা কমে। এদের নিকৃষ্ট দ্রব্য (inferior goods) বলে। ভোগকারীর আয় বাড়লে সে নিকৃষ্ট দ্রব্য কম কিনে উৎকৃষ্ট দ্রব্য বেশি পরিমাণ কিনতে পারে।

(iii) সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের দাম : কোনো দ্রব্যের ব্যক্তিগত চাহিদা সেই দ্রব্যের সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের দাম অর্থাৎ পরিবর্ত ও পরিপূরক দ্রব্যের দামের উপরও নির্ভর করে। যে সকল দ্রব্য একই ধরনের প্রয়োজন মেটায় তাদের পরিবর্ত দ্রব্য (substitute goods) বা বিকল্প দ্রব্য বলে। যেমন, মাছ ও মাংস। এক্ষেত্রে, একটি দ্রব্যের চাহিদা অপর দ্রব্যের দামের উপরও নির্ভর করে। যেমন, মাংসের দাম বাড়লে মাছের চাহিদা বাড়বে। আবার, যদি দুটি দ্রব্য এমন হয় যে তাদের একসঙ্গে ভোগ বা ব্যবহার করতে হয় তাহলে তাদের বলা হয় পরিপূরক দ্রব্য (complementary goods) বা অনুপূরক দ্রব্য বলে। যেমন, চা ও চিনি। চায়ের দাম কমলে চায়ের চাহিদা বাড়বে এবং এর সাথে চিনির চাহিদাও বাড়বে।

(iv) ভোগকারীর রুচি ও পছন্দ : কোনো দ্রব্যের ব্যক্তিগত চাহিদা ব্যক্তির রুচি ও পছন্দের উপরও নির্ভর করে। রুচি ও পছন্দের পরিবর্তন ঘটলে ব্যক্তির চাহিদারও পরিবর্তন ঘটবে।

(v) ভবিষ্যৎ দাম সম্পর্কে ভোগকারীর প্রত্যাশা : কোনো দ্রব্যের ভবিষ্যৎ দাম সম্পর্কে ভোগকারীর প্রত্যাশাও তার ব্যক্তিগত চাহিদাকে প্রভাবিত করে। মনে করি, ভোগকারী ভাবছে যে, দ্রব্যটির দাম ভবিষ্যতে বাড়বে, তাহলে সে আগে থেকেই ভবিষ্যতের জন্য কিনে রাখবে। ফলে তার চাহিদা স্বাভাবিকের থেকে বেশি হবে। বিপরীত ক্ষেত্রে, চাহিদা স্বাভাবিকের থেকে কম হবে।

(vi) প্রদর্শন প্রভাব : অপরের দেখাদেখি অথবা অপরকে দেখানোর জন্য যদি ভোগকারী কোনো দ্রব্য ভোগ করে তাহলে তাকে বলে প্রদর্শন প্রভাব (demonstration effect)। James Duesenberry-র মতে, ব্যক্তিগত চাহিদার একটি প্রধান নির্ধারক হল প্রদর্শন প্রভাব। যেমন, প্রতিবেশীর দেওয়াল টি.ভি. দেখে কোনো ব্যক্তি ঐরকম টি.ভি. কিনলে তা হবে প্রদর্শন প্রভাবের উদাহরণ।

☐ বাজার চাহিদা নির্ধারণকারী বিষয়সমূহ (Factors affecting market demand) :

ব্যক্তিগত চাহিদাগুলিকে যোগ করেই আমরা বাজার চাহিদা পেয়ে থাকি। সুতরাং, ব্যক্তিগত চাহিদা যে সকল বিষয়ের উপর নির্ভর করে, বাজার চাহিদাও সেই সকল বিষয়ের উপর নির্ভর করে। এছাড়াও বাজার চাহিদা প্রধানত নীচের বিষয়গুলির উপরও নির্ভর করে।

(i) ক্রেতার সংখ্যা : বাজারে ক্রেতার সংখ্যার উপরও বাজার চাহিদা নির্ভর করে। ক্রেতার সংখ্যা বাড়লে বাজার চাহিদা বাড়বে এবং ক্রেতার সংখ্যা কমলে বাজার চাহিদাও কমবে।

(ii) জনসংখ্যা : জনসংখ্যার উপরও বাজার চাহিদা নির্ভর করে। সাধারণত, জনসংখ্যা বাড়লে বাজার চাহিদা বাড়বে এবং জনসংখ্যা কমলে বাজার চাহিদা কমবে।

(iii) জনসংখ্যার বয়সের গঠন : কোনো কোনো দ্রব্যের বাজার চাহিদা আবার জনসংখ্যার বয়সের গঠনের উপরও নির্ভর করে। যেমন, বেবিফুডের চাহিদা দেশে শিশুর সংখ্যার উপরও নির্ভর করে।

(iv) বিজ্ঞাপন ব্যয় : বিজ্ঞাপনের দ্বারা চাহিদাকে প্রভাবিত করা যায়। সুতরাং, কোনো দ্রব্যের উপর

বিজ্ঞাপন ব্যয় যত বেশি হবে, ঐ দ্রব্যের চাহিদা তত বেশি হবে কেননা বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে বেশি বেশি ক্রেতা ঐ দ্রব্যের প্রতি আকৃষ্ট হবে।

(v) ভোগঋণের শর্তাবলি : অনেক স্থায়ী ভোগ্যদ্রব্য ধারে বিক্রি হয়। ক্রেতাকে কিস্তিতে ঐ ঋণের টাকা শোধ দিতে হয়। এই ঋণের শর্তাবলি যত উদার হবে, ঐ ধরনের ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা তত বেশি হবে। বিপরীত ক্ষেত্রে চাহিদা কম হবে।

(vi) নতুন দ্রব্যের প্রচলন : বাজারে নতুন দ্রব্যের প্রচলন হলে তার পরিবর্ত পুরনো দ্রব্যের চাহিদা কমে যাবে। যেমন, বাজারে কোনো নতুন মডেলের স্মার্টফোন এলে পুরনো মডেলের চাহিদা কমবে।

(vii) আয়ের বন্টন : কোনো দ্রব্যের মোট বা বাজার চাহিদা ক্রেতাদের আয় বণ্টনের উপরও নির্ভর করে। বিভিন্ন ব্যক্তির ভোগ প্রবণতা বিভিন্ন। ফলে আয় বণ্টনে পরিবর্তন ঘটলে মোট বা বাজার চাহিদাও পরিবর্তিত হবে।

৩.৪ চাহিদার নিয়ম

অধ্যাপক মার্শাল সর্বপ্রথম চাহিদার নিয়মটি সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন। এই নিয়মে কোনো দ্রব্যের দামের সঙ্গে চাহিদার সম্পর্ককে বিবৃত করা হয়েছে। চাহিদার নিয়মটিতে বলা হয় যে, ক্রেতার রুচি ও পছন্দ, ক্রেতার আয়, অন্যান্য দ্রব্যের দাম, সময়কাল ইত্যাদি অপরিবর্তিত থাকলে কোনো দ্রব্যের দাম বাড়লে সেই দ্রব্যের চাহিদা কমবে এবং দাম কমলে সেই দ্রব্যের চাহিদা বাড়বে। এটিকেই চাহিদার সাধারণ নিয়ম বলা হয়। চাহিদার নিয়ম কোনো দ্রব্যের দামের সঙ্গে সেই দ্রব্যের চাহিদার বিপরীত সম্পর্ক প্রকাশ করে। এই চাহিদার নিয়মকে আমরা প্রধানত দু'ভাবে প্রকাশ করতে পারি : চাহিদা তালিকার দ্বারা এবং চাহিদা রেখার দ্বারা। এই দুটি ধারণা আমরা নীচের বিভাগে আলোচনা করেছি।

৩.৪.১ চাহিদা তালিকা : ব্যক্তিগত ও বাজার চাহিদা তালিকা

চাহিদার নিয়মকে চাহিদা তালিকা দ্বারা প্রকাশ করা যেতে পারে। যে তালিকার মাধ্যমে কোনো দ্রব্যের বিভিন্ন কাল্পনিক দামে চাহিদার পরিমাণ প্রকাশ করা হয় তাকে চাহিদা তালিকা বলে। চাহিদা যেমন দু'রকমের—ব্যক্তিগত ও বাজার চাহিদা, তেমনি চাহিদা তালিকাও দু'রকমের : ব্যক্তিগত চাহিদা তালিকা ও বাজার চাহিদা তালিকা। কোনো দ্রব্যের বিভিন্ন কাল্পনিক (hypothetical) দামে কোনো ভোগকারী ঐ দ্রব্য যে যে পরিমাণ কিনতে চায়, সেই পরিমাণগুলিকে একটি তালিকার মাধ্যমে প্রকাশ করা হলে তাকে বলে ব্যক্তিগত চাহিদা তালিকা। একটি কাল্পনিক উদাহরণের সাহায্যে ব্যক্তিগত চাহিদা তালিকার ধারণাটি বোঝানো যেতে পারে। পাশে আমরা একটি ব্যক্তিগত ব্যক্তিগত চাহিদা তালিকা দেখিয়েছি।

দাম (টাকায়)	পরিমাণ (কিলোগ্রামে)
১০	২০
৮	৩০
৬	৫০

দ্রব্যটির কিলোগ্রাম প্রতি দাম ১০ টাকা হলে ভোগকারী কিনতে চায় ২০ কিলোগ্রাম। দাম ৮ টাকা হলে সে কিনতে চায় ৩০ কিলোগ্রাম ইত্যাদি। দেখা যাচ্ছে, দাম কমলে ব্যক্তিগত চাহিদার পরিমাণ বাড়ছে। এটাই চাহিদার নিয়ম।

অন্যদিকে, বিভিন্ন কাল্পনিক দামে বাজারের সমস্ত ক্রেতা মিলে কোনো দ্রব্য যে বিভিন্ন পরিমাণ কিনতে ইচ্ছুক, তা একটি তালিকার মাধ্যমে প্রকাশ করলে তাকে বলা হয় বাজার চাহিদা তালিকা বা মোট চাহিদা তালিকা। ব্যক্তিগত চাহিদা তালিকা থেকেই আমরা বাজার চাহিদা তালিকা পাই। মনে করি, বাজারে ৫০ জন ক্রেতা আছে। আরো মনে করি, প্রত্যেক দামে সব ক্রেতাই একই পরিমাণ দ্রব্যটি কিনছে। তাহলে কোনো একজন ক্রেতার চাহিদাকে ক্রেতার সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে বাজার চাহিদা পাওয়া যাবে। পাশের দ্বিতীয় তালিকায় এটা দেখানো হয়েছে। ১০ টাকা দামে একজন ক্রেতার চাহিদা ছিল ২০ কিলোগ্রাম। সুতরাং, ৫০ জন ক্রেতার মোট চাহিদা = (২০ × ৫০) কিলোগ্রাম = ১,০০০ কিলোগ্রাম। তেমনি ৮ টাকা দামে মোট চাহিদা = (৩০ × ৫০) কিলোগ্রাম = ১,৫০০ কিলোগ্রাম ইত্যাদি। দেখা যাচ্ছে, দাম কমলে বাজার চাহিদা বাড়ছে। চাহিদার নিয়মের দরুন দাম কমলে প্রত্যেক ক্রেতার চাহিদা বাড়ছে। ফলে বাজার চাহিদাও বাড়ছে।

দাম (টাকায়)	মোট চাহিদা (কিলোগ্রামে)
১০	২০×৫০=১,০০০
৮	৩০×৫০=১,৫০০
৬	৫০×৫০=২,৫০০

৩.৪.২ চাহিদা রেখা : ব্যক্তিগত ও বাজার চাহিদা রেখা

চাহিদার তালিকাকে রেখাচিত্রে প্রকাশ করলে যে রেখা পাওয়া যায় তাকে বলে চাহিদা রেখা। চাহিদা তালিকা যেমন দু'রকমের : ব্যক্তিগত ও বাজার চাহিদা তালিকা; তেমনি চাহিদা রেখাও দু'রকমের : ব্যক্তিগত ও বাজার চাহিদা তালিকা; তেমনি চাহিদা রেখাও দু'রকমের : ব্যক্তিগত ও বাজার চাহিদা রেখা। যে রেখা থেকে বিভিন্ন কাল্পনিক দামে কোনো দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ জানা যায়, তাকে চাহিদা রেখা বলে। ব্যক্তিগত চাহিদা রেখা থেকে কোনো ক্রেতার ব্যক্তিগত চাহিদার পরিমাণ জানা যায়। আর বাজার চাহিদা রেখা থেকে বাজারের সমস্ত ক্রেতার মোট চাহিদার পরিমাণ জানা যায়। ৩.১নং চিত্রে আমরা একটি ব্যক্তিগত চাহিদা রেখা এঁকেছি। আমরা অনুভূমিক অক্ষে চাহিদার পরিমাণ এবং উল্লম্ব অক্ষে দ্রব্যের দাম পরিমাপ করছি। যখন দ্রব্যের দাম OP_0, তখন চাহিদার পরিমাণ OD_0। A বিন্দু হল চাহিদা রেখার উপর একটি বিন্দু। এখন দ্রব্যের দাম কমে OP_1 হলে চাহিদা বেড়ে OD_1 হয়। চাহিদা রেখার উপর নতুন বিন্দু হল B। তেমনি, দাম বেড়ে OP_2 হলে চাহিদা কমে OD_2 হয়। তখন চাহিদা রেখার উপর বিন্দুটি হল C। এই A, B, C প্রভৃতি বিন্দুগুলোকে যোগ করে পাই ব্যক্তিগত চাহিদা রেখা। এই চাহিদা রেখা বাঁদিক থেকে ডানদিকে নিম্নমুখী। চাহিদার নিয়ম থেকে আমরা জানি যে, দ্রব্যের দামের সঙ্গে চাহিদার পরিমাণের বিপরীত সম্পর্ক আছে। একটি নিম্নমুখী রেখাই এই বিপরীত সম্পর্ক প্রকাশ করতে পারে। সুতরাং চাহিদার

নিয়ম কার্যকরী হলে চাহিদা রেখা বাঁদিক থেকে ডানদিকে নিম্নমুখী হবে। এটি সরলরেখা হতে পারে, আবার বক্ররেখাও হতে পারে, তবে সাধারণত নিম্নমুখী হবে।

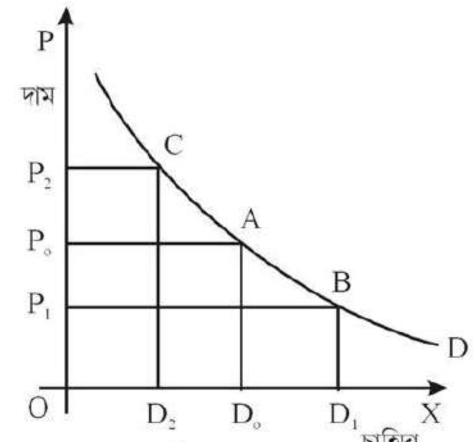

চিত্র ৩.১

অন্যদিকে, ব্যক্তিগত চাহিদা রেখাগুলিকে অনুভূমিকভাবে যোগ করে বাজার চাহিদা রেখা পাওয়া যায়। মনে করি, বাজারে দু'জন ক্রেতা আছে—A ও B। এই দুই ক্রেতার চাহিদা রেখা হল যথাক্রমে D ও D_B (চিত্র ৩.২)। OP_1 দামে A ব্যক্তির চাহিদা OA_1 এবং B ব্যক্তির চাহিদা OB_1। অতএব, মোট বা বাজার চাহিদা = $OA_1 + OB_1 = OD_1$ (মনে করি)। এই চাহিদা আমরা ডানদিকের তৃতীয় চিত্রে দেখিয়েছি। E_1 হল বাজার চাহিদা রেখার উপর একটি বিন্দু। আবার, দাম কমে OP_2 হলে A ব্যক্তির চাহিদা OA_2 এবং B ব্যক্তির চাহিদা OB_2। সুতরাং, মোট বা বাজার চাহিদা = $OA_2 + OB_2 = OD_2$ (মনে করি)। এই চাহিদার পরিমাণ আমরা ডানদিকের চিত্রে E_2 বিন্দু দ্বারা দেখিয়েছি। E_1, E_2 ইত্যাদি বিন্দুগুলি যোগ করে আমরা বাজার চাহিদা রেখা (D_M) পাই। এভাবে ব্যক্তিগত চাহিদা রেখাগুলিকে অনুভূমিকভাবে যোগ করে বাজার চাহিদা রেখা পাওয়া যায়। ব্যক্তিগত চাহিদা রেখাগুলি সাধারণত বাঁদিক থেকে ডানদিকে নিম্নমুখী হয়ে থাকে। কেবলমাত্র ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রেই চাহিদা রেখা বাঁদিক থেকে ডানদিকে ঊর্ধ্বমুখী হয়। কিন্তু বাজার চাহিদা রেখা সর্বদাই বাঁদিক থেকে ডানদিকে নিম্নমুখী হবে।

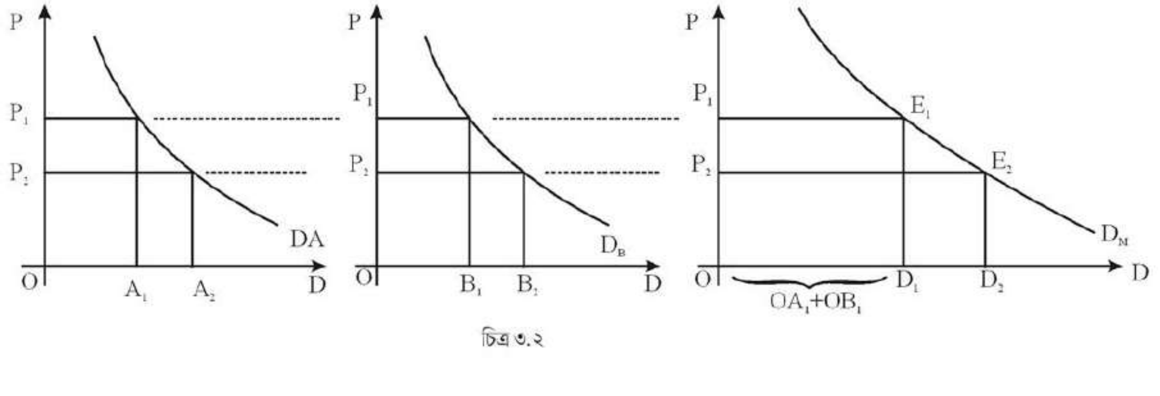

চিত্র ৩.২

৩.৪.৩ চাহিদার নিয়মের ব্যাখ্যা বা চাহিদার নিয়ম কেন কার্যকরী হয়

চাহিদার নিয়ম থেকে আমরা জানি যে, চাহিদা রেখা বাঁদিক থেকে থেকে ডানদিকে নিম্নমুখী হয় বা দাম কমলে চাহিদা বাড়ে। প্রশ্ন হল, চাহিদা রেখা নিম্নমুখী হয় কেন? বা, দাম কমলে চাহিদা বাড়ে কেন? অধ্যাপক মার্শাল ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধির সাহায্যে চাহিদার নিয়মকে ব্যাখ্যা করেছেন। এই বিধি বা নিয়ম অনুযায়ী, ভোগকারী যদি কোনো দ্রব্যের ভোগ ক্রমাগত বাড়িয়ে যায়, তাহলে শেষ ইউনিট থেকে প্রাপ্ত উপযোগ অর্থাৎ প্রান্তিক উপযোগ ক্রমাগত কমবে। সুতরাং, ভোগকারী বাড়তি ইউনিট কিনবে যদি তাকে কম দাম দিতে হয়। দাম কম হলে তবেই ক্রেতা বেশি পরিমাণ কিনতে চাইবে অর্থাৎ দাম কমলে চাহিদা বাড়বে। বিপরীত ক্ষেত্রে, দাম বাড়লে চাহিদা কমবে।

অধ্যাপক হিক্স, অ্যালেন প্রমুখ অর্থনীতিবিদ নিরপেক্ষ রেখা তত্ত্বের সাহায্যে চাহিদার নিয়মকে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁদের মতে, কোনো দ্রব্যের দাম কমলে দ্রব্যটি তার পরিবর্ত দ্রব্যের তুলনায় সস্তা হয়ে যায়। ফলে ভোগকারী পরিবর্ত দ্রব্য কিছুটা ছেড়ে দিয়ে ঐ বিশেষ দ্রব্যটি কিছুটা বেশি কেনে। একে বলা হয় পরিবর্ত প্রভাব (substitution effect)। আবার, দ্রব্যটির দাম কমলে ক্রেতার ক্রয়ক্ষমতা বা প্রকৃত আয় বেড়ে যায়। স্বাভাবিক দ্রব্যের ক্ষেত্রে আয় বাড়লে চাহিদা বাড়ে। একে বলা হয় আয় প্রভাব (income effect)। এই আয় প্রভাব ও পরিবর্ত প্রভাবের সম্মিলিত ফল হল দাম প্রভাব (price effect)। পরিবর্ত প্রভাব ও আয় প্রভাব কাজ করে বলেই চাহিদার নিয়ম বা দাম প্রভাব কাজ করে।

৩.৪.৪ চাহিদার নিয়মের ব্যতিক্রম

কতকগুলি ক্ষেত্রে চাহিদার নিয়ম কাজ করে না। এদের চাহিদার নিয়মের ব্যতিক্রম বলা হয়। সংক্ষেপে সেগুলি নিম্নরূপ :

(i) কোনো দ্রব্যের দাম কমলে ভোগকারী যদি ভাবে যে, দ্রব্যটির দাম আরো কমবে, তাহলে সে দ্রব্যটির ক্রয় পিছিয়ে দেবে। ফলে বর্তমানে দাম কমলে চাহিদাও কমবে। তেমনি, বর্তমানে দাম বাড়লে ভোগকারী যদি ভাবে যে, দ্রব্যটির দাম ভবিষ্যতে আরো বাড়বে, তাহলে সে দ্রব্যটির ক্রয় বাড়িয়ে দেবে। ফলে দাম বাড়লে চাহিদা আরো বাড়বে। এক্ষেত্রে চাহিদার নিয়ম কার্যকরী হবে না। Patinkin একে বলেছেন দাম সম্পর্কে প্রতিকূল প্রত্যাশা (adverse expectation on prices)।

(ii) ভোগকারী যদি অপরকে দেখানোর জন্য অথবা অপরের ব্যবহার করা দেখে প্রভাবিত হয়ে কোনো দ্রব্যের ব্যবহার শুরু করে, তাহলে চাহিদার নিয়ম কাজ করবে না। এক্ষেত্রে দ্রব্যের দাম বাড়লে চাহিদা বাড়বে এবং দাম কমলে চাহিদা কমবে। একে বলা হয় প্রদর্শন প্রভাব (demonstration effect)।

(iii) মূল্যবান ধাতু, মণিমাণিক্য, মূল্যবান পোষাক ইত্যাদি ভোগ করা হয় জাঁকজমক বা আড়ম্বর প্রকাশ করার জন্য অথবা মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য। এসব দ্রব্যের ক্ষেত্রে দাম বাড়লে চাহিদা বাড়ে। এক্ষেত্রে চাহিদার নিয়ম খাটে না। Veblen একে বলেছেন জাঁকজমকপূর্ণ ভোগ (Conspicuous consumption)।

(iv) শেয়ার বাজারে কোনো কোম্পানির শেয়ারের দাম বাড়লে ঐ শেয়ারের চাহিদা বাড়ে। তেমনি, শেয়ারের দাম কমলে চাহিদা কমে। এক্ষেত্রে চাহিদার নিয়ম কাজ করে না।

(v) নেশার দ্রব্যের ক্ষেত্রে সাধারণত চাহিদার নিয়ম কাজ করে না।

(vi) কোনো দ্রব্যের দাম খুব কম বা খুব বেশি হলে চাহিদার নিয়ম সাধারণত কাজ করে না।

(vii) গিফেন দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদার নিয়ম কাজ করে না। আয়ারল্যাণ্ডে রবার্ট গিফেন একবার দেখেছিলেন যে, আলুর দাম বাড়ার সাথে সাথে আলুর চাহিদা বেড়ে গিয়েছে। আসলে আয়ারল্যাণ্ডের লোকেরা সে সময় ছিল গরীব। তারা বেশিদিনই খেতো আলু, আর মাঝে মাঝে খেতো মাংস। আলুর দাম বেড়ে যাওয়ার ফলে তারা মাংস খাওয়া কমিয়ে তার বদলে বেশি আলু খেতে বাধ্য হল। ফলে আলুর দাম বাড়ার সাথে সাথে আলুর চাহিদা বেড়ে গেল। এ ধরনের দ্রব্যকে বলা হয় গিফেন দ্রব্য। এই গিফেন দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদার নিয়ম কাজ করে না।

(viii) কোনো দ্রব্যের দাম কমলে ক্রেতা যদি ভাবে যে, দ্রব্যটির মানের অবনতি ঘটেছে, তাহলে দাম কমার সাথে সাথে দ্রব্যটির চাহিদাও কমবে। এক্ষেত্রেও চাহিদার নিয়ম কাজ করবে না। তেমনি, দাম বাড়লে চাহিদাও বাড়বে।

চাহিদার নিয়মের ব্যতিক্রমের ক্ষেত্রে চাহিদা রেখা বাঁদিক থেকে ডানদিকে ঊর্ধ্বমুখী হয় (৩.৩ নং চিত্র)। পাশের চিত্রে dd_1 হল আমাদের চাহিদা রেখা। মনে করি, প্রাথমিক দাম ছিল OP_0। তখন চাহিদার পরিমাণ OD_0। এখন, দাম বেড়ে OP_2 হলে চাহিদাও বেড়ে OD_2 হয়। আবার, দাম কমে OP_1 হলে চাহিদাও কমে OD_1 হয়। এক্ষেত্রে দ্রব্যের দামের সঙ্গে চাহিদার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক প্রকাশ পাচ্ছে এবং চাহিদা রেখা বাঁদিক থেকে ডানদিকে ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে।

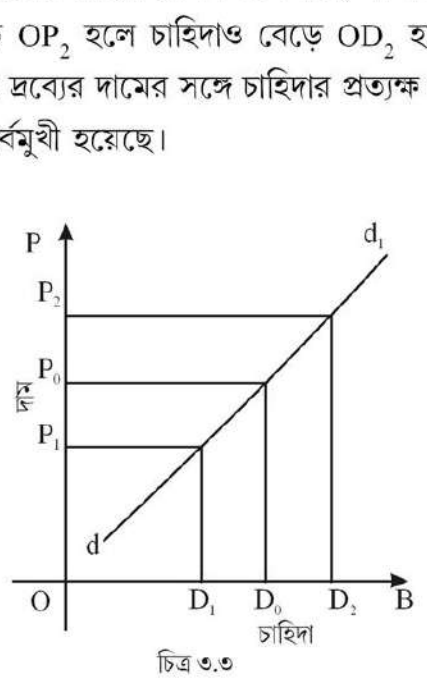

চিত্র ৩.৩

৩.৫ চাহিদা অপেক্ষক

আমরা জানি যে, কোনো দ্রব্যের চাহিদা একাধিক বিষয়ের উপর নির্ভর করে। সেই বিষয়গুলি হল: দ্রব্যের দাম (p), পরিবর্ত দ্রব্যের দাম (p_s), পরিপূরক দ্রব্যের দাম (p_c), ক্রেতার আয় (M), ক্রেতার রুচি, পছন্দ ও অভ্যাস (t) ইত্যাদি। কোনো দ্রব্যের চাহিদা ও চাহিদা নির্ধারক চলরাশিগুলির মধ্যে গাণিতিক সম্পর্ককেই চাহিদা অপেক্ষক বলে। প্রতীকের সাহায্যে লিখলে, চাহিদা অপেক্ষকের সাধারণ রূপটি হল : $q = f(p, p_s, p_c, Y, t, \ldots\ldots)$ যেখানে q হল চাহিদার পরিমাণ। দ্রব্যের দাম ছাড়া অন্যান্য বিষয়কে অপরিবর্তিত ধরলে আমরা লিখতে পারি : $q = f(p)$ অর্থাৎ অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকলে কোনো দ্রব্যের চাহিদা তার (নিজস্ব) দামের উপর নির্ভর করে। এক্ষেত্রে চাহিদা অপেক্ষকটি হল : $q = f(p)$। চাহিদা অপেক্ষককে যখন রেখা চিত্রে প্রকাশ করা হয় তখন পাই চাহিদা রেখা। আমাদের চাহিদা অপেক্ষক $q = f(p)$-তে p হল স্বাধীন চলরাশি এবং q হল নির্ভরশীল চলরাশি। গণিতের প্রথা (convention) অনুযায়ী p কে অনুভূমিক অক্ষে এবং q কে উল্লম্ব অক্ষে পরিমাপ করা উচিত। কিন্তু মার্শালকে অনুসরণ করে আমরা উল্লম্ব অক্ষে দাম এবং অনুভূমিক অক্ষে চাহিদার পরিমাণ (q) পরিমাপ করে চাহিদা রেখা অঙ্কন করি। এভাবে যে চাহিদা রেখা পাই তাকে বলা উচিত বিপরীত চাহিদা রেখা। চাহিদা অপেক্ষক বা চাহিদা রেখা বলতে আমরা এই বিপরীত চাহিদা রেখা বা চাহিদা অপেক্ষককে বুঝিয়ে থাকি। অনুভূমিক অক্ষে ব্যক্তিগত চাহিদার পরিমাণ পরিমাপ করলে আমরা পাই ব্যক্তিগত চাহিদা রেখা। আর অনুভূমিক অক্ষে বাজার চাহিদার পরিমাণ পরিমাপ করলে আমরা পাই বাজার চাহিদা রেখা।

৩.৫.১ সরলরৈখিক ও বক্ররৈখিক চাহিদা রেখা

আমরা জানি, অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকলে কোনো দ্রব্যের দাম কমলে চাহিদা বাড়বে এবং দাম বাড়লে চাহিদা কমবে। একে চাহিদার সাধারণ নিয়ম বলে। এই চাহিদার নিয়ম কাজ করলে চাহিদা রেখা বাঁদিক থেকে ডানদিকে নিম্নমুখী হবে। কিন্তু এটি সরলরেখা হবে, না বক্ররেখা হবে তা কিছু বলা যায় না। সেটি চাহিদা অপেক্ষকের প্রকৃতির উপর নির্ভর করছে। আমাদের চাহিদা অপেক্ষকটি হল : $q = f(p)$।

এর বিশেষ রূপটি মনে করি, $q = \frac{a}{b} - \frac{1}{b} \cdot p$ । আমরা অবশ্য চাহিদা অপেক্ষককে রেখাচিত্রে স্থাপন করার সময় p কে উল্লম্ব অক্ষে এবং q কে অনুভূমিক অক্ষে পরিমাপ করি অর্থাৎ $p = F(q)$ এইভাবে প্রকাশ করি। এভাবে আমরা পাই বিপরীত চাহিদা অপেক্ষক। তাহলে আমাদের উদাহরণ থেকে লিখতে পারি :

$\frac{1}{b} \cdot p = \frac{a}{b} - q$ বা $p = a - bq$। এটি একটি বিপরীত চাহিদা রেখার (inverse demand curve) সমীকরণ। এটি একটি নিম্নমুখী সরলরেখা যার উল্লম্ব ছেদিতাংশ = a এবং ঢাল = – b। পাশের ৩.৪ নং চিত্রে আমরা

এরূপ একটি সরলরৈখিক বিপরীত চাহিদা অপেক্ষক এঁকেছি। একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বোঝানো যেতে পারে। মনে করি, সরলরৈখিক চাহিদা অপেক্ষকটি হল, $q = 50 - \frac{1}{2}p$ । এখানে $q = f(p)$। এখন, $p = f(q)$ আকারে প্রকাশ করলে পাই, $\frac{1}{2}p = 50 - 2q$, বা, $p = 100 - 2q$। এটিই হল আমাদের বিপরীত চাহিদা অপেক্ষক। আমাদের উদাহরণে $a = 100$ এবং $b = -2$ অর্থাৎ এর উল্লম্ব ছেদিতাংশ $= a = 100$ এবং প্রবণতা বা ঢাল $= -2$। তাহলে এই চাহিদা রেখার অনুভূমিক ছেদাংশ হবে 50 এবং তার ফলে ঢাল $= \frac{\text{লম্ব}}{\text{ভূমি}} = \frac{100}{50} = -2$ । আমাদের চিত্রে সেভাবেই (বিপরীত) চাহিদা রেখাটি আঁকা হয়েছে। সাধারণভাবে চাহিদা রেখা বলতে আমরা এই বিপরীত চাহিদা অপেক্ষককেই বুঝিয়ে থাকি।

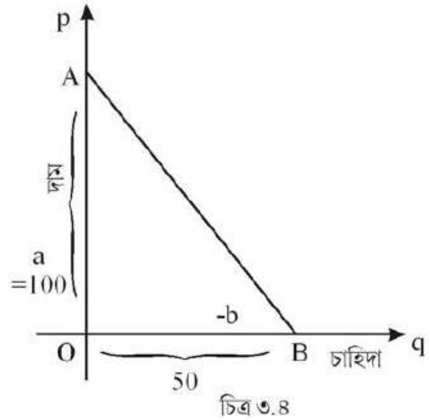

চিত্র ৩.৪

এখন বক্ররৈখিক চাহিদা রেখা বিবেচনা করা যাক। চাহিদা রেখা সরলরৈখিক না হয়ে বক্ররৈখিকও হতে পারে। সেটি নির্ভর করছে দাম (p) ও চাহিদার পরিমাণের (q) সম্পর্কের প্রকৃতির উপর। মনে করি, p ও q-র মধ্যে সম্পর্ক এমন যে, $pq = r =$ ধ্রুবক অর্থাৎ ভোগকারীর ব্যয় (pq) বা বিক্রেতার রেভিনিউ (pq) সর্বদাই ধ্রুবক। এক্ষেত্রে চাহিদা রেখাটি এমন হবে যাতে চাহিদা রেখার কোনো একটি বিন্দু থেকে অক্ষ দুটিকে নিয়ে অঙ্কিত আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল সর্বদাই সমান বা ধ্রুবক (= r) হবে। গণিতে এ ধরনের রেখাকে বলা হয় আয়তক্ষেত্রিক পরাবৃত্ত (rectangular hyperbola)। সুতরাং, আমাদের চাহিদা রেখাটি এক্ষেত্রে একটি আয়তক্ষেত্রিক পরাবৃত্ত। একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বোঝানো যেতে পারে। মনে করি, $pq = 12$ অর্থাৎ $r = 12$। এক্ষেত্রে আমরা p ও q এর মানের বিভিন্ন সমন্বয় পেতে পারি। এরূপ কয়েকটি সমন্বয় হল নিম্নরূপ :

p	12	6	4	3	2
q	1	2	3	4	6

প্রভৃতি। এই বিন্দুগুলিকে ৩.৫ নং চিত্রে স্থাপন করে আমরা যথাক্রমে A, B, C,

D, E বিন্দুগুলি পেয়েছি। এগুলি যোগ করেই আমরা চাহিদা রেখা (pq = r = 12) পেয়েছি। লক্ষণীয় যে, এক্ষেত্রে চাহিদা রেখার তলায় প্রতিটি আয়তক্ষেত্রেই ক্ষেত্রফল 12 (= 1 × 12 = 2 × 6 = 3 × 4 ইত্যাদি)। এরূপ রেখাকেই বলা হয় আয়তক্ষেত্রিক পরাবৃত্ত। বক্ররৈখিক চাহিদা রেখা অবশ্য আরও বিভিন্ন আকারের হতে পারে। সেটি নির্ভর করছে দাম ও চাহিদার সম্পর্কের উপর।

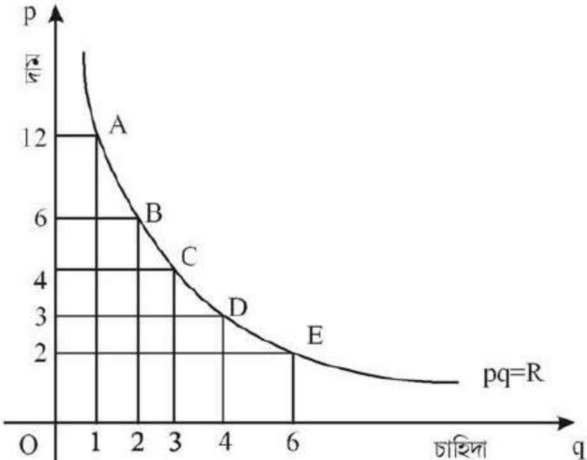

চিত্র ৩.৫

৩.৫.২ চাহিদা রেখার স্থানান্তর বা, চাহিদার পরিমাণে পরিবর্তন ও চাহিদায় পরিবর্তন

অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত অবস্থায় কোনো দ্রব্যের নিজস্ব দামের পরিবর্তনের ফলে চাহিদার পরিবর্তনকে চাহিদার পরিমাণে পরিবর্তন বলে। যেমন, আমাদের ৩.১নং চিত্রে, দাম OP_0 থেকে কমে OP_1 হলে চাহিদা OD_0 থেকে বেড়ে OD_1 হয়। তেমনি, দাম OP_0 থেকে বেড়ে OP_2 হলে চাহিদা কমে OD_2 হয়। এটি হল চাহিদার পরিমাণে পরিবর্তন। এক্ষেত্রে আমরা একই চাহিদা রেখার উপর অবস্থান করি এবং দামের পরিবর্তনের ফলে চাহিদা রেখার উপর বাঁদিকে অথবা ডানদিকে সরে যাই।

কিন্তু আমরা জানি যে, কোনো দ্রব্যের চাহিদা তার নিজস্ব দাম ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ের উপর নির্ভর করে, যেমন, ক্রেতার আয়, পরিবর্ত দ্রব্যের দাম, পরিপূরক দ্রব্যের দাম, ক্রেতার রুচি প্রভৃতি। এই সমস্ত বিষয়গুলির পরিবর্তন হলেও চাহিদার পরিবর্তন হতে পারে। নিজস্ব দাম ছাড়া অন্যান্য বিষয়ের **পরিবর্তনের ফলে চাহিদার পরিবর্তনকে বলা হয় চাহিদায় পরিবর্তন**। এক্ষেত্রে সমগ্র চাহিদা রেখা বাঁদিকে বা ডানদিকে সরে যায়। তাই একে চাহিদা রেখার স্থানান্তরও বলা হয়। যেমন, ৩.৬নং চিত্রে, মনে করি, প্রাথমিক চাহিদা রেখা হল D_1 এবং দাম হল OP_0। সুতরাং OP_0 দামে দ্রব্যটির চাহিদা ছিল P_0A। এখন, মনে করি, দ্রব্যটির বিকল্প দ্রব্যের দাম বাড়ল। সেক্ষেত্রে এই বিশেষ দ্রব্যটির চাহিদা বাড়বে এবং পুরনো দামে বেশি বিক্রি হবে। ফলে সমগ্র চাহিদা রেখাটি ডানদিকে (D_2) সরে যাবে। বিপরীত ক্ষেত্রে, বিকল্প দ্রব্যের দাম কমলে বিশেষ দ্রব্যটির চাহিদা কমবে এবং চাহিদা রেখা বাঁদিকে (D_3) সরে যাবে। একেই বলা হয় চাহিদায়

পরিবর্তন বা চাহিদা রেখার স্থানান্তর। দ্রব্যটির নিজস্ব দাম ছাড়া চাহিদা অপেক্ষকে অন্যান্য চলরাশির পরিবর্তনের ফলে চাহিদা রেখার স্থানান্তর ঘটতে পারে।

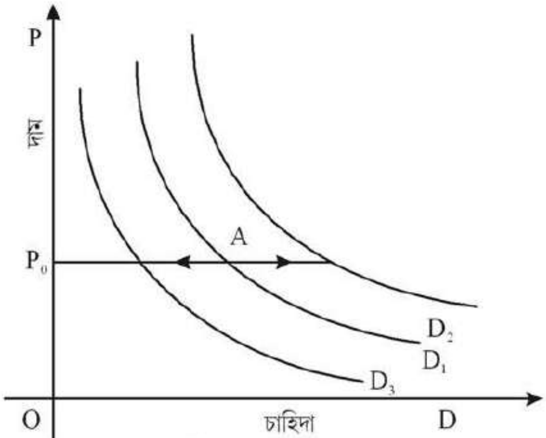

চিত্র ৩.৬

☐ চাহিদা রেখার স্থানান্তরের কারণ

আমরা প্রথমে ব্যক্তিগত চাহিদা রেখার স্থানান্তরের কারণ এবং তারপর বাজার চাহিদা রেখার স্থানান্তরের কারণ উল্লেখ করব। ব্যক্তিগত চাহিদা রেখার স্থানান্তর প্রধানত নিম্নলিখিত কারণে হতে পারে :

(i) ভোগকারীর আয় (Consumer's income) : ভোগকারীর আয় বাড়লে স্বাভাবিক দ্রব্যের চাহিদা বাড়ে। সেক্ষেত্রে চাহিদা রেখা ডানদিকে সরবে। বিপরীতক্ষেত্রে, আয় কমলে চাহিদা কমবে। ফলে চাহিদা রেখা বাঁদিকে সরবে। অবশ্য নিকৃষ্ট দ্রব্যের ক্ষেত্রে আয় বাড়লে চাহিদা কমে। সেক্ষেত্রে চাহিদা রেখা বাঁদিকে সরবে।

(ii) পরিবর্ত বা বিকল্প দ্রব্যের দাম (Price of substitute goods) : কোনো দ্রব্যের পরিবর্ত বা বিকল্প দ্রব্যের দাম বাড়লে ঐ বিশেষ দ্রব্যটির চাহিদা বাড়ে। ফলে ঐ বিশেষ দ্রব্যটির চাহিদা রেখা ডানদিকে সরবে। বিপরীতক্ষেত্রে, চাহিদা রেখা বাঁদিকে সরবে।

(iii) পরিপূরক দ্রব্যের দাম (Price of complementary goods) : কোনো দ্রব্যের পরিপূরক দ্রব্যের দাম বাড়লে বিশেষ দ্রব্যটির চাহিদা কমবে এবং চাহিদা রেখার বাঁদিকে স্থানান্তর ঘটবে। বিপরীত ক্ষেত্রে চাহিদা রেখা ডানদিকে সরবে।

(iv) ভোগকারীর রুচি (Taste of the consumer) : দ্রব্যটির অনুকূলে ক্রেতার রুচির পরিবর্তন ঘটলে চাহিদা বাড়বে এবং ফলে চাহিদা রেখা ডানদিকে সরবে। বিপরীত ক্ষেত্রে চাহিদা রেখা বাঁদিকে সরবে।

এখন আমরা বাজার চাহিদা রেখার স্থানান্তরের কারণ উল্লেখ করব। ব্যক্তিগত চাহিদা রেখাগুলিকে অনুভূমিকভাবে যোগ করে বাজার চাহিদা রেখা পাওয়া যায়। সুতরাং, ব্যক্তিগত চাহিদা রেখার স্থানান্তরের

পিছনে যে বিষয়গুলি কাজ করে, বাজার চাহিদা রেখার স্থানান্তরের পিছনেও ঐ বিষয়গুলি কাজ করবে। এছাড়া, বাজার চাহিদা রেখার স্থানান্তরের পিছনে নিম্নলিখত বিষয়গুলিও কাজ করবে :

(ক) আয় বণ্টনের পরিবর্তন (Change in the distribution of income) : আয়বণ্টন আরো সুষম হলে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের চাহিদা বাড়বে। ফলে ঐ সকল দ্রব্যের বাজার চাহিদা রেখা ডানদিকে সরবে। বিপরীত ক্ষেত্রে চাহিদা রেখা বাঁদিকে সরবে।

(খ) জনসংখ্যার পরিবর্তন (Change in population) : জনসংখ্যা বাড়লে দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বাড়ে। ফলে কোনো দ্রব্যের বাজার চাহিদা রেখা ডানদিকে সরবে। বিপরীত ক্ষেত্রে চাহিদা রেখা বাঁদিকে সরবে।

(গ) ফ্যাশানের পরিবর্তন (Change in fashion) : দ্রব্যটির অনুকূলে ফ্যাশানের পরিবর্তন ঘটলে বাজার চাহিদা রেখা ডানদিকে সরবে। বিপরীত ক্ষেত্রে চাহিদা রেখা বাঁদিকে সরবে।

এছাড়া, বিজ্ঞাপন ব্যয়, নতুন দ্রব্যের প্রচলন, ভোগ ও সঞ্চয় সম্পর্কে জনসাধারণের দৃষ্টিভঙ্গি, ভোগঋণের শর্তাবলি ইত্যাদির পরিবর্তনের ফলেও বাজার চাহিদা রেখার স্থানান্তর ঘটতে পারে। ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক কাজকর্ম সম্পর্কে লোকের প্রত্যাশার পরিবর্তন হলেও বাজার চাহিদা রেখার স্থানান্তর ঘটবে।

৩.৬ চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা

আমরা জানি, কোনো দ্রব্যের চাহিদা একাধিক বিষয়ের উপর নির্ভর করে, যেমন, ঐ দ্রব্যের দাম, ঐ দ্রব্যের পরিবর্ত ও পরিপূরক দ্রব্যের দাম, ভোগকারীর আয়, ভোগকারীর রুচি ও পছন্দ ইত্যাদি। এই বিষয়গুলিকে স্বাধীন চলরাশি বলা হয় কারণ এদের মান স্বাধীনভাবে পরিবর্তিত হয়। এদের মানের পরিবর্তনের ফলে চাহিদার পরিবর্তন হয়। কোনো একটি স্বাধীন চলরাশির পরিবর্তনের হারের সঙ্গে চাহিদার পরিমাণে পরিবর্তনের হারের সম্পর্ককে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। সংজ্ঞা হিসাবে বলতে গেলে, চাহিদা অপেক্ষকের কোনো একটি স্বাধীন চলরাশি শতকরা এক ভাগ (1%) পরিবর্তিত হলে চাহিদার পরিমাণে শতকরা যত ভাগ পরিবর্তন হয় তাকেই চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বলে। অর্থাৎ,

$$\text{চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা} = \frac{\text{চাহিদার পরিমাণে শতকরা পরিবর্তন}}{\text{স্বাধীন চলরাশিতে শতকরা পরিবর্তন}}$$

যেহেতু কোনো দ্রব্যের চাহিদা একাধিক স্বাধীন চলরাশির উপর নির্ভর করে, সেজন্য কোনো দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার একাধিক ধারণা আমরা পেতে পারি। এ সম্পর্কে আমরা নীচের বিভাগে আলোচনা করেছি।

৩.৬.১ চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার প্রকারভেদ

মনে করি x দ্রব্যের চাহিদা অপেক্ষকটি হল : $q_x = f(p_x, p_y, M)$ অর্থাৎ x দ্রব্যের চাহিদা (q_x) তার নিজস্ব দাম (p_x), সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের অর্থাৎ পরিবর্ত বা পরিপূরক দ্রব্যের দাম (p_y) এবং ভোগকারীর আয়ের (M) উপর নির্ভর করে। এই অপেক্ষকে তিনটি স্বাধীন চলরাশি রয়েছে। সুতরাং, আমরা চাহিদার তিন রকমের স্থিতিস্থাপকতা পেতে পারি। এগুলি হল :

(ক) চাহিদার (নিজস্ব) দামগত স্থিতিস্থাপকতা (Direct or own price elasticity of demand)

(খ) চাহিদার আয়গত স্থিতিস্থাপকতা (Income elasticity of demand)

(গ) চাহিদার পারস্পরিক (দামগত) স্থিতিস্থাপকতা (Cross (price) elasticity of Demand)। আমরা এই ধারণাগুলি নিয়ে এখন আলোচনা করব।

৩.৬.২ চাহিদার নিজস্ব দামগত স্থিতিস্থাপকতা

অন্যান্য সকল বিষয় অপরিবর্তিত অবস্থায় কোনো দ্রব্যের দাম 1% পরিবর্তিত হলে ঐ দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ শতকরা যত ভাগ পরিবর্তিত হয় তাকেই ঐ দ্রব্যের নিজস্ব দামগত স্থিতিস্থাপকতা বলে। কোনো কিছুর উল্লেখ না থাকলে 'চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা' বলতে সাধারণত এই নিজ দামগত স্থিতিস্থাপকতাকেই বোঝানো হয়।

$$\text{নিজ দামগত স্থিতিস্থাপকতা } (e_p) = \frac{\text{চাহিদার পরিমাণে শতকরা পরিবর্তন}}{\text{দামের শতকরা পরিবর্তন}}$$

$$= \frac{\dfrac{\text{চাহিদার পরিমাণে পরিবর্তন}}{\text{প্রাথমিক চাহিদা}} \times 100}{\dfrac{\text{দামের পরিবর্তন}}{\text{প্রাথমিক দাম}} \times 100}$$

$$= \frac{\text{চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তন}}{\text{প্রাথমিক চাহিদা}} \times \frac{\text{প্রাথমিক দাম}}{\text{দামের পরিবর্তন}}$$

যদি প্রাথমিক চাহিদার পরিমাণকে q দ্বারা এবং প্রাথমিক দামকে p দ্বারা চিহ্নিত করি এবং পরিবর্তন বোঝাতে Δ চিহ্ন ব্যবহার করা হয়, তাহলে পাই, $e_p = \frac{\Delta q}{q} \times \frac{p}{\Delta p} = \frac{p}{q} \cdot \frac{\Delta q}{\Delta p}$

এখানে $p > 0$, $q > 0$। সুতরাং e_p-র চিহ্ন (sign) $\frac{\Delta q}{\Delta p}$ -এর উপর নির্ভর করবে। সাধারণত, দাম

কমলে ($\Delta p < 0$ হলে) চাহিদা বাড়ে এবং ($\Delta q > 0$ হয়) এবং দাম বাড়লে ($\Delta p > 0$ হলে) চাহিদা কমে ($\Delta q < 0$ হয়)। সুতরাং, চাহিদার নিয়ম কাজ করলে, $\frac{\Delta q}{\Delta p} < 0$ হবে। অতএব, সাধারণভাবে, e_p ঋণাত্মক হবে বা, $e_p < 0$। তবে গিফেন দ্রব্যের ক্ষেত্রে দাম বাড়লে ($\Delta p > 0$) চাহিদা বাড়ে ($\Delta q > 0$) অর্থাৎ $\frac{\Delta q}{\Delta p} > 0$। সেক্ষেত্রে $e_p > 0$ বা ধনাত্মক হবে। তাহলে, চাহিদার নিয়ম কার্যকরী হলে $e_p < 0$ হবে। অতএব, চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার পরম মান (absolute value) $= |e_p| = -\frac{p}{q} \cdot \frac{\Delta q}{\Delta p}$।

৩.৬.৩ চাহিদার আয়গত স্থিতিস্থাপকতা

অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত অবস্থায় ভোগকারীর আয় শতকরা এক ভাগ পরিবর্তিত হলে কোনো দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণে শতকরা যত ভাগ পরিবর্তন হয় তাকে ঐ দ্রব্যের চাহিদার আয়গত স্থিতিস্থাপকতা বলে। চাহিদার আয়গত স্থিতিস্থাপকতা $= \frac{\text{চাহিদার পরিমানে শতকরা পরিবর্তন}}{\text{ভোগকারীর আয়ের শতকরা পরিবর্তন}}$

$$= \frac{\frac{\text{চাহিদার পরিমাণে পরিবর্তন}}{\text{প্রাথমিক চাহিদা}} \times 100}{\frac{\text{ভোগকারীর আয়ের পরিবর্তন}}{\text{প্রাথমিক আয়}} \times 100} = \frac{\text{চাহিদার পরিমাণে পরিবর্তন}}{\text{প্রাথমিক চাহিদা}} \times \frac{\text{প্রাথমিক আয়}}{\text{আয়ের পরিবর্তন}}$$

যদি প্রাথমিক চাহিদাকে q দ্বারা, প্রাথমিক আয়কে M দ্বারা চিহ্নিত করি এবং পরিবর্তন বোঝাতে যদি Δ চিহ্ন ব্যবহার করা হয়, তাহলে চাহিদার আয়গত স্থিতিস্থাপকতা $(e_M) = \frac{\Delta q}{q} \times \frac{M}{\Delta M} = \frac{M}{q} \cdot \frac{\Delta q}{\Delta M}$

এখানে $M > 0$, $q > 0$, সুতরাং চাহিদার আয়গত স্থিতিস্থাপকতার চিহ্ন $\frac{\Delta q}{\Delta M}$-এর উপর নির্ভর করবে। এখন, স্বাভাবিক দ্রব্যের ক্ষেত্রে ভোগকারীর আয় বাড়লে (অর্থাৎ $\Delta M > 0$ হলে) চাহিদা বাড়ে বা $\Delta q > 0$ হয়। সেক্ষেত্রে $e_M > 0$ হবে। নিকৃষ্ট দ্রব্যের ক্ষেত্রে ভোগকারীর আয় বাড়লে ($\Delta M > 0$ হলে) চাহিদার পরিমাণ কমে ($\Delta q < 0$)। সেক্ষেত্রে $e_M < 0$ হবে। আবার, বিলাস দ্রব্যের ক্ষেত্রে আয় শতকরা যত ভাগ পরিবর্তিত হয়, চাহিদার পরিবর্তন তার চেয়ে শতকরা বেশি ভাগ হয়ে থাকে। সুতরাং সেক্ষেত্রে $e_M > 1$ হবে। অন্যদিকে, প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ক্ষেত্রে আয় শতকরা যত ভাগ পরিবর্তিত হয়, চাহিদার পরিবর্তন তার চেয়ে শতকরা কম ভাগ হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে $e_M < 1$ হবে।

৩.৬.৪ চাহিদার আয়গত স্থিতিস্থাপকতার পরিমাপ

আমরা জানি, কোনো দ্রব্যের চাহিদা (q) ঐ দ্রব্যের দাম, ভোগকারীর আয় (M), সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের দাম প্রভৃতির উপর নির্ভর করে। ভোগকারীর আয় ছাড়া অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত ধরলে আমরা বলতে পারি, কোনো দ্রব্যের চাহিদা ভোগকারীর আয়ের উপর নির্ভর করে অর্থাৎ $q = f(M)$। একে বলা হয় আয়-চাহিদা অপেক্ষক বা এঞ্জেল অপেক্ষক। এই এঞ্জেল অপেক্ষককে রেখাচিত্রে প্রকাশ করলে পাই এঞ্জেল রেখা বা আয়-চাহিদা রেখা। স্বাভাবিক দ্রব্যের ক্ষেত্রে M বাড়লে q বাড়ে অর্থাৎ আয়-চাহিদা রেখা ঊর্ধ্বমুখী হবে। আমরা স্বাভাবিক দ্রব্যের ক্ষেত্রে আয়-চাহিদা রেখার কোনো বিন্দুতে চাহিদার আয়গত স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপ করব। আমরা ৩.৭ নং চিত্রে একটি সরলরৈখিক আয়-চাহিদা রেখা বা এঞ্জেল রেখা (AB) নিয়েছি। এর C বিন্দুতে আয়গত স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপ করতে চাই। আমরা জানি, আয়গত স্থিতিস্থাপকতা =

$$\frac{\text{চাহিদার পরিমানে শতকরা পরিবর্তন}}{\text{আয়ের শতকরা পরিবর্তন}}$$

$$= \frac{\Delta q}{\Delta q} \times 100 \div \frac{\Delta M}{M} \times 100 = \frac{\Delta q}{q} \times \frac{M}{\Delta M} = \frac{M}{q} \cdot \frac{\Delta q}{\Delta M}$$

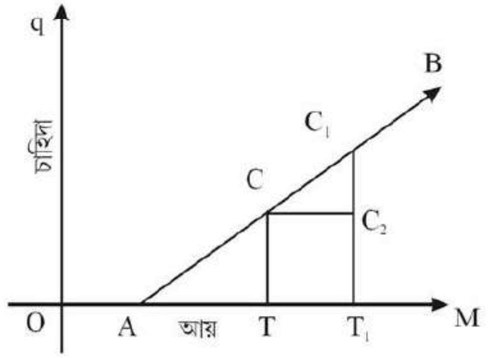

চিত্র ৩.৭

C বিন্দুতে q = চাহিদা = CT, M = আয় = OT। এখন, আয় বেড়ে OT_1 হলে চাহিদা বেড়ে C_1T_1 হয়। সুতরাং, $\Delta q = C_1T_1 - CT = C_1T_1 - C_2T_1 = C_1C_2$ এবং $\Delta M = OT_1 - OT = TT_1 = CC_2$। এই মানগুলি e_M-এর সূত্রে বসিয়ে পাই,

এখন, ΔACT এবং ΔCC_1C_2 পরস্পর সদৃশ। সুতরাং তাদের অনুরূপ বাহুগুলি সমানুপাতী।

$$\therefore \frac{C_1C_2}{CC_2} = \frac{CT}{AT}$$

এই মান বসিয়ে পাই, $e_M = \frac{OT}{CT} \cdot \frac{CT}{AT} = \frac{OT}{AT}$

এটিই হল AB রেখার C বিন্দুতে চাহিদার আয়গত স্থিতিস্থাপকতার মান। তেমনি C_1 বিন্দুতে আয়গত স্থিতিস্থাপকতার মান $\frac{OT_1}{AT_1}$ হবে। আমাদের চিত্রে $\frac{OT}{AT}$ এবং $\frac{OT_1}{AT_1}$ উভয়েরই মান 1 অপেক্ষা বেশি। যদি সরলরৈখিক আয়-চাহিদা রেখার বা এঞ্জেল রেখার ধনাত্মক অনুভূমিক (আয়) ছেদিতাংশ থাকে, তাহলে এরা প্রত্যেক বিন্দুতে আয়গত স্থিতিস্থাপকতার মান একের বেশি ($e_M > 1$) হবে। যদি আয়-চাহিদা রেখা মূলবিন্দুগামী সরলরেখা হয়, তাহলে O এবং A বিন্দু সমাপতিত হবে। সেক্ষেত্রে $e_M = \frac{OT}{AT} = \frac{OT}{OT} = 1$ হবে। আর, আয়-চাহিদা রেখার বা এঞ্জেল রেখার ধনাত্মক উল্লম্ব বা পরিমাণ ছেদিতাংশ থাকে, তাহলে A বিন্দু O বিন্দুর বাঁদিকে অবস্থান করবে। ফলে AT > OT হবে। তখন, $e_M < 1$ হবে।

আয়-চাহিদা রেখা বক্ররৈখিক হলে আমরা এর কোনো বিন্দুতে আয়গত স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপ করতে চাইলে সেই বিন্দুতে একটি স্পর্শক আঁকবো। আমরা ঐ স্পর্শকটিকেই আয়-চাহিদা রেখা বলে ধরে নেবো এবং ঐ স্পর্শ বিন্দুতে এর স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপ করবো। আমাদের ৩.৮ নং চিত্রে আমরা একটি বক্ররৈখিক আয়-চাহিদা রেখা (AB) এঁকেছি। এই বক্ররেখার C বিন্দুতে আয়গত স্থিতিস্থাপকতা হল ঐ বিন্দুতে OC স্পর্শকের আয়গত স্থিতিস্থাপকতা। এখানে OC একটি মূলবিন্দুগামী সরলরেখা। সুতরাং C বিন্দুতে $e_M = 1$ হবে। তেমনি C_1 বিন্দুতে স্পর্শকটির ধনাত্মক উল্লম্ব ছেদিতাংশ রয়েছে। সুতরাং C_1 বিন্দুতে $e_M < 1$ হবে। আবার, C_2 বিন্দুতে স্পর্শকটির ধনাত্মক অনুভূমিক ছেদিতাংশ রয়েছে। সুতরাং C_2 বিন্দুতে আয়গত স্থিতিস্থাপকতার মান 1 এর বেশি হবে ($e_M > 1$)।

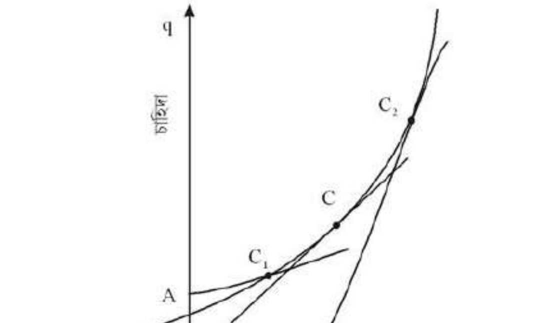

চিত্র ৩.৮

৩.৬.৫ চাহিদার পারস্পরিক (দামগত) স্থিতিস্থাপকতা

অন্যান্য সকল বিষয় অপরিবর্তিত অবস্থায় সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের দাম এক শতাংশ পরিবর্তিত হলে কোনো দ্রব্যের চাহিদায় শতকরা যত ভাগ পরিবর্তন হয় তাকেই বলে চাহিদার পারস্পরিক (দামগত) স্থিতিস্থাপকতা। যেমন, y দ্রব্যের দামে এক শতাংশ পরিবর্তন হলে x দ্রব্যের চাহিদা শতকরা যত ভাগ পরিবর্তিত হয়, তাই হল x দ্রব্যের চাহিদার পারস্পরিক (দামগত) স্থিতিস্থাপকতা। সূত্রের সাহায্যে বলতে গেলে,

$$e_{xy} = \frac{\text{x দ্রব্যের চাহিদার শতকরা পরিবর্তন}}{\text{y দ্রব্যের দামের শতকরা পরিবর্তন}} = \frac{\frac{\Delta q_x}{q_x} \times 100}{\frac{\Delta p_y}{p_y} \times 100} = \frac{\Delta q_x}{q_x} \times \frac{p_y}{\Delta p_y} = \frac{p_y}{q_x} \frac{\Delta q_x}{\Delta p_y}$$

এখানে $p_y > 0$, $q_x > 0$। সুতরাং e_{xy} ধনাত্মক না ঋণাত্মক হবে তা নির্ভর করছে $\frac{\Delta q_x}{\Delta p_y}$-এর চিহ্নের উপর। এই চিহ্ন আবার দ্রব্য দুটির মধ্যে সম্পর্কের উপর নির্ভর করছে। যদি দ্রব্য দুটি পরস্পরের পরিবর্ত হয়, তাহলে y-এর দাম বাড়লে ($\Delta p_y > 0$) x-এর চাহিদা বাড়বে ($\Delta q_x > 0$ হবে এবং $e_{xy} > 0$ বা ধনাত্মক হবে। আবার, দ্রব্যদুটি পরস্পরের পরিপূরক হলে y দ্রব্যের দাম বাড়লে ($\Delta p_y > 0$) x-এর চাহিদা কমবে ($\Delta q_x < 0$)। সেক্ষেত্রে $\frac{\Delta q_x}{\Delta p_y} < 0$ হবে এবং $e_{xy} < 0$ বা ঋণাত্মক হবে। যদি x ও y দ্রব্য দুটি পরস্পর সম্পর্কহীন (unrelated) হয় তাহলে $\frac{\Delta q_x}{\Delta p_y} = 0$ হবে $e_{xy} = 0$ হবে। সুতরাং e_{xy}-এর চিহ্ন দেখে দুটি দ্রব্য কীরূপ সম্পর্কযুক্ত, তা জানা যায়।

৩.৭ মার্শালের পদ্ধতি বা মোট ব্যয় দ্বারা চাহিদার দামগত স্থিতিস্থাপকতার পরিমাপ

মার্শাল ভোগকারীর মোট ব্যয়ের পরিবর্তনের ভিত্তিতে চাহিদার দামগত স্থিতিস্থাপকতার পরিমাপ করেছেন। অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকলে কোনো দ্রব্যের দাম কমলে চাহিদা বাড়ে এবং দাম বাড়লে চাহিদা কমে। দ্রব্যের দাম p এবং চাহিদা q হলে ভোগকারীর ব্যয়, $E = pq$। এখন, p কমলে q বাড়ে এবং p বাড়লে q কমে। সুতরাং, ভোগকারীর ব্যয় বাড়তে পারে, কমতে পারে অথবা অপরিবর্তিত থাকতে পারে। সেটি নির্ভর করবে দামের পরিবর্তনের ফলে চাহিদার পরিবর্তনের হারের উপর অর্থাৎ চাহিদার দামগত স্থিতিস্থাপকতার মানের উপর। অধ্যাপক মার্শাল ভোগকারীর ব্যয়ের ভিত্তিতে চাহিদার দামগত স্থিতিস্থাপকতার মান নির্দেশ করেছেন। তাঁর বক্তব্যকে নিম্নলিখিত তিনটি বিবৃতির সাহায্যে প্রকাশ করা যায়।

(১) দামের হ্রাস অথবা বৃদ্ধির ফলে ভোগকারীর মোট ব্যয় একই থাকলে চাহিদার দামগত স্থিতিস্থাপকতার পরম মান হবে একের সমান ($|e_p| = 1$)।

(২) দ্রব্যের দাম কমলে যদি ভোগকারীর মোট ব্যয় বাড়ে এবং দাম বাড়লে যদি ভোগকারীর মোট ব্যয় কমে, তাহলে চাহিদার দামগত স্থিতিস্থাপকতার পরম মান হবে একের বেশি ($|e_p| > 1$)।

(৩) দ্রব্যের দাম কমলে যদি ভোগকারীর মোট ব্যয় কমে এবং দাম বাড়লে যদি ভোগকারীর মোট ব্যয় বাড়ে, তাহলে চাহিদার দামগত স্থিতিস্থাপকতার পরম মান হবে একের কম ($|e_p| < 1$)।

৩.৭.১ জ্যামিতিক পদ্ধতির দ্বারা চাহিদার দামগত স্থিতিস্থাপকতার পরিমাপ

জ্যামিতিক পদ্ধতিতে চাহিদার দামগত স্থিতিস্থাপকতা দু'ভাবে পরিমাপ করা যেতে পারে। যখন চাহিদা রেখার উপর কোনো বিন্দুতে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপ করা হয় তাকে বলা হয় বিন্দুস্থ স্থিতিস্থাপকতার পরিমাপ। অন্যদিকে, যখন চাহিদা রেখার কোনো চাপের (arc) উপর চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপ করা হয়, তাকে বলা হয় চাপগত স্থিতিস্থাপকতার পরিমাপ। আমরা এখানে চাহিদা রেখার উপর কোনো বিন্দুতে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপ করবো।

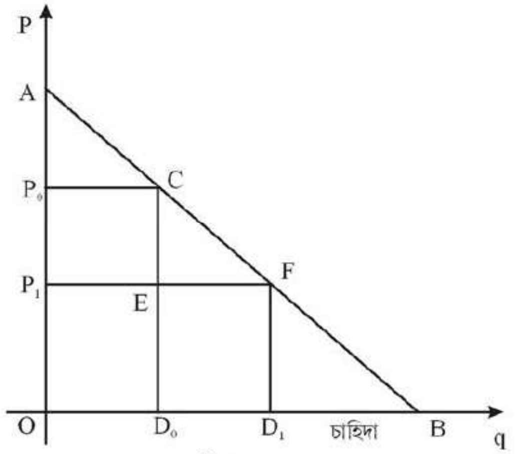

চিত্র ৩.৯

৩.৯নং চিত্রে আমরা একটি সরলরৈখিক চাহিদা রেখা (AB) নিলাম। এর C বিন্দুতে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপ করতে চাই। C বিন্দুতে দাম = p = Op_0 এবং চাহিদা = q = OD_0। এখন, দাম কমে OP_1 হলে চাহিদা বেড়ে দাঁড়ায় OD_1। সুতরাং দামের পরিবর্তন = $\Delta q = -\ p_0p_1$ এবং চাহিদার পরিবর্তন = $\Delta p = D_0D_1$। এখন, দামগত স্থিতিস্থাপকতার সূত্রে এই মানগুলি বসিয়ে পাই, $|e_p| = -\frac{p}{q} \cdot \frac{\Delta q}{\Delta p}$

এখন, ΔCEF এবং ΔCD_0B-তে পাই, $\angle CEF = \angle CD_0B$ (সমকোণ)।

$\angle CFE = \angle CBD_0$ (অনুরূপ কোণ) এবং $\angle C$ সাধারণ কোণ। সুতরাং, ত্রিভুজদ্বয় সদৃশ। অতএব, ওদের অনুরূপ বাহুগুলি সমানুপাতী। $\therefore \frac{EF}{CE} = \frac{BD_0}{CD_0}$ ।

স্থিতিস্থাপকতার সূত্রে এই মান বসিয়ে পাই,

$$|e_p| = \frac{CD_0}{OD_0} \times \frac{BD_0}{CD_0} = \frac{BD_0}{OD_0}$$

এখন, OAB ত্রিভুজের OA $\parallel CD_0$। সুতরাং, $\frac{BD_0}{OD_0} = \frac{BC}{AC}$

$$\therefore |e_p| = \frac{BC}{AC} = \frac{\text{চাহিদা রেখার নিম্নাংশ}}{\text{চাহিদা রেখার ঊর্ধ্বাংশ}}$$

আবার, $|e_p| = \frac{BC}{AC} = \frac{OP_0}{AP_0} = \frac{BD_0}{OD_0}$ $(\because P_0C \parallel OB$ এবং $OA \parallel CD_0)$।

এই সূত্র থেকেই স্পষ্ট যে, চাহিদা রেখার প্রত্যেক বিন্দুতে দামগত স্থিতিস্থাপকতার মান আলাদা হবে। আমরা AB রেখার A বিন্দু থেকে যদি B বিন্দুর দিকে যাই, তাহলে নিম্নাংশের দূরত্ব কমবে এবং ঊর্ধ্বাংশের দূরত্ব বাড়বে। সুতরাং, চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার পরম বা সাংখ্যমান কমবে। তেমনি, আমরা যদি B বিন্দু থেকে A বিন্দুর দিকে যাই, স্থিতিস্থাপকতার সাংখ্য বা পরম মান বাড়বে। যেমন, ৩.১০ নং চিত্রে B বিন্দুতে দামগত স্থিতিস্থাপকতার মান = $\frac{\text{নিম্নাংশ}}{\text{ঊর্ধ্বাংশ}} = \frac{0}{AB} = 0$। আবার, C বিন্দু যদি মধ্যবিন্দু হয়, তাহলে C বিন্দুতে $|e| = \frac{BC}{AC} = \frac{AC}{AC} = 1$। তেমনি, A বিন্দুতে দামগত স্থিতিস্থাপকতা = $\frac{\text{নিম্নাংশ}}{\text{ঊর্ধ্বাংশ}} = \frac{AB}{0} = \infty$ (অসীম)। A ও C বিন্দুর মধ্যে অবস্থিত কোনো বিন্দুত $|e| > 1$ এবং B ও C বিন্দুর মধ্যে অবস্থিত কোনো বিন্দুতে $|e| < 1$। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সরলরৈখিক চাহিদা রেখার বিভিন্ন বিন্দুতে দামগত স্থিতিস্থাপকতার মান বিভিন্ন হবে। অবশ্য বক্ররৈখিক চাহিদা রেখার ক্ষেত্রে এটা সত্য হতেও পারে, আবার নাও হতে পারে। যেমন, চাহিদা রেখা আয়তক্ষেত্রিক পরাবৃত্ত হলে তার প্রত্যেক বিন্দুতেই চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার পরম মান একের সমান হবে।

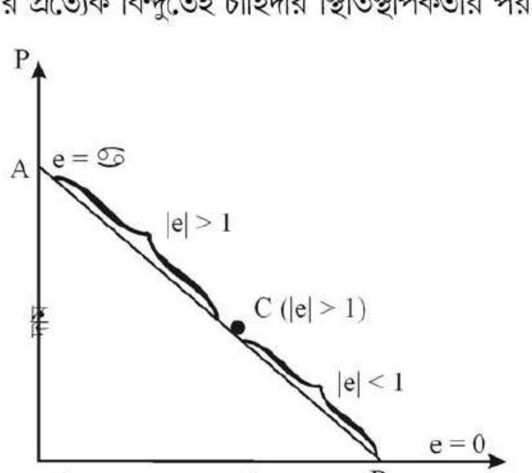

চিত্র ৩.১০

বক্ররৈখিক চাহিদা রেখার উপর কোনো বিন্দুতে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপ করতে হলে আমরা ঐ বিন্দুতে একটি স্পর্শক টানবো। ঐ স্পর্শকটিকে চাহিদা রেখা বলে ধরে নিয়ে আমরা স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপ করবো। যেমন, ৩.১১ নং চিত্রে dd হল আমাদের বক্ররৈখিক চাহিদা রেখা। এর C বিন্দুতে স্থিতিস্থাপকতা = AB স্পর্শকের C বিন্দুতে স্থিতিস্থাপকতা $= \frac{BC}{AC}$। তেমনি, C_1 বিন্দুতে স্থিতিস্থাপকতা $= \frac{B_1C_1}{A_1C_1}$। অনুরূপভাবে বক্ররৈখিক চাহিদা রেখার উপর কোনো বিন্দুতে চাহিদার দামগত স্থিতিস্থাপকতার মান নির্ণয় করা যায়।

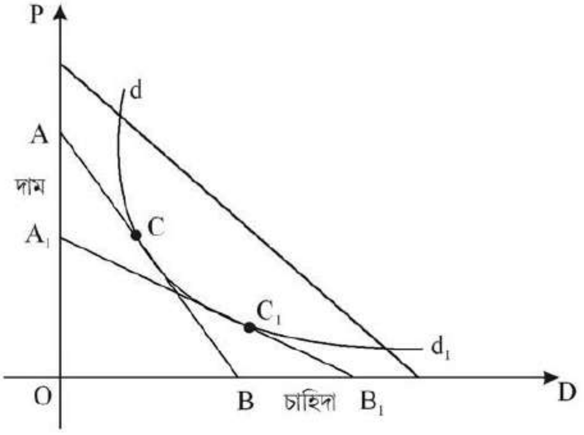

চিত্র ৩.১১

৩.৮ মান অনুসারে চাহিদার দামগত স্থিতিস্থাপকতার প্রভারভেদ

মান অনুযায়ী চাহিদার দামগত স্থিতিস্থাপকতাকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়।

(i) স্থিতিস্থাপক চাহিদা (Elastic demand) : অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত অবস্থায় কোনো দ্রব্যের দামের পরিবর্তনের হারের চেয়ে চাহিদার পরিবর্তনের হার বেশি হলে তাকে স্থিতিস্থাপক চাহিদা বলে। এক্ষেত্রে চাহিদার দামগত স্থিতিস্থাপকতার (পরম) মান এক অপেক্ষা বেশি হবে ($|e_p| > 1$)।

(ii) অস্থিতিস্থাপক চাহিদা (Inelastic demand) : অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত অবস্থায় কোনো দ্রব্যের দামের পরিবর্তনের হারের চেয়ে চাহিদার পরিবর্তনের হার কম হলে তাকে অস্থিতিস্থাপক চাহিদা বলে। এক্ষেত্রে চাহিদার দামগত স্থিতিস্থাপকতার পরম মান এক অপেক্ষা কম হবে ($|e_p| < 1$)।

(iii) একক স্থিতিস্থাপক চাহিদা (Unit elastic demand) : অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত অবস্থায় কোনো দ্রব্যের দামের পরিবর্তনের হার এবং চাহিদার পরিবর্তনের হার সমান হলে (অবশ্যই বিপরীত দিকে), তাকে একক স্থিতিস্থাপক চাহিদা বলে। এক্ষেত্রে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার পরম মান একের সমান ($|e_p| = 1$) এবং

চাহিদা রেখাটি ৩.৫ নং চিত্রের ন্যায় আয়তক্ষেত্রিক পরাবৃত্ত (rectangular hyperbola) হবে।

(iv) সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক চাহিদা (Perfectly inelastic demand) : কোনো দ্রব্যের দামের পরিবর্তনের ফলে চাহিদার কোনো পরিবর্তন না হলে তাকে সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক চাহিদা বলে। এক্ষেত্রে চাহিদার কোনো পরিবর্তন নেই বলে $\Delta q = 0$। অতএব, $e_p = \frac{p}{q} \cdot \frac{\Delta q}{\Delta p} = 0$ । এক্ষেত্রে চাহিদা রেখাটি ৩.১২ নং চিত্রের ন্যায় উল্লম্ব সরলরেখা হবে।

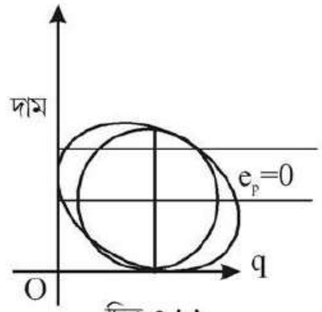

চিত্র ৩.১২

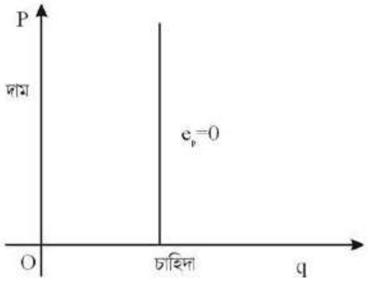

চিত্র ৩.১২A

(v) সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক চাহিদা (Perfectly elastic demand) : কোনো একটি দ্রব্যের দামের কোনো পরিবর্তন না হলে অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট দামে দ্রব্যটি বিক্রি হলে সেই দ্রব্যের চাহিদাকে সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক চাহিদা বলে। এক্ষেত্রে দামের কোনো পরিবর্তন নেই। অতএব, $\Delta p = 0$ এবং $e_p = \frac{p}{q} \cdot \frac{\Delta q}{\Delta p} = \infty$ (অসীম)। এক্ষেত্রে চাহিদা রেখাটি ৩.১৩ নং চিত্রের ন্যায় অনুভূমিক সরলরেখা হবে।

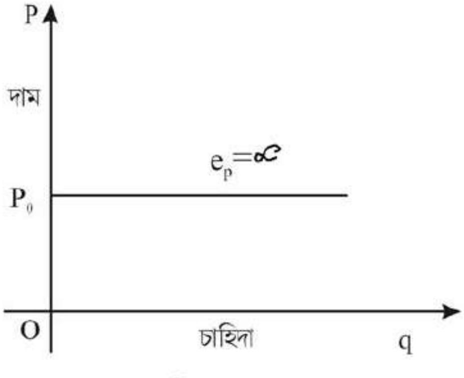

চিত্র ৩.১৩

৩.৯ চাহিদার দামগত স্থিতিস্থাপকতা নির্ধারণকারী বিষয়সমূহ

কোনো দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার মান কম হবে কি বেশি হবে, অর্থাৎ চাহিদা স্থিতিস্থাপক হবে, না, অস্থিতিস্থাপক হবে, তা একাধিক বিষয়ের উপর নির্ভর করে। সংক্ষেপে সেগুলি নিম্নরূপ :

(i) কোনো দ্রব্যের যদি ঘনিষ্ঠ বিকল্প থাকে, তাহলে ঐ দ্রব্যের চাহিদা হবে স্থিতিস্থাপক। কেননা ঐ দ্রব্যের দাম একটু বাড়লেই লোকে ঘনিষ্ঠ বিকল্প দ্রব্যে সরে যাবে। ফলে চাহিদা অনেকটা কমবে। আবার, দ্রব্যটির দাম কমলে বিকল্প দ্রব্যের ক্রেতারাও ঐ দ্রব্যটি কিনতে শুরু করবে। ফলে চাহিদা অনেক বাড়বে। সুতরাং চাহিদা হবে স্থিতিস্থাপক। অন্যদিকে, দ্রব্যটির যদি ঘনিষ্ঠ বিকল্প না থাকে তবে চাহিদা হবে অস্থিতিস্থাপক। লবণের বিকল্প নেই বলে এর চাহিদা হবে অস্থিতিস্থাপক।

(ii) নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার মান কম হবে অর্থাৎ চাহিদা হবে তুলনামূলকভাবে অস্থিতিস্থাপক। কারণ এক্ষেত্রে ক্রেতার একটা ভোগের অভ্যাস তৈরি হয়ে যায়। তাই দাম পরিবর্তনের ফলে চাহিদার হেরফের তুলনায় কম হয়।

(iii) বিলাস দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদা হবে স্থিতিস্থাপক। কেননা বিলাস দ্রব্যের ক্ষেত্রে প্রায়শই দ্রব্যটির ঘনিষ্ঠ বিকল্প থাকে। তাছাড়া, বিলাস দ্রব্যের ক্ষেত্রে দ্রব্যটির দাম বাড়লে ভোগকারী অপেক্ষা করতে পারে এবং পরে কিনতে পারে। কিন্তু নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ক্ষেত্রে ভোগকারী তা পারে না।

(iv) যে সকল দ্রব্যের একাধিক ব্যবহার আছে তার চাহিদা হবে স্থিতিস্থাপক, যেমন, বিদ্যুৎ। বিদ্যুতের দাম কমলে বিভিন্ন কাজে বিদ্যুতের ব্যবহার একটু একটু করে বাড়লে মোট ব্যবহার অনেকটা বাড়বে। ফলে চাহিদা হবে স্থিতিস্থাপক।

(v) যে সকল দ্রব্যের ব্যবহার স্থগিত রাখা যায় তাদের চাহিদা হবে স্থিতিস্থাপক, যেমন, সিমেন্টের চাহিদা। সিমেন্টের দাম বাড়লে লোকে সাময়িকভাবে সিমেন্টের ব্যবহার স্থগিত রাখবে। ফলে চাহিদা অনেকটা কমবে।

(vi) নেশার দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার মান কম হবে অর্থাৎ চাহিদা হবে অস্থিতিস্থাপক। এক্ষেত্রে ভোগকারী কোনো একটি বিশেষ দ্রব্যের ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে যায়। তাই দামের পরিবর্তনের ফলে চাহিদার বড় একটা পরিবর্তন হয় না।

(vii) স্থিতিস্থাপকতার মান দ্রব্যের দামের উপরও নির্ভর করে। বেশি দামে চাহিদা হবে স্থিতিস্থাপক। আর কম দামে চাহিদা হবে তুলনামূলকভাবে অস্থিতিস্থাপক।

(viii) চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার মান দ্রব্যের স্থায়িত্বের উপরও নির্ভর করে। সাধারণত পচনশীল দ্রব্যের চাহিদা হবে স্থিতিস্থাপক, এবং স্থায়ী ভোগ্য দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদা হবে অস্থিতিস্থাপক।

৩.১০ অর্থশাস্ত্রে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ধারণাটির ব্যবহার বা গুরুত্ব

অর্থশাস্ত্রে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ধারণাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত নিতে এই ধারণার ব্যবহার হয়।

(i) দাম কমিয়ে বিক্রি বাড়ানো লাভজনক কিনা তা জানতে চাহিদার দামগত স্থিতিস্থাপকতা জানা প্রয়োজন।

(ii) কোনো দ্রব্যের উপর কর বসালে ঐ দ্রব্যের দাম কতটা বাড়বে তা ঐ দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার উপর নির্ভর করে।

(iii) কোনো দ্রব্যের দামের পরিবর্তনের ফলে চাহিদার কতটা পরিবর্তন ঘটবে তা ঐ দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা থেকে জানা যায়।

(iv) বিজ্ঞাপন ব্যয়ের দ্বারা কোনো দ্রব্যের চাহিদা কতটা প্রভাবিত করা যাবে তা বিজ্ঞাপন ব্যয়জনিত চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা থেকে জানা যায়।

(v) দুটি দেশের মধ্যে বাণিজ্য হার (terms of trade) কীরূপ হবে তা দেশগুলির আমদানি ও রপ্তানি দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার উপর অনেকটা নির্ভর করে।

(vi) কোনো দেশ তার মুদ্রার অবমূল্যায়ন ঘটাবে কিনা সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে হলে (ঐ দেশের) আমদানি ও রপ্তানি দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা জানতে হয়।

৩.১১ সারাংশ

১. চাহিদার সংজ্ঞা (Definition of demand) : ক্রয়ক্ষমতা দ্বারা সমর্থিত ক্রয়ের ইচ্ছাকে চাহিদা বলে। চাহিদা দু'প্রকারের : ব্যক্তিগত চাহিদা ও বাজার চাহিদা। ব্যক্তিগত চাহিদাগুলিকে যোগ করেই বাজার চাহিদা পাওয়া যায়।

২. চাহিদা নির্ধারণকারী বিষয়সমূহ (Factors affecting demand) : ব্যক্তিগত চাহিদা নির্ধারণকারী প্রধান বিষয়গুলি হল : দ্রব্যের দাম, ভোগকারীর আয়, ঐ দ্রব্যের সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের দাম, ক্রেতার রুচি, পছন্দ প্রভৃতি। বাজার চাহিদা এই সমস্ত বিষয়গুলি ছাড়াও আর যে সমস্ত বিষয়ের উপর নির্ভর করে সেগুলি হল : বাজারে ক্রেতার সংখ্যা, আয়ের বণ্টন, বিজ্ঞাপন ব্যয়, ঋণের শর্তাবলি, জনসংখ্যা ও তার বয়সের বণ্টন, নতুন দ্রব্যের প্রচলন প্রভৃতি।

৩. চাহিদার নিয়ম (Law of demand) : অন্যান্য বিষয় অপরির্তিত অবস্থায় কোনো দ্রব্যের দাম কমলে চাহিদা বাড়বে এবং দাম বাড়লে চাহিদা কমবে। এটিই চাহিদার নিয়ম। নিয়মটিকে ব্যক্তিগত ও বাজার চাহিদা তালিকা দ্বারা এবং ব্যক্তিগত ও বাজার চাহিদা রেখা দ্বারা প্রকাশ করা যায়। চাহিদার নিয়ম কার্যকরী হলে চাহিদা রেখা বাঁদিক থেকে ডানদিকে নিম্নমুখী হবে।

৪. চাহিদার নিয়মের ব্যাখ্যা (Explanation of law of demand) : মার্শালের মতে, চাহিদার নিয়ম কার্যকর হবার পিছনে কাজ করে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি। অন্যদিকে, হিক্স, অ্যালেন প্রমুখের

মতে, চাহিদার নিয়ম বা দাম প্রভাবের পিছনে কাজ করে আয় প্রভাব ও পরিবর্ত প্রভাব।

৫. চাহিদা অপেক্ষক (Demand function) : কোনো দ্রব্যের চাহিদা এবং চাহিদা নির্ধারণকারী বিষয়সমূহের মধ্যে গাণিতিক সম্পর্ককেই চাহিদা অপেক্ষক বলে। চাহিদা অপেক্ষককে রেখাচিত্রে প্রকাশ করে আমরা পাই চাহিদা রেখা।

৬. চাহিদার নিয়মের ব্যতিক্রম (Explanation to the law of demand) : যে সমস্ত ক্ষেত্রে চাহিদার নিয়ম কাজ করে না সেগুলি হ'ল : প্রদর্শন প্রভাব, দাম সম্পর্কে প্রতিকূল প্রত্যাশা, আড়ম্বরপূর্ণ ভোগ, শেয়ার বাজার, গিফেন দ্রব্য, নেশার দ্রব্য, দামই যেখানে দ্রব্যটির মানের সূচক প্রভৃতি।

৭. চাহিদার পরিমাণে পরিবর্তন ও চাহিদায় পরিবর্তন (Change in quantity demanded and change in demand) : অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত অবস্থায় কোনো দ্রব্যের নিজস্ব দামের পরিবর্তনের ফলে চাহিদার যে পরিবর্তন ঘটে তাকে বলে চাহিদার পরিমাণে পরিবর্তন। অন্যদিকে, কোনো দ্রব্যের নিজস্ব দাম অপরিবর্তিত অবস্থায় অন্যান্য বিষয়ের পরিবর্তনের ফলে চাহিদার যে পরিবর্তন ঘটে তাকে বলে চাহিদায় পরিবর্তন। এক্ষেত্রে চাহিদা রেখার স্থানান্তর ঘটে।

৮. চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ও তার প্রকারভেদ (Elasticity of demand and its types) : অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত অবস্থায় কোনো একটি চাহিদা নির্ধারকের এক শতাংশ পরিবর্তনের ফলে কোনো দ্রব্যের চাহিদার যত শতাংশ পরিবর্তন ঘটে তাকে ঐ নির্ধারকের সাপেক্ষে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বলে। ইহা মূলত তিন প্রকারের : চাহিদার দামগত স্থিতিস্থাপকতা, চাহিদার আয়গত স্থিতিস্থাপতা এবং চাহিদার পারস্পরিক (দামগত) স্থিতিস্থাপতা। অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত অবস্থায় কোনো দ্রব্যের দামের এক শতাংশ পরিবর্তনের ফলে ঐ দ্রব্যের চাহিদার যত শতাংশ পরিবর্তন ঘটে, তাকেই ঐ দ্রব্যের চাহিদার দামগত স্থিতিস্থাপকতা বলে। তেমনি, অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত অবস্থায়, ভোগকারীর আয়ের এক শতাংশ পরিবর্তনের ফলে কোনো দ্রব্যের চাহিদার যত শতাংশ পরিবর্তন ঘটে তাকে ঐ দ্রব্যের চাহিদার আয়গত স্থিতিস্থাপকতা বলে। আর, অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত অবস্থায়, কোনো দ্রব্যের সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের দামের এক শতাংশ পরিবর্তন হলে ঐ বিশেষ দ্রব্যটির চাহিদার যত শতাংশ পরিবর্তন ঘটে তাকেই চাহিদার পারস্পরিক (দামগত) স্থিতিস্থাপকতা বলে।

৯. স্থিতিস্থাপক চাহিদা ও অস্থিতিস্থাপক চাহিদা (Elastic and inelastic demand) : কোনো দ্রব্যের দামের পরিবর্তনের হারের চেয়ে চাহিদা পরিবর্তনের হার বেশি হলে সেই চাহিদাকে স্থিতিস্থাপক চাহিদা বলে। অন্যদিকে, কোনো দ্রব্যের দামের পরিবর্তনের হারের চেয়ে চাহিদার পরিবর্তনের হার কম হলে সেই চাহিদাকে বলে অস্থিতিস্থাপক চাহিদা।

১০. চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা নির্ধারণকারী বিষয়সমূহ (Factorrs affecting price elasticity of demand) : চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা যে সমস্ত বিষয়ের উপর নির্ভর করে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য

হল—দ্রব্যের প্রকৃতি, দ্রব্যের স্থায়িত্ব, বিকল্প দ্রব্যের উপস্থিতি, দ্রব্যের বিকল্প ব্যবহার, দ্রব্যটির ভোগ বিরতির সম্ভাবনা, দ্রব্যের দাম প্রভৃতি।

১১. স্থিতিস্থাপকতা ধারণাটির গুরুত্ব (Importance of the concept of elasticity) : বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত নিতে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার ধারণাটির প্রয়োজন হয়। যেমন, বিক্রির উপর দামের পরিবর্তনের প্রভাব, দামের উপর করের প্রভাব, মুদ্রার অবমূল্যায়নের প্রভাব, বিক্রির উপর বিজ্ঞাপনের প্রভাব, দুটি দেশের মধ্যে বাণিজ্য হার জানতে ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে এই ধারণাটি ব্যবহার করা হয়। অর্থনীতিতে তাই চাহিদার দামগত স্থিতিস্থাপকতার ধারণাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৩.১২ অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্নাবলি (প্রতিটি ২ নম্বরের) (Short Answer Type Questions : Each of 2 Marks)

(১) চাহিদা কাকে বলে?

(২) চাহিদা তালিকা কাকে বলে?

(৩) চাহিদার নিয়মটি বিবৃত করুন।

(৪) চাহিদা রেখা কাকে বলে?

(৫) স্বাভাবিক দ্রব্য কাকে বলে?

(৬) নিকৃষ্ট দ্রব্যের সংজ্ঞা দিন।

(৭) বিপরীত চাহিদা অপেক্ষক কাকে বলে?

(৮) চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার সংজ্ঞা দিন।

(৯) চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কয় প্রকার ও কী কী?

(১০) চাহিদার দামগত স্থিতিস্থাপকতা কাকে বলে?

(১১) চাহিদার আয়গত স্থিতিস্থাপকতার সংজ্ঞা দিন।

(১২) চাহিদার পারস্পরিক দামগত স্থিতিস্থাপকতার সংজ্ঞা দিন।

(১৩) এঞ্জেল রেখা কাকে বলে?

(১৪) একক স্থিতিস্থাপক চাহিদা কাকে বলে?

(১৫) স্থিতিস্থাপক চাহিদার সংজ্ঞা দিন।

(১৬) অস্থিতিস্থাপক চাহিদা কাকে বলে?

(১৭) সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক চাহিদা কাকে বলে?

(১৮) সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক চাহিদার সংজ্ঞা দিন।

(১৯) গিফেন দ্রব্য কাকে বলে?

(২০) চাহিদার নিয়মের একটি ব্যতিক্রম উল্লেখ করুন।

(২১) একক স্থিতিস্থাপক চাহিদার ক্ষেত্রে চাহিদা রেখার আকৃতি কীরূপ হবে?

মাঝারি দৈর্ঘ্যের উত্তরের প্রশ্নাবলি (প্রতিটি ৫ নম্বরের) (Medium Answer Type Questions : Each of 5 Marks)

(১) ব্যক্তিগত ও বাজার চাহিদা তালিকার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করুন।

(২) চাহিদার নিয়মটি বিবৃত করুন? এই নিয়ম কেন ঘটে?

(৩) চাহিদার নিয়মের দুটি ব্যতিক্রম উল্লেখ করুন।

(৪) সরলরৈখিক ও বক্ররৈখিক চাহিদা বলতে কী বোঝেন?

(৫) ব্যক্তিগত চাহিদা রেখা থেকে আপনি কীভাবে বাজার চাহিদা রেখা অঙ্কন করবেন?

(৭) কোনো দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কী কী বিষয়ের উপর নির্ভর করে?

(৮) চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ধারণাটির গুরুত্ব বর্ণনা করুন।

(৯) স্থিতিস্থাপক ও অস্থিতিস্থাপক চাহিদার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করুন।

(১০) সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক এবং সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক চাহিদা বলতে কী বোঝেন?

(১১) মান অনুসারে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতাকে কী কী ভাগে ভাগ করা যায়?

(১২) চাহিদার পারস্পরিক দামগত স্থিতিস্থাপকতার ধারণাটি ব্যাখ্যা করুন।

(১৩) চাহিদার পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতার গাণিতিক চিহ্ন থেকে আমরা দুটি দ্রব্যের মধ্যে সম্পর্ক কীভাবে জানতে পারি?

(১৪) চাহিদার আয়গত স্থিতিস্থাপকতা কাকে বলে? এর মান ও চিহ্ন থেকে আমরা দ্রব্যের প্রকৃতি সম্পর্কে কী তথ্য পেতে পারি?

দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্নাবলি (প্রতিটি ১০ নম্বরের) (Long Answer Type Questions : Each of 10 Marks)

(১) কোনো দ্রব্যের চাহিদা নির্ধারণকারী বিষয়সমূহ বর্ণনা করুন।

(২) চাহিদার নিয়মের ব্যতিক্রমগুলি উল্লেখ করুন।

(৩) চাহিদার পরিমাণে পরিবর্তন ও চাহিদায় পরিবর্তনের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করুন।

(৪) আয়-চাহিদা রেখার কোনো বিন্দুতে তুমি চাহিদার আয়গত স্থিতিস্থাপকতা কীভাবে পরিমাপ করবেন?

(৫) চাহিদা রেখার উপর কোনো বিন্দুতে আপনি চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কীভাবে পরিমাপ করবেন?

(৬) দেখান যে সরলরৈখিক চাহিদা রেখার উপর প্রত্যেক বিন্দুতে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার মান আলাদা হবে।

(৭) প্রমাণ করুন যে, সরলরৈখিক চাহিদা রেখার উপর চাহিদার দামগত স্থিতিস্থাপকতার মান শূন্য থেকে অসীমের মধ্যে বিরাজ করে।

৩.১৩ নির্বাচিত গ্রন্থতালিকা

(১) Samuelson, P.A. & William Nordhaus (1985) : Economics, McGraw Hill

(২) Stonier, A.W & D.C. Hague (1957) : A Text Book of Economic Theory, Orient Longman.

(৩) Ahuja, H.L. (1979) : Advanced Economic Theory, S. Chand & Co.

(৪) সরখেল, জয়দেব (১৯৯৮) : আধুনিক অর্থনীতির ভূমিকা, বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড।

(৫) Lipsey, R (1983) : An Inntroduction to Positive Economics, ELBS.

একক ৪ ❑ উৎপাদন তত্ত্ব

গঠন

৪.১ উদ্দেশ্য

৪.২ প্রস্তাবনা

৪.৩ উৎপাদনের সংজ্ঞা ও উৎপাদনের উপাদানসমূহ

৪.৪ উৎপাদন অপেক্ষক

৪.৫ মোট উৎপাদন, গড় উৎপাদন ও প্রান্তিক উৎপাদন

৪.৫.১ ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়ম

৪.৬ প্রতিদানের নিয়মাবলি

৪.৬.১ একটি পরিবর্তনীয় উপাদান : পরিবর্তনীয় অনুপাতের নিয়ম

৪.৬.২ উৎপাদনের তিনটি স্তর এবং তাদের ব্যাখ্যা

৪.৬.৩ কার্যকলাপের স্তর

৪.৬.৪ গড় উৎপাদন ও প্রান্তিক উৎপাদনের মধ্যে সম্পর্ক

৪.৭ দুটি পরিবর্তনীয় উপাদান : সমোৎপাদন রেখা

৪.৭.১ সমোৎপাদন রেখার বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং সেগুলির প্রমাণ

৪.৭.২ সম্পূর্ণ পরিবর্ত ও সম্পূর্ণ পরিপূরক উপাদানের ক্ষেত্রে সমোৎপাদন রেখার আকৃতি

৪.৮ সমব্যয় রেখা ও এর স্থানান্তর

৪.৯ উৎপাদকের ভারসাম্য বা সর্বোত্তম উপাদান সম্মিলন নির্বাচন

৪.৯.১ ব্যয় স্থির রেখে উৎপাদন সর্বাধিককরণ

৪.৯.২ উৎপাদন স্থির রেখে ব্যয় সর্বনিম্নকরণ

৪.১০ সারাংশ

৪.১১ অনুশীলনী

৪.১২ নির্বাচিত গ্রন্থাবলি

৪.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে শিক্ষার্থীরা জানতে পারবে

- উৎপাদন ও উৎপাদনের উপাদানসমূহ
- উৎপদেন অপেক্ষক
- মোট গড় ও প্রান্তিক উৎপাদনের সম্পর্ক
- উৎপাদনের নিয়মাবলি
- ফার্মের সর্বোত্তম উপাদান সম্মিলন নির্বাচন

৪.২ প্রস্তাবনা

আগের দুটি এককে আমরা চাহিদা ও ভোগ নিয়ে আলোচনা করেছি। দ্রব্যের ভোগ বা চাহিদা মেটাতে দ্রব্যের উৎপাদন বা জোগান প্রয়োজন। এই উৎপাদনের বিভিন্ন দিক নিয়ে বর্তমান এককে আলোচনা করা হবে। উৎপাদন কাকে বলে, উৎপাদনের উপকরণগুলি কী কী? উপকরণগুলির পরিমাণ পরিবর্তন করলে উৎপাদনের স্তরের কীরূপ পরিবর্তন হয় ইত্যাদি বিষয় আমরা বিবেচনা করবো। এছাড়া, কোনো কার্য বা উৎপাদন প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন উপকরণ নিয়োগের পরিমাণ কীভাবে নির্ধারণ করবে তাও এই এককে আলোচনা করা হবে।

৪.৩ উৎপাদনের সংজ্ঞা এবং উৎপাদনের উপাদানসমূহ

☐ **উৎপাদন (Production) :** প্রাচীন বা ধ্রুপদি সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, উৎপাদন হল কোনো বস্তুকে এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তরিত করা। কিন্তু এই সংজ্ঞায় সেবাকার্যের উৎপাদন বাদ পড়েছে। যেমন, অর্থবিদ্যার জনক প্রাচীন ধনবিজ্ঞানী অ্যাডাম স্মিথ বলেছেন, উৎপাদন হল বস্তুগত দ্রব্য সৃষ্টি করা (to create some physical goods)। এই সংজ্ঞায় সেবাকার্যের উৎপাদন ধরা হয়নি। তাছাড়া, মানুষ কিছু সৃষ্টি করতে পারে না, সে প্রকৃতিদত্ত দ্রব্যের উপর তার শ্রম প্রয়োগ করে সেটাকে ব্যবহারের উপযোগী করে তোলে। সেজন্য নয়া-ধ্রুপদি অর্থনীতিবিদ মার্শাল উৎপাদন বলতে উপযোগিতা সৃষ্টিকে বুঝিয়েছেন। বর্তমান অর্থনীতিবিদগণ এই নয়া-ধ্রুপদি মতটিই গ্রহণ করেছেন। নয়া-ধ্রুপদি সংজ্ঞায় বলা হয়, উৎপাদন হল বিনিময়ের মাধ্যমে উপযোগিতা সৃষ্টি (Production is creation of utility through exchange)। লক্ষণীয় যে, শুধু উপযোগিতা সৃষ্টিকেই উৎপাদন বলা হবে না। স্নানের ঘরে গান করলে উপযোগিতা সৃষ্টি

হলেও তা উৎপাদন নয়। কিন্তু কোনো গানের ফাংশানে অর্থের বিনিময়ে গান করা হল উৎপাদন। বেআইনী কাজকর্ম থেকে উপযোগিতা সৃষ্টি হয় না বলে তা উৎপাদনী কাজকর্ম নয়। চাষির ফসল ফলানো, শ্রমিকের কারখানায় দ্রব্য তৈরি, জেলের মাছ ধরে বিক্রি, শিক্ষকের বিদ্যালয়ে শিক্ষা দান, ডাক্তারের চিকিৎসা, উকিলের ওকালতি ইত্যাদি সবই উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত কাজকর্ম। তবে মায়ের সন্তানপালন, গৃহবধূর বাড়িতে কাজকর্ম, সখের ছবি আঁকা, বাড়িতে শখের বাগান প্রভৃতি উৎপাদন নয় কারণ এগুলি উপযোগিতা সৃষ্টি করলেও এই কাজগুলি বাজারের জন্য করা হয় না।

☐ **উৎপাদনের উপাদানসমূহ (Inputs or Factors of Production) :** কোনো দ্রব্য বা সেবাকার্য উৎপাদনের জন্য যে সমস্ত বিষয় লাগে তাদের বলা হয় উপাদান (Factors or Inputs)। যে দ্রব্য বা সেবাকার্য উৎপন্ন হল তাকে বলা হয় চূড়ান্ত দ্রব্য (Final product or output)। উৎপাদনের উপাদান হল চারটি : জমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন। জমি হল উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত প্রাকৃতিক সম্পদ। যেমন, জমি, বন, মাছের ভেড়ি প্রভৃতি। শ্রম হল মানুষ কর্তৃক প্রযুক্ত প্রচেষ্টা (effort) যা শ্রমিকেরা দিয়ে থাকে। মূলধন হল উৎপাদনের উৎপাদিত মাধ্যম যার দ্বারা শ্রম প্রয়োগ করা সহজতর বা সম্ভবপর হয়, যেমন, যন্ত্রপাতি। উৎপাদনের এই তিনটি উপাদানকে একত্রিত করে উপযুক্ত অনুপাতে ব্যবহারকারী হল সংগঠন বা উদ্যোক্তা।

৪.৪ উৎপাদন অপেক্ষক

উৎপাদন নিয়োগের পরিমাণ এবং উৎপন্নের পরিমাণের মধ্যে কারিগরি সম্পর্ককে উৎপাদন অপেক্ষক বলে। বিভিন্ন পরিমাণ উপাদান নিয়োগ করে যে সর্বাধিক পরিমাণ উৎপন্ন পাওয়া যেতে পারে তাই উৎপাদন অপেক্ষক থেকে জানা যায়। এখন মোট উৎপন্নের পরিমাণ (q) নির্ভর করে জমি (l), শ্রম (L), মূলধন (K) এবং সংগঠন (O) নিয়োগের পরিমাণের উপর। তাহলে উৎপাদন অপেক্ষকটি লিখতে পারি :

$$q = f(l, L, K, O)$$

৪.৫ মোট উৎপাদন, গড় উৎপাদন ও প্রান্তিক উৎপাদন

মোট উৎপাদন : অন্যান্য উপাদানের পরিমাণ স্থির রেখে কেবলমাত্র পরিবর্তনীয় উপাদানের বিভিন্ন পরিমাণ নিয়োগের জন্য যে বিভিন্ন পরিমাণ উৎপন্ন পাওয়া যায় তাই হল ঐ পরিবর্তনীয় উপাদানের মোট উৎপাদন। আমাদের উৎপাদন অপেক্ষকটি হল : $q = f(l, L, K, O)$। এখন শ্রম (L) ছাড়া অন্যান্য উপাদানগুলির পরিমাণ অপরিবর্তিত রাখলে আমরা লিখতে পারি : $q = f(L)$। অর্থাৎ উৎপাদনের পরিমাণ নির্ভর করে শ্রমের নিয়োগের পরিমাণের (L) উপর। এখানে L হল পরিবর্তনীয় উপাদান। L-এর মান পরিবর্তিত হলে q-এর মানও পরিবর্তিত হবে। L-এর বিভিন্ন মানে q-এর যে বিভিন্ন পরিমাণ পাওয়া

যায় তাকেই বলে L-এর মোট উৎপাদন। তেমনি, আমরা L কে স্থির রেখে K-এর মোট উৎপাদন পেতে পারি।

গড় উৎপাদন : কোনো উৎপাদনের ইউনিট পিছু সেই উৎপাদন হল ঐ উপাদানের গড় উৎপাদন। আমাদের উৎপাদন অপেক্ষকটি হল : $q = f(L)$। তাহলে শ্রমের (L) গড় উৎপাদন হল $q/_L$। অর্থাৎ মোট উৎপাদনকে পরিবর্তনীয় উপাদানের পরিমাণ দিয়ে ভাগ করলে ঐ পরিবর্তনীয় উপাদানের গড় উৎপাদন বা মাথাপিছু উৎপাদনের পরিমাণ জানা যায়। পরিবর্তনীয় উপাদানের পরিমাণ পরিবর্তিত হলে গড় উৎপাদনের পরিমাণও সাধারণত পরিবর্তিত হয়।

প্রান্তিক উৎপাদন : অন্যান্য উপাদানের পরিমাণ স্থির রেখে কেবলমাত্র একটি উপাদানের নিয়োগের এক ইউনিট পরিবর্তন করা হয়, তাহলে মোট উৎপাদনের যে পরিবর্তন ঘটে তাকেই ঐ পরিবর্তনীয় উপাদানের ঐ ইউনিটের প্রান্তিক উৎপাদন বলে। মনে করি, আমাদের পরিবর্তনীয় উপাদান হল শ্রম (L)। এর ΔL ইউনিট পরিবর্তনের ফলে মোট উৎপাদনের (q) পরিবর্তন হল Δq ইউনিট। তাহলে শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন হল $\frac{\Delta q}{\Delta L}$। মোট উৎপাদন বাড়লে প্রান্তিক উৎপাদন হবে ধনাত্মক। মোট উৎপাদন কমলে প্রান্তিক উৎপাদন হবে ঋণাত্মক। মোট উৎপাদন স্থির থাকলে প্রান্তিক উৎপাদন হবে শূন্য।

৪.৫.১. ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়ম

অর্থনীতিবিদ রিকার্ডো এই নিয়মটি বিবৃত করেন। তাঁর মতে, অন্যান্য উপাদানের পরিমাণ স্থির রেখে কেবলমাত্র একটি উপাদানের (ধরি, শ্রমের) পরিমাণ যদি ক্রমাগত বাড়ানো হয় তাহলে ঐ উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদন একটি স্তরের পর ক্রমাগত কমতে থাকবে। অন্যভাবে বলতে গেলে, একখণ্ড জমিতে মূলধনের পরিমাণ অপরিবর্তিত রেখে কেবলমাত্র শ্রমের পরিমাণ যদি ক্রমাগত বাড়ানো হয়, তাহলে মোট উৎপাদন বাড়বে বটে, তবে তা কম কম হারে বাড়বে। রেখাচিত্রের ভাষায় বলতে গেলে, প্রান্তিক উৎপাদন রেখা নিম্নমুখী হবে এবং মোট উৎপাদন রেখা শ্রমের অক্ষের দিকে অবতল হবে। স্বল্পকালে উৎপাদনের সময় এই নিয়মটি প্রযোজ্য হয়।

৪.৬ প্রতিদানের নিয়মাবলি

আমরা জানি যে, মোট উৎপাদনের পরিমাণ নির্ভর করে উপাদানগুলির নিয়োগের পরিমাণের উপর। উপাদানগুলির নিয়োগের পরিমাণ পরিবর্তিত হলে মোট উৎপাদন বা প্রতিদানের কীরূপ পরিবর্তন হবে সেই নিয়মকেই বলা হয় প্রতিদানের নিয়ম। এই নিয়ম প্রধানত দু'রকমের। **প্রথমত,** পরিবর্তনীয় অনুপাতের নিয়ম। অন্যান্য উপাদানের পরিমাণ অপরিবর্তিত রেখে কেবলমাত্র একটি উপাদানের নিয়োগের পরিমাণে

পরিবর্তন হলে মোট উৎপাদন বা প্রতিদানে কীরূপ পরিবর্তন হবে তা এই নিয়ম থেকে জানা যায়। এটি আসলে ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়মের সাধারণ রূপ (general form)। এটি স্বল্পকালের উৎপাদন ব্যবস্থার নিয়ম। **দ্বিতীয়টি** হল, মাত্রাবৃদ্ধির প্রতিদানের নিয়ম। এটি দীর্ঘকালের উৎপাদনের নিয়ম। যখন সমস্ত উপাদানের পরিমাণ একই হারে বাড়ানো বা কমানো হয় অর্থাৎ উৎপাদনের মাত্রার পরিবর্তন হয়, তখন উৎপাদনের পরিমাণে পরিবর্তন জানা যায় মাত্রাবৃদ্ধির প্রতিদানের নিয়ম থেকে। মাত্রা বৃদ্ধির প্রতিদানের নিয়ম অনুযায়ী মাত্রাবৃদ্ধির প্রতিদান তিন রকমের হতে পারে। সেগুলি হল, সমহার মাত্রাবৃদ্ধির প্রতিদান, বর্ধমান মাত্রাবৃদ্ধির প্রতিদান এবং হ্রাসমান মাত্রাবৃদ্ধির প্রতিদান। সব উপাদানের পরিমাণ যে হারে বাড়ানো হয়, মোট উৎপাদনও যদি একই হারে বাড়ে তাহলে তাকে সমহার মাত্রাবৃদ্ধির প্রতিদান (constant returns to scale) বলে। আবার, সব উপাদানের পরিমাণ যে হারে বাড়ানো হচ্ছে, যদি মোট উৎপাদন তার চেয়ে বেশি হারে বাড়ে তাহলে তাকে বর্ধমান মাত্রাবৃদ্ধির প্রতিদান (increasing returns to scale) বলে। অন্যদিকে, সব উপাদানের পরিমাণ যে হারে বাড়ানো হয়, মোট উৎপাদন যদি তার চেয়ে কম হারে বাড়ে, তাহলে তাকে হ্রাসমান মাত্রাবৃদ্ধির প্রতিদান (decreasing returns to scale) বলে। বর্তমান এককে আমরা পরিবর্তনীয় অনুপাতের নিয়মটি আলোচনা করবো।

৪.৬.১. একটি পরিবর্তনীয় উপাদান : পরিবর্তনীয় অনুপাতের নিয়ম

উৎপাদন কৌশল এবং অন্যান্য উপাদানের পরিমাণ স্থির থাকলে যদি একটি উপাদানের পরিমাণ ক্রমাগত বাড়ানো হয় তাহলে মোট উৎপাদন বৃদ্ধির পরিমাণ একটা স্তরের বা অবস্থার পর কমতে থাকবে। একেই পরিবর্তনীয় অনুপাতের নিয়ম বলা হয়। এখানে আমরা একটিমাত্র পরিবর্তনীয় উপাদান, শ্রম (L) ধরছি। সুতরাং, মোট উৎপাদন অপেক্ষক, $q = f(L)$। L-এর পরিমাণ পরিবর্তিত হলে উপাদান-অনুপাত পরিবর্তিত হবে। এই পরিবর্তনীয় উপাদান অনুপাতের ক্ষেত্রে মোট উৎপাদন কীভাবে পরিবর্তিত হবে, তাই-ই পরিবর্তনীয় অনুপাতের নিয়ম থেকে জানা যায়। আমরা যদি পরিবর্তনীয় উপাদান (L)-কে অনুভূমিক অক্ষে এবং মোট উৎপাদন (Total product বা TP বা q) উল্লম্ব অক্ষে পরিমাপ করি, তাহলে মোট উৎপাদন (TP) রেখা অনুভূমিক অক্ষের দিকে প্রথমে উত্তল এবং তারপর অবতল হবে। ৪.১ নং চিত্রে এটা দেখানো হয়েছে। এই চিত্রের উপরের অংশে আমরা মোট উৎপাদন রেখা TP এঁকেছি।

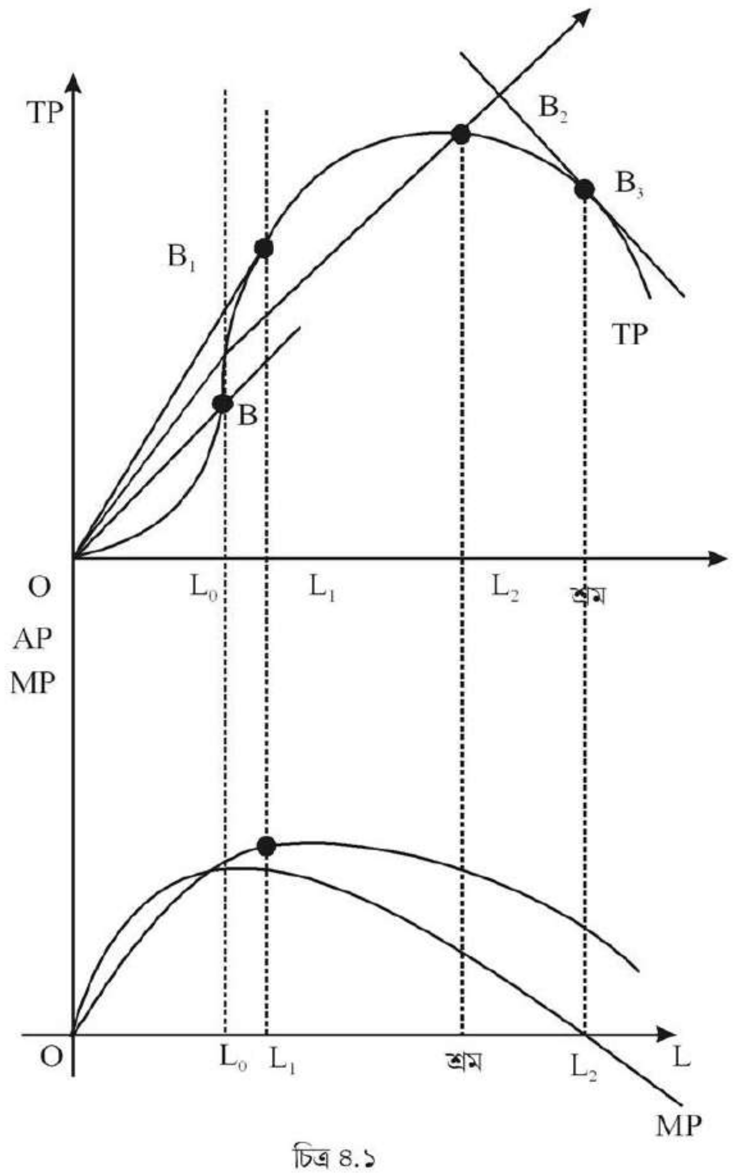

চিত্র ৪.১

এই মোট উৎপাদন (TP) রেখা থেকে আমরা গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন রেখা টানতে পারি। এখানে, শ্রমের গড় উৎপাদন = মোট উৎপাদন ÷ শ্রম নিয়োগের পরিমাণ অর্থাৎ $AP = {}^{TP}/_{L}$। যখন শ্রম নিয়োগের পরিমাণ OL_0, মোট উৎপাদন = BL_0। অতএব তখন শ্রমের গড় উৎপাদন = BL_0/OL_0 = OB রেখার ঢাল। তেমনি, B_1 বিন্দুতে শ্রমের গড় উৎপাদন = $B_1L_1\ /OL_1$ = OB_1 রেখার ঢাল। দেখা যাচ্ছে, OL_1 পরিমাণ শ্রম নিয়োগ পর্যন্ত গড় উৎপাদন (AP) বাড়ছে। B_1 বিন্দুতে গড় উৎপাদন সর্বাধিক। এরপর শ্রম নিয়োগ আরো বাড়লে গড় উৎপাদন কমছে। যেমন, B_2 বিন্দুত গড় উৎপাদন = B_2L_2/OL_2 = OB_2 রেখার ঢাল < OB_1 রেখার ঢাল। সুতরাং, AP বা গড় উৎপাদন প্রথমে বাড়ে, তারপর সর্বাধিক হয় এবং অবশেষে কমে। অর্থাৎ AP রেখা উল্টানো U-আকৃতির হবে। আমরা চিত্রের নীচের অংশে এই AP রেখা এঁকেছি।

এবার শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন (MP) রেখা আঁকা যাক। শ্রম নিয়োগ এক একক বাড়ালে মোট উৎপাদনের যতটা পরিবর্তন হয় তাকেই বলে শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন। গাণিতিক প্রতীকের সাহায্যে বলতে গেলে, $MP = \Delta q/_{\Delta L}$। রেখাচিত্রের ভাষায় বলতে গেলে, TP রেখার উপর কোনো বিন্দুতে স্পর্শক টানলে ঐ স্পর্শকের ঢালই হবে ঐ বিন্দুতে শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন। চিত্রে দেখা যাচ্ছে যে, TP রেখার উপর স্পর্শকের ঢাল প্রথমদিকে বাড়ছে। তারপর B বিন্দুতে ঐ ঢাল সর্বাধিক। অর্থাৎ MP প্রথমে বাড়বে এবং B বিন্দুতে MP সর্বাধিক হবে। B বিন্দুকে বলা হল বাঁক বদলের বিন্দু (point of inflexion)। B বিন্দুর ডানদিকে TP রেখার ঢাল কমছে অর্থাৎ MP কমছে। B_1 বিন্দুতে MP = OB_1 রেখার ঢাল = B_1 বিন্দুতে AP। সুতরাং B_1 বিন্দুতে MP = AP। আবার, B_1 বিন্দুতে AP সর্বাধিক। সুতরাং যখন AP সর্বাধিক, তখন AP = MP। B বিন্দুর ডানদিকে TP রেখার ঢাল অর্থাৎ MP ক্রমাগত কমছে। B_2 বিন্দুতে TP রেখার ঢাল শূন্য বা MP শূন্য। B_3 বিন্দুতে TP রেখার ঢাল ঋণাত্মক বা MP ঋণাত্মক। সুতরাং MP প্রথমে বাড়বে তারপর সর্বাধিক হবে এবং অবশেষে কমতে কমতে শূন্য হয়ে ঋণাত্মক মানে পৌঁছাবে। আমাদের চিত্রের নীচের অংশে আমরা এরূপ একটি MP রেখা টেনেছি।

৪.৬.২. উৎপাদনের তিনটি স্তর এবং তাদের ব্যাখ্যা

আমরা পরিবর্তনীয় অনুপাতের নিয়মের ক্ষেত্রে মোট উৎপাদনের পরিবর্তনের তিনটি স্তর বা পর্যায় লক্ষ করছি। সংক্ষেপে সেগুলি নিম্নরূপ :

প্রথম স্তর (First Stage) : এই স্তর হল সেই পর্যন্ত যেখানে গড় উৎপাদন সর্বাধিক। এই স্তরে গড় উৎপাদন বাড়বে এবং প্রান্তিক উৎপাদন, গড় উৎপাদন অপেক্ষা বেশি হবে। আমদের চিত্রে OL_1 পরিমাণ শ্রম নিয়োগ পর্যন্ত বা B_1L_1 পরিমাণ মোট উৎপাদন পর্যন্ত হল প্রথম স্তর।

দ্বিতীয় স্তর (Second Stage) : এই স্তরে গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন ধনাত্মক কিন্তু উভয়েই কমে। দ্বিতীয় স্তর শেষ হয় যেখানে প্রান্তিক উৎপাদন শূন্য বা মোট উৎপাদন সর্বাধিক। আমাদের চিত্রে L_1 থেকে L_2 শ্রম নিয়োগ পর্যন্ত বা B_1L_1 থেকে B_2L_2 পরিমাণ মোট উৎপাদন পর্যন্ত দ্বিতীয় স্তর।

তৃতীয় স্তর (Third Stage) : পরিবর্তনীয় অনুপাতের নিয়মের তৃতীয় স্তর হল সেই স্তর যেখানে মোট উৎপাদন কমে বা শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন ঋণাত্মক। আমাদের চিত্রে L_2 বিন্দুর ডানদিক বা TP রেখার B_2 বিন্দুর ডানদিকের অংশ হল তৃতীয় স্তর।

☐ **উৎপাদনের তিনটি স্তরের ব্যাখ্যা :** আমরা পরিবর্তনীয় অনুপাতের নিয়মের ক্ষেত্রে উৎপাদনের তিনটি স্তর পাই। প্রথম স্তরে গড় উৎপাদন ক্রমাগত বাড়ে, তবে প্রান্তিক উৎপাদনের বাড়া ও কমা দুই-ই ঘটে থাকে। এই স্তরটিকে **বর্ধমান গড় প্রতিদানের স্তর** (Stage of increasing average returns) বলা যেতে পারে। দ্বিতীয় স্তরটিকে **ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের স্তর** (Stage of diminishing returns) বলা যেতে পারে কারণ এই স্তরে গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন উভয়ই কমে। তৃতীয় স্তরকে বলা যেতে পারে ঋণাত্মক

প্রতিদানের স্তর (Stage of negative returns)। এই স্তরে মোট উৎপাদন কমে অর্থাৎ পরিবর্তনীয় উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদন ঋণাত্মক। এখন এই তিনটি স্তরের ব্যাখ্যা সংক্ষেপে দেওয়া যেতে পারে।

প্রথম স্তরে পরিবর্তনীয় উপাদানের তুলনায় স্থির উপাদানের পরিমাণ খুব বেশি। ফলে পরিবর্তনীয় উপাদানের নিয়োগ বাড়লে স্থির উপাদান আরো নিবিড়ভাবে ব্যবহৃত হয়। ফলে প্রথম স্তরে মোট উৎপাদন বর্ধমান হারে বাড়ে।

দ্বিতীয় স্তরে পরিবর্তনীয় উপাদানের তুলনায় স্থির উপাদানের পরিমাণ কম হয়ে পড়ে। ফলে এই স্তরে পরিবর্তনীয় উপাদানের গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন কমতে থাকে। এজন্য এই স্তরে মোট উৎপাদন (TP) হ্রাসমান হারে বাড়ে। ফলে গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন উভয়ই কমে এবং প্রান্তিক উৎপাদন, গড় উৎপাদন অপেক্ষা কম হয়।

তৃতীয় স্তরে পরিবর্তনীয় উপাদানের পরিমাণ স্থির উপাদানের তুলনায় অত্যধিক হয়ে পড়ে এবং তা স্থির উপাদানের উৎপাদনশীলতায় বাধার সৃষ্টি করে। ফলে এই স্তরে TP কমে, MP ঋণাত্মক হয় এবং AP ধনাত্মক হলেও খুব দ্রুত কমে।

৪.৬.৩. কার্যকলাপের স্তর

আমরা জানি, পরিবর্তনীয় অনুপাতের নিয়মের অধীনে উৎপাদনের তিনটি স্তর দেখা যায়। প্রথম স্তর হল বর্ধমান প্রতিদানের স্তর। দ্বিতীয় স্তর হল হ্রাসমান প্রতিদানের স্তর। তৃতীয় স্তর হল ঋণাত্মক প্রতিদানের স্তর বা মোট উৎপাদন হ্রাসের স্তর। এখন, প্রশ্ন হল, কোনো ফার্ম বা উৎপাদন প্রতিষ্ঠান উৎপাদনের কোন্ স্তরে উৎপাদন করবে? প্রথমেই বলা যায় যে, কোনো বিচক্ষণ (rational) ফার্ম কখনোই তৃতীয় স্তরে উৎপাদন করবে না যেখানে শ্রমের MP ঋণাত্মক এবং L বাড়ালে TP কমে। শ্রম বেশি নিয়োগ করে কম মোট উৎপাদন কোনো কার্যেই চাইবে না। তেমনি, কোনো কার্য প্রথম স্তরেও উৎপাদন করবে না। কেননা এই স্তরে শ্রমিকের গড় উৎপাদন ক্রমাগত বাড়ছে। সুতরাং, আরো আরো শ্রম নিয়োগ করা ফার্মের পক্ষে লাভজনক। সেক্ষেত্রে, একজন বিচক্ষণ উৎপাদক বা ফার্ম দ্বিতীয় স্তরে উৎপাদন করবে যেখানে পরিবর্তনীয় উপাদানের গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন উভয়ই হ্রাসমান কিন্তু ধনাত্মক। এই দ্বিতীয় স্তরকে তাই বলা হয় কার্যকলাপের স্তর (Stage of operation)। দ্বিতীয় স্তরের ঠিক কোন্ বিন্দুতে ফার্ম উৎপাদন করবে তা পরিবর্তনীয় উপাদানের (এক্ষেত্রে শ্রমের) দামের উপর নির্ভর করবে। যদি আমরা ধরি যে, ফার্মটি মুনাফা সর্বাধিক করতে চায়, তাহলে সেই বিন্দুতে উৎপাদন করবে যেখানে তার মুনাফা সর্বাধিক। মুনাফা সর্বাধিক করার জন্য ফার্মটি সেই বিন্দুতে উৎপাদন করবে যেখানে শ্রমের হ্রাসমান MP শ্রমের প্রকৃত মজুরির সঙ্গে সমান হয়।

৪.৬.৪. গড় উৎপাদন ও প্রান্তিক উৎপাদনের মধ্যে সম্পর্ক

উৎপাদনের ক্ষেত্রে পরিবর্তনীয় অনুপাতের নিয়ম কাজ করলে আমরা পরিবর্তনীয় উপাদানের গড় উৎপাদন (AP) ও প্রান্তিক উৎপাদনের (MP) মধ্যে একটি সম্পর্ক পাই। সম্পর্কটি হল : যখন গড় উৎপাদন বাড়ে, তখন প্রান্তিক উৎপাদন, গড় উৎপাদন অপেক্ষা বেশি হয়। যখন গড় উৎপাদন কমে, তখন প্রান্তিক উৎপাদন, গড় উৎপাদন অপেক্ষা কম হয়। যখন গড় উৎপাদন সর্বাধিক হয় বা স্থির থাকে, তখন গড় উৎপাদন ও প্রান্তিক উৎপাদন সমান হয়। সম্পর্কটি উল্টোদিক থেকেও দেখা যেতে পারে। যখন MP > AP, তখন AP বাড়ে। যখন MP < AP, তখন AP কমে। যখন MP = AP, তখন AP সর্বাধিক বা AP স্থির থাকে। আমরা ৪.২ নং চিত্রে এই সম্পর্কটি দেখিয়েছি। এটি আসলে আমাদের ৪.১ নং চিত্রের নীচের অংশ। চিত্রে দেখা যাচ্ছে যে, L_1 পরিমাণ শ্রম নিয়োগ পর্যন্ত AP বেড়েছে এবং তখন MP > AP। আবার, উল্টোভাবে দেখলে, L_1 পরিমাণ শ্রম নিয়োগ পর্যন্ত MP > AP এবং সেজন্যই AP বাড়ে। আবার, শ্রম নিয়োগ L_1-এর বেশি হলে AP কমে এবং তখন MP < AP। উল্টোভাবে, এই ক্ষেত্রে MP < AP এবং সেজন্যই AP কমে। আর শ্রম নিয়োগ ঠিক L_1 পরিমাণ হলে AP সর্বাধিক (বা স্থির), তখন AP = MP। অন্যভাবে, AP = MP হলে AP স্থির থাকবে।

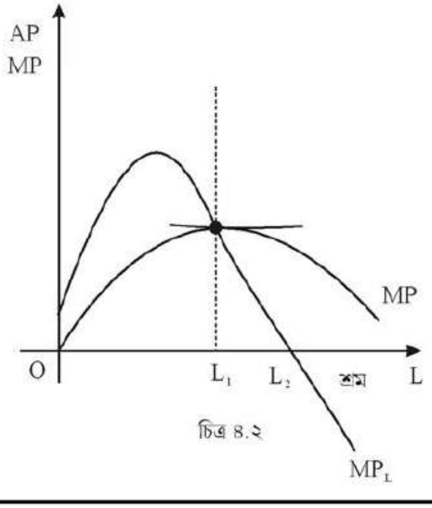

চিত্র ৪.২

৪.৭ দুটি পরিবর্তনীয় উপাদান

আমরা এতক্ষণ ধরে নিয়েছি যে, ফার্ম কেবলমাত্র একটি উপাদানের পরিমাণ পরিবর্তন করতে পারে। মনে করি, সেই পরিবর্তনীয় উপাদানটি হল শ্রম (L)। তাহলে মোট উৎপাদন (q) নির্ভর করে শ্রম নিয়োগের (L) পরিমাণের উপর অর্থাৎ $q = f(L)$ হল আমাদের উৎপাদন অপেক্ষক। এরূপ উৎপাদন অপেক্ষক স্বল্পকালে প্রযোজ্য কেননা স্বল্পকালে ফার্ম সাধারণত শুধু শ্রম নিয়োগের পরিমাণ পরিবর্তন করতে পারে। কিন্তু দীর্ঘকালে ফার্ম মূলধন বা যন্ত্রপাতির (K) নিয়োগের পরিমাণও পরিবর্তন করতে পারে। তাহলে দীর্ঘকালে উৎপাদন অপেক্ষকটি হল : $q = f(K, L)$। এক্ষেত্রে মোট উৎপাদনের (q)

পরিমাণ মূলধন (K) ও শ্রমের (L) নিয়োগের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। এই উৎপাদন অপেক্ষক তিনটি চলরাশি রয়েছে : q, K ও L। সুতরাং, একে রেখাচিত্রে স্থাপন করতে হলে আমাদের ত্রিমাত্রিক রেখাচিত্র চাই। সেই জটিলতা এড়ানোর জন্য আমরা ধরে নিচ্ছি যে, উৎপাদন q_0 স্তরে স্থির রয়েছে। তাহলে $f(K, L) = q_0$। এই অপেক্ষকের এখন দুটি চলরাশি : K ও L। আমরা K ও L-এর বিভিন্ন সমন্বয় থেকে q_0 পরিমাণ উৎপাদন পেতে পারি। K ও L-এর ঐ সমস্ত সমন্বয়গুলি যোগ করে আমরা যে রেখা পাই তাকে বলে সমোৎপাদন রেখা বা সমোৎপন্ন রেখা বলে। তাহলে আমরা বলতে পারি, **যে সমস্ত উপাদান সম্মিলন থেকে একই পরিমাণ উৎপাদন পাওয়া যায় তাদের যোগ করলে যে রেখা পাওয়া যায়, তাকে সমোৎপাদন রেখা বা সমোৎপন্ন রেখা বলে**। একটি সমোৎপাদন রেখা একটি উৎপাদনের স্তর নির্দেশ করে।

একটি উদাহরণের সাহায্যে সমোৎপাদন রেখার ধারণাটি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। মনে করি, উৎপাদন অপেক্ষকের বিশেষ রূপ হল : $q = KL$। তাহলে একটি সমোৎপাদন রেখার সমীকরণ হল : $q_0 = KL$। এখন মনে করি $q_0 = 12$, তাহলে একটি সমোৎপাদন রেখার সমীকরণ হল : $KL = 12$। এখানে K ও L-এর বিভিন্ন সম্মিলনগুলি পেতে পারি :

L	1	2	3	4	2
K	12	6	4	3	6

প্রভৃতি। এই বিন্দুগুলি রেখাচিত্রে স্থাপন করে আমরা A, B, C, D প্রভৃতি বিন্দু পাই (চিত্র ৪.৩)। এই বিন্দুগুলি যোগ করে আমরা $q_0 = 12$ এই উৎপাদনের স্তরের সমোৎপাদন রেখা পাই। এভাবে q-এর এক একটি মানের জন্য আমরা এক একটি সমোৎপাদন রেখা পাবো। q-এর মান যত বড় হবে, সমোৎপাদন রেখাটি তত ডানদিকে অবস্থান করবে। q-এর মান যত ছোট হবে, সমোৎপাদন রেখাটি তত নীচের দিকে অবস্থান করবে। একটা উৎপাদন অপেক্ষক থেকে আমরা এভাবে অনেক সমোৎপাদন রেখা পেতে পারি।

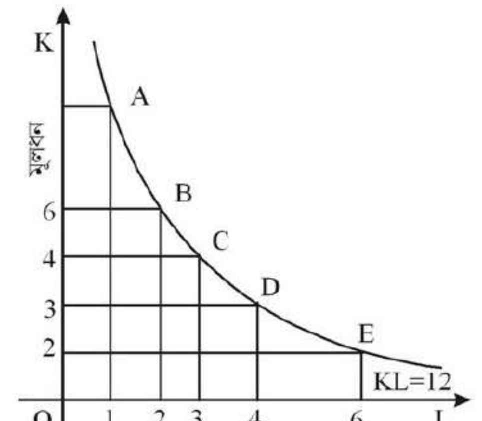

চিত্র ৪.৩

একাধিক সমোৎপাদন রেখা নিয়ে গঠিত হয় সমোৎপাদন মানচিত্র। ৪.৪ নং চিত্রে আমরা একটি

সমোৎপাদন মানচিত্র দেখিয়েছি। আমরা ধরে নিয়েছি, $q_2 > q_1 > q_0$। সেজন্য q_0 রেখার উপরে q_1 এবং q_1-এর উপরে q_2 রেখা অবস্থান করছে।

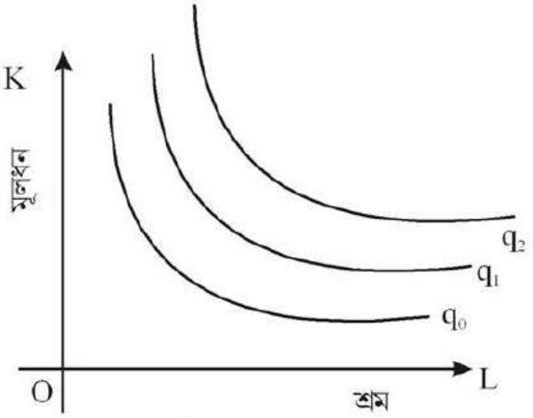

চিত্র ৪.৪

৪.৭.১. সমোৎপাদন রেখার বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং সেগুলির প্রমাণ

সমোৎপাদন রেখার চারটি বৈশিষ্ট্য আছে। সেগুলি হল :

(i) সমোৎপাদন রেখা বাঁদিক থেকে ডানদিকে নিম্নমুখী হবে।

(ii) সমোৎপাদন রেখা মূলবিন্দুর দিকে উত্তল হবে।

(iii) দুটি সমোৎপাদন রেখা কখনোই একে অপরকে ছেদ বা স্পর্শ করবে না।

(iv) সমোৎপাদন রেখা মূলবিন্দু থেকে যত উপরের দিকে অবস্থিত হবে, উৎপাদনের স্তর তত বেশি হবে।

□ **বৈশিষ্ট্যগুলির প্রমাণ (Proofs of the properties) :** সমোৎপাদন রেখায় বৈশিষ্ট্যগুলি প্রমাণ করার জন্য আমরা কয়েকটি অনুমান করছি।

(i) দুটি উপাদানেরই প্রান্তিক উৎপাদন ধনাত্মক ($MP_k > 0$, $MP_L > 0$)। অর্থাৎ, অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত অবস্থায় একটি উপাদানের নিয়োগ বাড়ালে মোট উৎপাদন বাড়বে।

(ii) ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক পরিবর্ততার কারিগরি হারের নিয়ম (Law of diminishing marginal rate of technical substitution বা MRTS) কাজ করছে। এর অর্থ হ'ল, ফার্ম বা উৎপাদক যদি বেশি বেশি শ্রম নিয়োগ করে, তাহলে উৎপাদনের স্তর অপরিবর্তিত রাখতে অতিরিক্ত এক এক ইউনিট শ্রমের বিনিময়ে কম কম পরিমাণ মূলধন ছাড়তে পারবে। এর তাৎপর্য হল, উপাদান দুটি একে অপরের পরিবর্ত কিন্তু সম্পূর্ণ বা পূর্ণাঙ্গ পরিবর্ত নয়।

(iii) বিভিন্ন উৎপাদনের স্তরগুলিকে গাণিতিকভাবে তুলনা করা যায়। মনে করি, A, B এবং C তিনটি উৎপাদনের স্তর নির্দেশ করছে। সেক্ষেত্রে, $A \gtreqless B$ হলে এবং $B \gtreqless C$ হলে $A \gtreqless C$ হবে।

(iv) উপাদান দুটিকে অসংখ্য রকম অনুপাতে ব্যবহার করা যায়। এর অর্থ হল, উৎপাদন কৌশলের সংখ্যা অসীম।

এই অনুমানগুলির সাহায্য নিয়ে আমরা সমোৎপাদন রেখার বৈশিষ্ট্যগুলি প্রমাণ করব।

বৈশিষ্ট্য (i) সমোৎপাদন রেখা বাঁদিক থেকে ডানদিকে নিম্নমুখী হবে অর্থাৎ ঋণাত্মক ঢালবিশিষ্ট হবে। (An isoquant will slope downward from left to right or will be negatively sloped.)

প্রমাণ : সমোৎপাদন রেখা যদি ৪.৫ নং চিত্রের I_1-এর মতো অনুভূমিক হয়, তাহলে A ওA_1 বিন্দুতে উৎপাদনের পরিমাণ একই হতে হয়। কিন্তু তা সম্ভব নয়। A_1 বিন্দুতে A বিন্দুর তুলনায় শ্রম নিয়োগের পরিমাণ বেশি কিন্তু মূলধনের পরিমাণ একই। সুতরাং, A_1 বিন্দুতে উৎপাদনের পরিমাণ A বিন্দুর তুলনায় বেশি। তাহলে A ওA_1 বিন্দু যোগ করে কোনো সমোৎপাদন রেখা হবে না অর্থাৎ সমোৎপাদন রেখা অনুভূমিক সরলরেখা হবে না। একই যুক্তিতে A_2 বিন্দুতে উৎপাদন A বিন্দুর তুলনায় বেশি। তেমনি, A_3 বিন্দুতে উৎপাদন A বিন্দুর তুলনায় বেশি। সুতরাং সমোৎপাদন রেখা অনুভূমিক, উল্লম্ব বা ঊর্ধ্বমুখী হবে না। অতএব সমোৎপাদন রেখা ৪.৬ নং চিত্রের ন্যায় নিম্নমুখী হবে। ফার্ম যদি A বিন্দু থেকে B বিন্দুতে যায়, তাহলে মূলধনের পরিমাণ ΔK পরিমাণ কমে। ফলে উৎপাদন কমে (–) $MP_k.\Delta_k$ পরিমাণ। আর শ্রমের পরিমাণ পরিমাণ ΔL বাড়ে। ফলে উৎপাদন বাড়ে $MP_L.\Delta L$ পরিমাণ। কিন্তু A ও B বিন্দুতে উৎপাদনের স্তর একই। অতএব, $-MP_K.\Delta K = MP_L\Delta L$

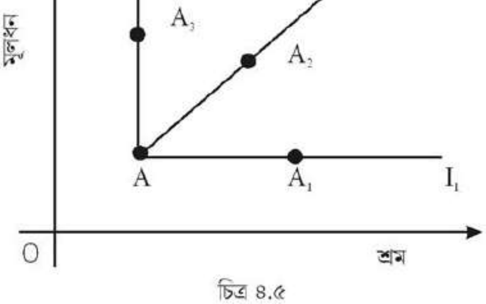

চিত্র ৪.৫

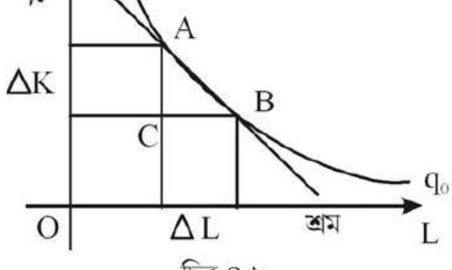

চিত্র ৪.৬

বা, $\frac{\Delta K}{\Delta L} = -\frac{MP_L}{MP_K}$ । আমাদের অনুমান অনুযায়ী, $MP_L > 0$, $MP_k > 0$

$\therefore \frac{\Delta K}{\Delta L} < 0$ বা, সমোৎপাদন রেখার ঢাল < 0 (প্রমাণিত)। এখানে বলা দরকার যে, $-\frac{\Delta K}{\Delta L} =$ প্রান্তিক পরিবর্ততার কারিগরি হার $= \frac{MP_L}{MP_k} =$ সমোৎপাদন রেখার ঢালের পরম মান।

বৈশিষ্ট্য (ii) : সমোৎপাদন রেখা মূলবিন্দুর দিকে উত্তল হবে। (An isoquant will be convex to the origin)

প্রমাণ : সমোৎপাদন রেখা যদি ৪.৭ নং চিত্রের ন্যায় মূলবিন্দুর দিকে অবতল (q_0) হয় তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, ফার্মটি অতিরিক্ত এক এক ইউনিট শ্রম (L) নিয়োগ করলে তার বিনিময়ে বেশি বেশি মূলধন (K) ছেড়ে দিতে পারছে অর্থাৎ ক্রমবর্ধমান প্রান্তিক পরিবর্ততা কাজ করছে। এটি আমাদের অনুমানের বিরোধী।

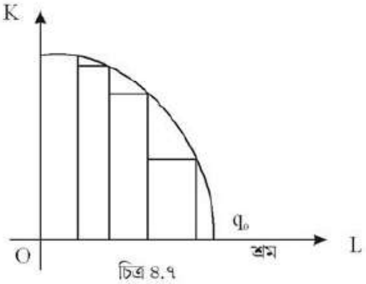

চিত্র ৪.৭

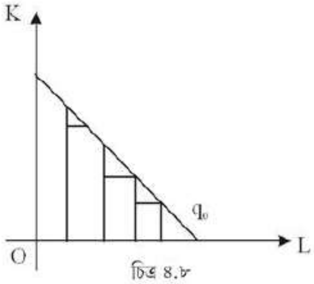

চিত্র ৪.৮

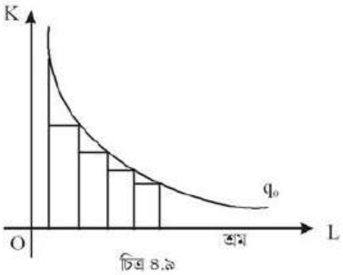

চিত্র ৪.৯

তেমনি, সমোৎপাদন রেখা যদি ৪.৮ নং চিত্রের ন্যায় নিম্নমুখী সরলরেখা হয়, তাহলে প্রান্তিক পরিবর্ততার হার স্থির থাকছে। অর্থাৎ অতিরিক্ত এক এক ইউনিট L নিয়োগ করলে, উৎপাদন অপরিবর্তিত রাখতে, ফার্ম সর্বদাই একটি স্থির বা নির্দিষ্ট পরিমাণ K ছাড়তে পারছে। এক্ষেত্রে পরিবর্ততার হার স্থির থাকছে। এটিও আমাদের অনুমানের বিরোধী।

যদি সমোৎপাদন রেখা ৪.৯ নং-এর ন্যায় মূলবিন্দুর দিকে উত্তল হয়, তাহলে দুটি উপাদানের মধ্যে প্রান্তিক পরিবর্ততার হার হ্রাসমান হয়। সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, ফার্মটি অতিরিক্ত এক এক ইউনিট শ্রম নিয়োগ বাড়ালে, উৎপাদন অপরিবর্তিত রাখতে, মূলধন কম কম পরিমাণে ছাড়তে পারছে। সুতরাং আমাদেব ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক পরিবর্ততার অনুমান অনুযায়ী সমোৎপাদন রেখা মূলবিন্দুর দিকে উত্তল হবে। তবে দুটি উপাদান একে অপরের সম্পূর্ণ পরিবর্ত হলে সমোৎপাদন রেখা নিম্নমুখী সরলরেখা হবে। আর দুটি উপাদান একে অপরের সম্পূর্ণ পরিপূরক হলে সমোৎপাদন রেখা L আকৃতিবিশিষ্ট বা সমকোণবিশিষ্ট হবে।

বৈশিষ্ট্য (iii) : দুটি সমোৎপাদন রেখা একে অপরকে ছেদ বা স্পর্শ করবে না। (Two isoquants will not intersect or touch each other)

প্রমাণ : যুক্তির খাতিরে ধরা যাক্, দুটি সমোৎপাদন রেখা q_0 ও q_1 পরস্পরকে B বিন্দুতে ছেদ (চিত্র ৪.১০) বা স্পর্শ (চিত্র ৪.১১) করেছে। এখন, q_0 রেখার উপর একটি বিন্দু নিলাম A এবং q_1 রেখার উপর একটি বিন্দু নিলাম C, যাতে C বিন্দু A বিন্দুর উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত হয়। যেহেতু A ও B বিন্দু একই সমোৎপাদন রেখা q_0-র উপর অবস্থিত, সুতরাং, A বিন্দুতে উৎপাদন = B বিন্দুতে উৎপাদন। আবার, B ও C বিন্দু একই সমোৎপাদন রেখা q_1-এর উপর অবস্থিত। তাহলে, A বিন্দুতে উৎপাদন = C বিন্দুতে উৎপাদন। তুলনা করে পাই, A বিন্দুতে উৎপাদন = C বিন্দুতে উৎপাদন। তুলনা করে পাই, A বিন্দুতে উৎপাদন = C বিন্দুতে উৎপাদন। কিন্তু C বিন্দুতে K ও L উভয় উপাদানের নিয়োগ বেশি। সুতরাং, C বিন্দুতে উৎপাদন > A বিন্দুতে উৎপাদন। তাহলে একটা পরস্পর বিরোধিতা এসে যাচ্ছে (অর্থাৎ C = A এবং C > A)। এই স্ববিরোধ এড়াতে গেলে দুটি সমোৎপাদন রেখাকে ছেদ বা স্পর্শ করানো চলবে না।

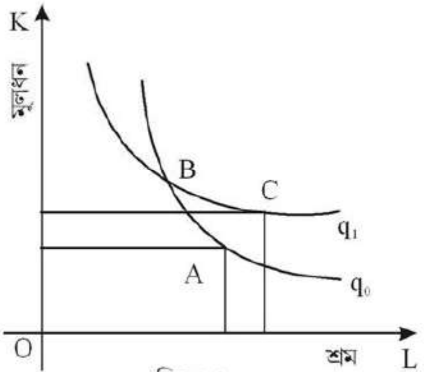

চিত্র ৪.১০

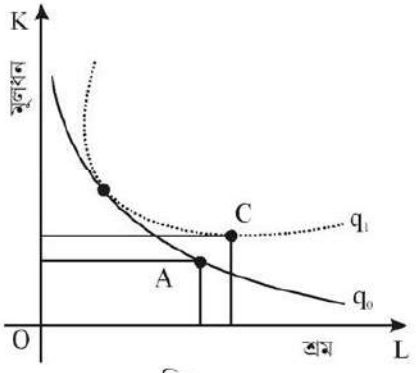

চিত্র ৪.১১

বৈশিষ্ট্য (iv) : উচ্চতর সমোৎপাদন রেখা উচ্চতর উৎপাদনের স্তর নির্দেশ করে। (Higher isoquant represents a higher level of output)

প্রমাণ : ৪.১২নং চিত্রে আমরা দুটি সমোৎপাদন রেখা টেনেছি। আমাদের প্রমাণ করতে হবে যে, উচ্চতর সমোৎপাদন রেখা q_1, নিম্নতর সমোৎপাদন রেখা q_0 অপেক্ষা বেশি উৎপাদনের স্তর নির্দেশ করে। চিত্রে A বিন্দুর তুলনায় B বিন্দুতে মূলধনের পরিমাণ বেশি এবং শ্রমের পরিমাণ একই। সুতরাং B বিন্দুতে [illegible] > A বিন্দুতে উৎপাদন। আবার, A বিন্দুতে উৎপাদন = D বিন্দুতে উৎপাদন। ∴ B বিন্দুতে উৎপাদন > D বিন্দুতে উৎপাদন। তেমনি, B বিন্দুতে উৎপাদন = C বিন্দুতে উৎপাদন। ∴ C বিন্দুতে উৎপাদন > A (অথবা D) বিন্দুতে উৎপাদন। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে যে, উচ্চতর সমোৎপাদন রেখার উপর যে-কোনো বিন্দু নিম্নতর সমোৎপাদন রেখার উপর যে-কোনো বিন্দু অপেক্ষা বেশি উৎপাদনের স্তর নির্দেশ করে।

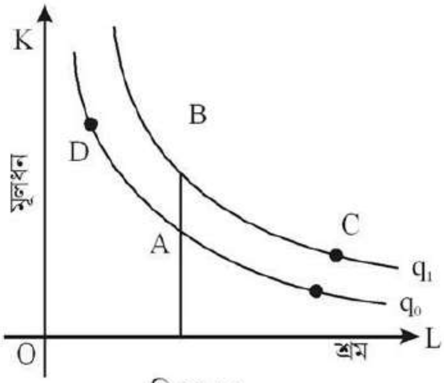

চিত্র ৪.১২

৪.৭.২. সম্পূর্ণ পরিবর্ত ও সম্পূর্ণ পরিপূরক উপাদানের ক্ষেত্রে সমোৎপাদন রেখার আকৃতি

যদি দুটি উপাদান একে অপরের সম্পূর্ণ পরিবর্ত হয়, তাহলে তাদের একটাই উপাদান বলে ভাবা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে উপাদান দুটির মধ্যে প্রান্তিক পরিবর্ততার হার স্থির থাকবে। প্রান্তিক পরিবর্ততার হার হল সমোৎপাদন রেখার ঢালের পরম মান। সুতরাং এক্ষেত্রে সমোৎপাদন রেখার ঢাল অপরিবর্তিত থাকবে। এর অর্থ হল, সমোৎপাদন রেখাগুলি নিম্নমুখী হবে এবং তারা পরস্পর সমান্তরাল হবে। ৪.১৩ নং চিত্রে আমরা এরূপ সমোৎপাদন রেখা টেনেছি। এক্ষেত্রে উপাদান দুটির পরিবর্ততার স্থিতিস্থাপকতা (elasticity of factor substitution) অসীম (∝) হবে।

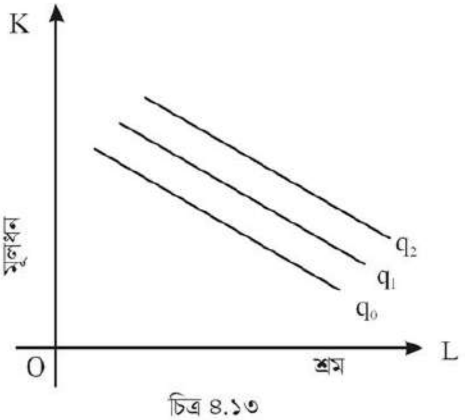

চিত্র ৪.১৩

যদি দুটি উপাদান একে অপরের সম্পূর্ণ পরিপূরক হয়, তাহলে উপাদান দুটিকে একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে ব্যবহার করতে হয়। কেবলমাত্র একটা উপাদানের নিয়োগ বাড়ালে উৎপাদন বাড়বে না। সুতরাং সমোৎপাদন রেখার একটি অনুভূমিক বাহু (arm) এবং একটি উল্লম্ব বাহু থাকবে। সেক্ষেত্রে সমোৎপাদন রেখাটি ৪.১৪ নং চিত্রের ন্যায় ইংরেজি L অক্ষরের মতো বা সমকোণবিশিষ্ট হবে। প্রতিটি সমোৎপাদন রেখার কৌণিক বিন্দু একটি মূলবিন্দুগামী সরলরেখার (OR) উপর থাকবে। এই সরলরেখার ঢাল থেকে জানা যায়,

উপাদান দুটিকে কী অনুপাতে ব্যবহার বা নিয়োগ করা হবে। এখানে উপাদান দুটির মধ্যে পরিবর্ততার (Substitutability) কোনো সুযোগ নেই। অন্যভাবে বলতে গেলে, উপাদান দুটির মধ্যে পরিবর্ততার স্থিতিস্থাপকতার (elasticity of factor substitution) মান শূন্য হবে।

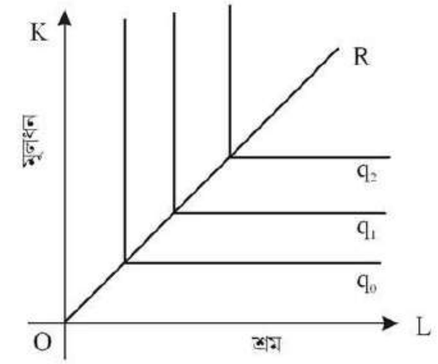

চিত্র ৪.১৪

৪.৮ সমব্যয় রেখা এবং এর স্থানান্তর

মনে করি, কোনো ফার্ম দুটি উপকরণ বা উপাদান নিয়োগ করে উৎপাদন করছে। উপাদান দুটি হল শ্রম (L) ও মূলধন (K)। এই দুটি উপাদান কেনার জন্য ফার্মটি C_0 পরিমাণ অর্থ ব্যয় করছে। মনে করি, প্রতি ইউনিট শ্রমের দাম p_L টাকা এবং প্রতি ইউনিট মূলধনের দাম p_k টাকা। তাহলে আমরা লিখতে পারি, $P_L L + p_k.K = C_0$ বা, $p_k.K = -p_L.L + C_0$ বা, $K = -\frac{p_L}{p_k}.L + \frac{C_0}{p_k}$ । এটি একটি নিম্নমুখী সরলরেখার সমীকরণ যার ঢাল হল $\left(-{}^{p_L}/_{p_k}\right)$ এবং উল্লম্ব ছেদিতাংশ হল ${}^{C_0}/_{p_k}$ । এই রেখাকে বলা হয় সমব্যয় রেখা। যে উপাদান-সমন্বয় কিনতে ফার্মের একই ব্যয় পড়ে, সেই উপাদান-সমন্বয়গুলো যোগ করলে যে রেখা পাওয়া যায় তাকে বলে সমব্যয় রেখা। ৪.১৫ নং চিত্রে আমরা একটা সমব্যয় রেখা টেনেছি। এর উল্লম্ব ছেদিতাংশ হল ${}^{C_0}/_{p_k}$ এবং অনুভূমিক ছেদিতাংশ হল ${}^{C_0}/_{p_L}$ । আর ঢাল হল $-{}^{p_L}/_{p_K}$ । মনে করি, সমব্যয় রেখাটি হল AB। এই সমব্যয় রেখার উপর প্রতিটি বিন্দুতে ব্যয়ের পরিমাণ সমান $(= C_0)$।

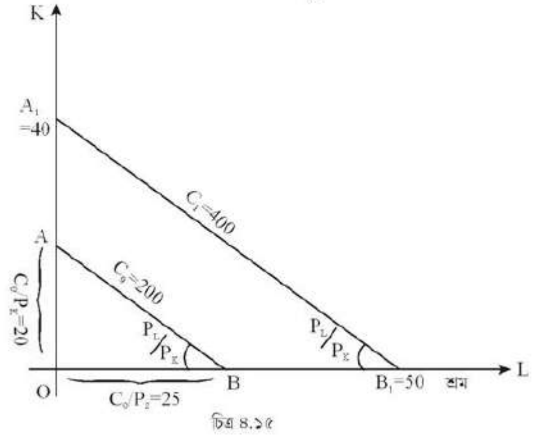

চিত্র ৪.১৫

একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বোঝানো যেতে পারে। মনে করি, ফার্মের ব্যয় 200 টাকা এবং p_k = 10 ও p_L = 8। তাহলে 8L + 10K = 200 হল একটি সমব্যয় রেখার সমীকরণ। ফার্মটি সমস্ত টাকা মূলধন কিনতে ব্যয় করলে $^{200}/_{10}$ বা 20 ইউনিট মূলধন কিনতে পারবে। মনে করি, OA = 20। তেমনি ফার্মটি যদি ২০০ টাকা কেবলমাত্র L কিনতে ব্যয় করে তাহলে সর্বাধিক $^{200}/_{8}$ বা 25 ইউনিট L কিনতে পারবে। মনে করি, OB = 25 ইউনিট। A ও B বিন্দু যোগ করে আমরা পাই C_0 = 200 টাকার সমব্যয় রেখা (AB)।

এখন, ফার্মটি যদি ব্যয় বাড়ায়, তাহলে সমব্যয় রেখার কী পরিবর্তন হবে, তা দেখা যাক। মনে করি, ফার্ম তার ব্যয় 200 টাকা থেকে বাড়িয়ে 400 টাকা করল। মূলধন ও শ্রমের দাম একই আছে। তাহলে নতুন সমব্যয় রেখার সমীকরণ হল :

$$8L + 10K = 400$$

এখন, শুধু K কিনলে ফার্মটি $^{400}/_{10}$ বা 40 ইউনিট K কিনতে পারবে। তেমনি, শুধু L কিনলে $^{400}/_{8}$ বা 50 ইউনিট L কিনতে পারবে। মনে করি OA_1 = 40 এবং OB_1 = 50। তাহলে নতুন সমব্যয় রেখার অবস্থান হবে A_1B_1। এখানে উপাদান দুটির দাম একই আছে। তাই সমব্যয় রেখার ঢালের কোনো পরিবর্তন হবে না। সুতরাং ফার্মের ব্যয় বাড়লে সমব্যয় রেখা উপরের দিকে সমান্তরালভাবে সরে যাবে। তেমনি, ব্যয় কমলে সমব্যয় রেখা সমান্তরালভাবে নীচের দিকে নেমে আসবে।

এখন, একটিমাত্র উপাদানের দামের পরিবর্তন হলে সমব্যয় রেখার কেমন পরিবর্তন হবে দেখা যাক। মনে করি, শ্রমের দাম (p_L) কমল। তাহলে $^{C_0}/_{p_L}$ বাড়বে। ফলে সমব্যয় রেখায় অনুভূমিক ছেদিতাংশ বাড়বে। কিন্তু উল্লম্ব ছেদিতাংশের $\left(={}^{C_0}/_{p_L}\right)$ কোনো পরিবর্তন হবে না। ফলে A-কে কেন্দ্র করে সমব্যয় রেখার ডানদিকে ঘূর্ণন (rotation) হবে। ৪.১৬ নং চিত্রে মনে করি সমব্যয় রেখার নতুন অবস্থান হবে AB_1। তেমনি, শ্রমের দাম বাড়লে সমব্যয় রেখার অনুভূমিক ছেদিতাংশ কমবে। তখন এর বাঁদিকে ঘূর্ণন হবে। মনে করি তখন এর নতুন অবস্থান হবে AB_2। তেমনি যদি মূলধনের দাম (= p_K) কমে তাহলে সমব্যয় রেখার উল্লম্ব ছেদাংশ $\left(={}^{C_0}/_{p_K}\right)$ বাড়বে। তখন এর অবস্থান হবে, মনে করি, A_1B (চিত্র ৪.১৭)। তেমনি, p_K বাড়লে $^{C_0}/_{p_K}$ কমবে। তখন সমব্যয় রেখার অবস্থান হবে, মনে করি, A_2B। এক্ষেত্রে B বিন্দুকে কেন্দ্র করে সমব্যয় রেখার ডানদিকে বা বাঁদিকে আবর্তন বা ঘূর্ণন (rotation) হবে।

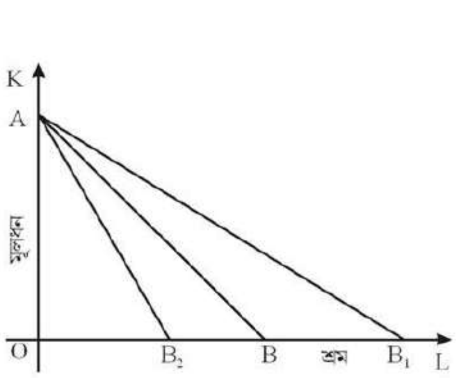

চিত্র ৪.১৬

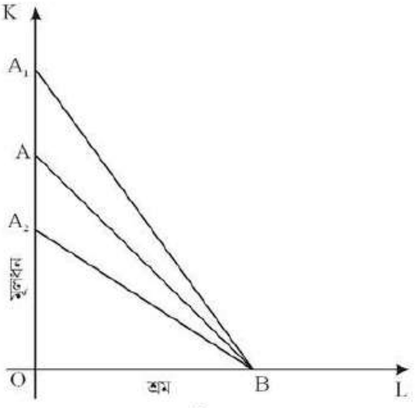

চিত্র ৪.১৭

৪.৯ উৎপাদকের ভারসাম্য বা সর্বোত্তম উপাদান-সম্মিলন নির্বাচন

নয়া-প্রাচীন বা নব্য-ধ্রুপদি (neo-classical) অর্থনীতিবিদগণের মতে, ফার্মের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য হল মুনাফা সর্বাধিক করা। সুতরাং ফার্ম সেই বিন্দুতে ভারসাম্যে থাকবে বা সেই উপাদান সম্মিলন নির্বাচন করবে যেখানে তার মুনাফা সর্বাধিক। সেই উপাদান সম্মিলনকে বলা হয় সর্বোত্তম উপাদান সম্মিলন (best or optimum input combination)। এখন, ফার্মের মুনাফা প্রধানত দুই ভাগে সর্বাধিক হতে পারে :

(i) নির্দিষ্ট পরিমাণ ব্যয়ের সাহায্যে উৎপাদন সর্বাধিক হলে, অথবা,

(ii) নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করতে ব্যয় সর্বনিম্ন হলে।

যেহেতু দুটির যে-কোনো একটিতে ফার্মের মুনাফা সর্বাধিক হবে, সেজন্য উভয় ক্ষেত্রেই ফার্মের ভারসাম্য শর্ত একই হবে। আমরা এই দুটি ক্ষেত্রে এখন ফার্মের ভারসাম্য আলোচনা করব।

৪.৯.১. ব্যয় স্থির রেখে উৎপাদন সর্বাধিককরণ

মনে করি, কোনো ফার্ম দুটি উপাদান বা উপকরণ নিয়োগ করে একটি দ্রব্য উৎপাদন করছে। উপাদান দুটি হল শ্রম ও মূলধন। মনে করি, তাদের পরিমাণ যথাক্রমে L ও K। এই দুটি উপাদান কিনতে ফার্ম C_0 পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে চায়। মনে করি, শ্রম ও মূলধনের ইউনিট প্রতি দাম যথাক্রমে p_L ও p_K। তাহলে আমরা পাই $p_L.L + p_K.K = C_0$, বা $p_KK = -p_L.L + C_0$, বা, $K = -\frac{p_L}{p_K}\cdot L + \frac{C_0}{p_K}$। এটি একটি নিম্নমুখী সরলরেখার সমীকরণ যার ঢাল $= -p_L/p_K$ এবং উল্লম্ব ছেদিতাংশ $= C_0/p_K$। এই রেখাকে বলা হয় সমব্যয় রেখা (isocost line)। মনে করি, AB হল সেই সমব্যয় রেখা। (চিত্র ৪.১৮)। এই রেখার উপর প্রতিটি বিন্দুতে ফার্মের ব্যয় একই। কিন্তু এর বিভিন্ন বিন্দুতে ফার্মের উৎপাদনের পরিমাণ বিভিন্ন। ফার্ম

এমন বিন্দুতে উপাদান নিয়োগের পরিমাণ ঠিক করবে যেখানে ফার্মের উৎপাদন সর্বাধিক। অর্থাৎ ফার্মটি AB সমব্যয় রেখার উপর অবস্থান করে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ সমোৎপাদন রেখা পৌঁছাতে চাইবে। সেই বিন্দুটিই হবে ফার্মের ভারসাম্য বিন্দু বা সর্বোত্তম উপাদান-সম্মিলন।

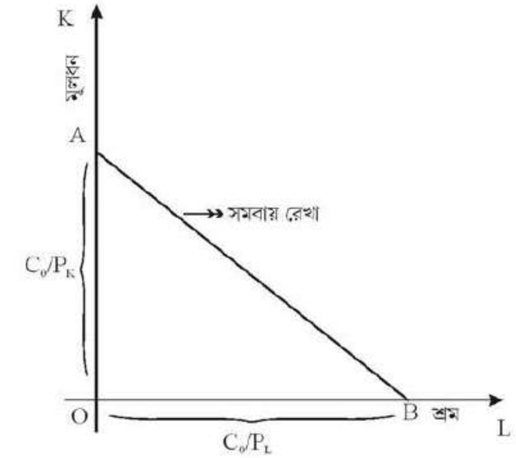

চিত্র ৪.১৮

এই ভারসাম্য বিন্দু নির্ণয় করার জন্য আমরা অনুমান করছি যে, ফার্মের উৎপাদন অপেক্ষক বা সমোৎপাদন মানচিত্র আমাদের জানা আছে। এই সমোৎপাদন মানচিত্রকে আমরা ৪.১৮ নং চিত্রের উপর স্থাপন করলাম। এভাবে আমরা ৪.১৯ নং চিত্র পাই। এই চিত্রে দেখা যাচ্ছে যে, C, D, E, F, G প্রভৃতি বিন্দুতে ফার্মের ব্যয় একই কিন্তু উৎপাদনের পরিমাণ বিভিন্ন। যেমন, C বিন্দুর তুলনায় D বিন্দুতে উৎপাদনের স্তর বেশি। E বিন্দুতে উৎপাদনের স্তর আরো বেশি। প্রকৃতপক্ষে, E বিন্দুতে উৎপাদনের পরিমাণ সম্ভাব্য সর্বাধিক। G বা F বিন্দুতে উৎপাদন E বিন্দুর তুলনায় কম। H বিন্দুতে উৎপাদন E বিন্দুর তুলনায় বেশি, কিন্তু H বিন্দু ফার্মের নাগালের বাইরে। সুতরাং E বিন্দু হল এক্ষেত্রে ফার্মের ভারসাম্য বিন্দু। ফার্মটি OL_0 পরিমাণ শ্রম ও OK_0 পরিমাণ মূলধন নিয়োগ করবে। এভাবে ফার্মটি নির্দিষ্ট পরিমাণ উপকরণ বা ব্যয়ের সাহায্যে উৎপাদন সর্বাধিক করবে।

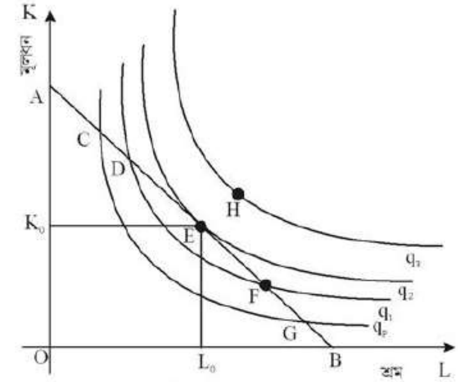

চিত্র ৪.১৯

দেখা যাচ্ছে, ফার্মটি সেই বিন্দুতে উৎপাদন সর্বাধিক করবে বা ভারসাম্যে থাকবে যেখানে সমোৎপাদন রেখার ঢাল = সমব্যয় রেখার ঢাল, বা, $\frac{MP_L}{MP_K}=\frac{p_L}{p_K}$ বা, MRTS (প্রান্তিক পরিবর্ততার কারিগরি হার) $=\frac{p_L}{p_K}$। এটি ফার্মের ভারসাম্যের প্রয়োজনীয় বা প্রথম ক্রমের শর্ত (necessary or first order condition), কিন্তু পর্যাপ্ত শর্ত নয়। যেমন, ৪.২০ নং চিত্রে সমোৎপাদন রেখা q_2 এবং সমব্যয় রেখা AB পরস্পরকে E বিন্দুতে স্পর্শ করেছে। সুতরাং, E বিন্দুতে তাদের ঢাল সমান বা এখানে ভারসাম্যর প্রথম ক্রমের শর্ত পূরণ হয়েছে। কিন্তু E বিন্দু ভারসাম্য বিন্দু নয়। ফার্মটি যদি E বিন্দু থেকে AB বরাবর ডানকিে বা বাঁদিকে সরে যায়, তাহলে ফার্মের ব্যয় বাড়ছে না, অথচ উৎপাদন বাড়ছে। সুতরাং ফার্মের ভারসাম্যর জন্য একটি পর্যাপ্ত বা দ্বিতীয় ক্রমের শর্ত (sufficient or second order condition) পূরণ হওয়া আবশ্যক। সেই দ্বিতীয় ক্রমের বা পর্যাপ্ত শর্তটি হল : সমোৎপাদন রেখাকে ভারসাম্য বিন্দুতে মূলবিন্দুর দিকে উত্তল হতে হবে।

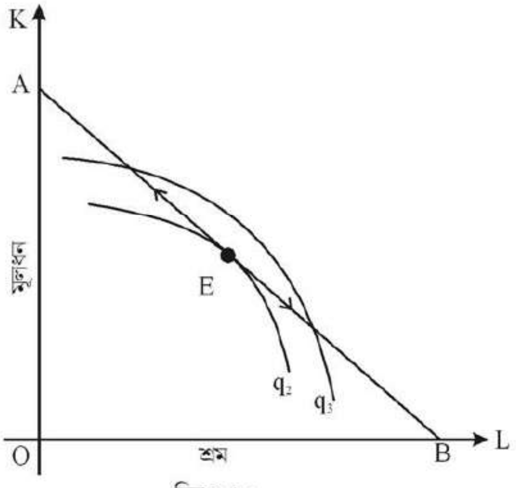

চিত্র ৪.২০

৪.৯.২. উৎপাদন স্থির রেখে ব্যয় সর্বনিম্নকরণ

মনে করি, কোনো ফার্ম দুটি উপাদান শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করে একটি দ্রব্য উৎপাদন করছে। মূলধনের পরিমাণ K, শ্রমের পরিমাণ L এবং উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ q দ্বারা চিহ্নিত করলে আমাদের উৎপাদন অপেক্ষকটি হল : $q = f(K, L)$। মনে করি, ফার্মটি q_0 পরিমাণ দ্রব্যটি উৎপাদন করতে চায়। K ও L-এর যে সমস্ত সম্মিলনের বা সমন্বয়ের সাহায্যে এই q_0 পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করা যায় সেই বিন্দুগুলির সঞ্চারপথ থেকে আমরা একটা সমোৎপাদন রেখা পেতে পারি। আমাদের ৪.২১ চিত্রে $f(K, L) = q_0$ হল সেই সমোৎপাদন রেখা। সুতরাং উৎপাদন অপরিবর্তিত রাখতে হলে ফার্মকে এই q_0 সমোৎপাদন রেখার উপর থাকতে হবে। এই রেখার উপর ফার্ম সেই বিন্দু নির্বাচন করবে যেখানে তার ব্যয় সর্বনিম্ন।

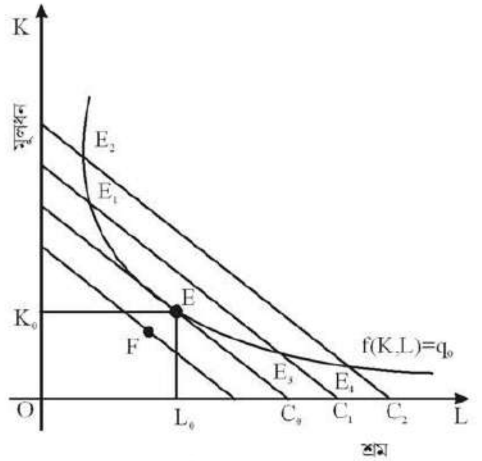

চিত্র ৪.২১

সর্বনিম্ন ব্যয়ের বিন্দু নির্ধারণ করার জন্য আমাদের ফার্মের সমব্যয় রেখাগুলির অবস্থান জানতে হবে। আর তার জন্য আমাদের উপাদান দুটির দাম জানতে হবে। মনে করি, L-এর ইউনিট প্রতি দাম হল p_L এবং K-এর ইউনিট প্রতি দাম হল p_k। ফার্মের উৎপাদন ব্যয়কে যদি C দ্বারা চিহ্নিত করি, তাহলে আমরা লিখতে পারি : $P_L L + p_k K = C$ বা, $p_k K = -p_L L + C$. বা, $K = -\frac{p_L}{p_K}\cdot L + \frac{C}{p_K}$ । এটি একটি নিম্নমুখী সরলরেখার সমীকরণ যার ঢাল হল $\left(-{}^{p_L}/_{p_K}\right)$ এবং উল্লম্ব ছেদিতাংশ হল ${}^{C}/_{p_K}$ । এই রেখাকে বলা হয় সমব্যয় রেখা। কোনো একটি নির্দিষ্ট সমব্যয় রেখার উপরে প্রত্যেক বিন্দুতে ব্যয়ের পরিমাণ সমান। C বা ব্যয় যত বেশি হবে, ${}^{C}/_{p_K}$ -এর মান তত বেশি হবে অর্থাৎ সমব্যয় রেখা সমান্তরালভাবে তত উপরের দিকে উঠে যাবে। সমব্যয় রেখা যত নীচে অবস্থিত, ফার্মের ব্যয় ততই কম হবে। সুতরাং, q_0 পরিমাণ দ্রব্য সর্বনিম্ন ব্যয়ে উৎপাদন করতে ফার্মটি সম্ভাব্য সর্বনিম্ন সমব্যয় রেখার উপর থাকতে চাইবে। কোথায় সেটি সম্ভব হবে তা দেখার জন্য আমরা তিনটি বিভিন্ন ব্যয়ের স্তরে তিনটি সমব্যয় রেখা এঁকেছি। চিত্রে $C_0 < C_1 < C_2$। চিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে যে, E, E_1, E_2, E_3, E_4 প্রভৃতি বিন্দুতে ফার্মের উৎপাদনের পরিমাণ একই, কিন্তু ঐসব বিন্দুতে ফার্মের ব্যয়ের পরিমাণ এক নয়। ফার্মের ব্যয় সর্বনিম্ন হবে E বিন্দুতে। ফার্মটি F বিন্দুতে সরে এলে তার ব্যয় আরো কমে বটে, কিন্তু তখন q_0 পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন হবে না। q_0 পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদনের সর্বনিম্ন ব্যয় হবে E বিন্দুতে। সুতরাং E বিন্দু হল ভারসাম্য বিন্দু বা E হল সর্বোত্তম উপাদান সম্মিলন (optimum combination of inputs)। ঐ E বিন্দুতে ফার্মটি OL_0 পরিমাণ শ্রম ও OK_0 পরিমাণ মূলধন নিয়োগ করবে।

দেখা যাচ্ছে, ফার্মটি সেই বিন্দুতে ভারেসাম্যে থাকছে বা ব্যয় সর্বনিম্ন করছে যেখানে সমোৎপাদন রেখার ঢাল = সমব্যয় রেখার ঢাল, বা, ${}^{MP_L}/_{MP_K} = {}^{p_L}/_{p_K}$,

বা, প্রান্তিক পরিবর্ততার কারিগরি হার (MRTS) = $^{p_L}/_{p_K}$ । এটি ভারসাম্যর বা ব্যয় সর্বনিম্নকরণের প্রয়োজনীয় বা প্রথম ক্রমের **শর্ত** (necessary or first order condition)। এটি কিন্তু ভারসাম্যর পর্যাপ্ত শর্ত নয়। যেমন, ৪.২২ নং চিত্রে সমোৎপাদন রেখা q_0 এবং C_2 সমব্যয় রেখা পরস্পরকে E বিন্দুতে স্পর্শ করেছে। কিন্তু E বিন্দু ফার্মের ভারসাম্য বিন্দু নয়। ফার্মটি যদি E বিন্দু থেকে q_0 রেখা বরাবর বাঁদিকে অথবা ডানদিকে সরে যায়, তাহলে ফার্মের ব্যয় কমে ($C_0 < C_1$) কিন্তু উৎপাদন কমে না। সুতরাং এক্ষেত্রে E বিন্দু ভারসাম্য বিন্দু নয়। তাই ভারসাম্যর জন্য বা ব্যয় সর্বনিম্ন করার জন্য একটি পর্যাপ্ত বা দ্বিতীয় ক্রমের শর্ত (sufficient or second order condition) পূরণ হওয়া আবশ্যক। শর্তটি হল, ভারসাম্য বিন্দুতে সমোৎপাদন রেখাকে মূলবিন্দুর দিকে উত্তল হতে হবে।

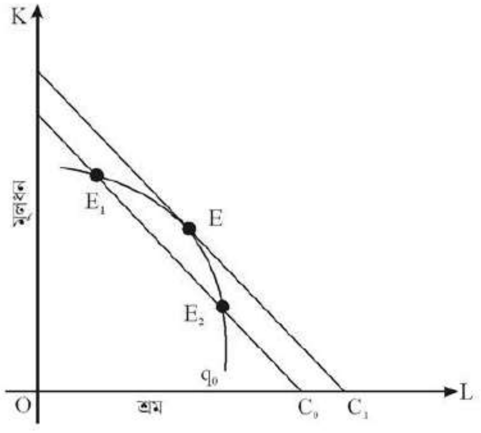

চিত্র ৪.২২

৪.১০ সারাংশ

১. উৎপাদনের সংজ্ঞা ও উৎপাদনের উপাদানসমূহ (Definition of Production and Inputs of Production) : নয়া-ধ্রুপদি সংজ্ঞা অনুসারে, বাজারে বিক্রি বা বিনিময়ের উদ্দেশ্যে উপযোগিতা সৃষ্টি করাকেই উৎপাদন বলে। কোনো দ্রব্য বা সেবাকার্য উৎপাদনের জন্য যে সমস্ত জিনিসের প্রয়োজন হয় তাদের উৎপাদনের উপাদান বা উপকরণ বলে।

২. উৎপাদন অপেক্ষক (Production function) : উপাদান নিয়োগ এবং উৎপাদনের পরিমাণের মধ্যে কারিগরি সম্পর্ককে উৎপাদন অপেক্ষক বলে। বিভিন্ন পরিমাণ উপাদান নিয়োগ করে যে সর্বাধিক পরিমাণ উৎপাদন পাওয়া যেতে পারে, তাই-ই উৎপাদন অপেক্ষক থেকে জানা যায়।

৩. মোট উৎপাদন, গড় উৎপাদন ও প্রান্তিক উৎপাদন (Total Product, Average Product and Marginal Product) : অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকলে কেবলমাত্র একটি পরিবর্তনীয় উপাদানের বিভিন্ন পরিমাণ নিয়োগ থেকে যে বিভিন্ন পরিমাণ উৎপন্ন দ্রব্য পাওয়া যায় তাকেই ঐ পরিবর্তনীয়

উপাদানের মোট উৎপাদন বলে। মোট উৎপাদনের পরিমাণকে পরিবর্তনীয় উপাদানের পরিমাণ দিয়ে ভাগ করলে ঐ উপাদানের গড় উৎপাদন জানা যায়। অর্থাৎ কোনো উপাদানের গড় উৎপাদন হল ঐ উপাদানের ইউনিট প্রতি মোট উৎপাদন। আর, অন্যান্য উপাদানের পরিমাণ স্থির রেখে কোনো উপাদানকে এক ইউনিট পরিবর্তন করলে মোট উৎপাদনের যে পরিবর্তন ঘটে তাকে ঐ উপাদানের ঐ ইউনিটের প্রান্তিক উৎপাদন বলে।

৪. **ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়ম (Law of Diminishing Returns) :** অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত অবস্থায় কেবলমাত্র একটি উপাদানের নিয়োগ ক্রমাগত বাড়ালে একটা সময়ের পর ঐ পরিবর্তনীয় উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমাগত কমতে থাকে। একে ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়ম বলে।

৫. **প্রতিদানের নিয়ম (Law of Returns) :** উপাদান নিয়োগের পরিমাণ পরিবর্তিত হলে মোট উৎপাদন বা প্রতিদান কীভাবে পরিবর্তিত হবে তা যে নিয়ম থেকে জানা যায় তাকে প্রতিদানের নিয়ম বলে। এই নিয়ম দু'রকমের : স্বল্পকালে প্রযোজ্য পরিবর্তনীয় অনুপাতের নিয়ম এবং দীর্ঘকালে প্রযোজ্য মাত্রাবৃদ্ধির প্রতিদানের নিয়ম।

৬. **পরিবর্তনীয় অনুপাতের নিয়ম (Law of Variable Proportions) :** অন্যান্য সকল উপাদানের পরিমাণ অপরিবর্তিত রেখে কেবলমাত্র একটি উপাদানের পরিমাণ যদি ক্রমাগত বাড়ানো হয় তাহলে মোট উৎপাদন একটা স্তরের পর ক্রমাগত কম কম হারে বাড়বে। একেই পরিবর্তনীয় অনুপাতের নিয়ম বলে।

৭. **গড় উৎপাদন (AP) ও প্রান্তিক উৎপাদনের (MP) মধ্যে সম্পর্ক (Relation between Average Product (AP) and Marginal Product (MP) :** যখন AP বাড়ে, তখন $MP > AP$ হয়। যখন AP কমে, তখন $MP < AP$ হয়। যখন AP সর্বাধিক বা স্থির থাকে, তখন $AP = MP$ হয়।

৮. **সমোৎপাদন রেখা ও সমোৎপাদন মানচিত্র (Isoquant Curve and Isoquant Map) :** সমোৎপাদন রেখা হল সেই সমস্ত উপাদান সমন্বয়ের সঞ্চারপথ যেগুলি থেকে একই পরিমাণ উৎপাদন পাওয়া যায়। একাধিক সমোৎপাদন রেখা নিয়ে গঠিত হয় সমোৎপাদন মানচিত্র।

৯. **সমোৎপাদন রেখার বৈশিষ্ট্যসমূহ (Properties of Indifference Curve) :** সমোৎপাদন রেখার বৈশিষ্ট্য চারটি : (i) সমোৎপাদন রেখা বাঁদিক থেকে ডানদিকে নিম্নমুখী বা ঋণাত্মক ঢালবিশিষ্ট হবে। (ii) সমোৎপাদন রেখা মূলবিন্দুর দিকে উত্তল হবে। (iii) দুটি সমোৎপাদন রেখা একে অপরকে ছেদ বা স্পর্শ করবে না। (iv) উচ্চতর সমোৎপাদন রেখা উচ্চতর উৎপাদনের স্তর নির্দেশ করে।

১০. **সমব্যয় রেখা (Isocost Curve) :** সে সমস্ত উপাদান সমন্বয় কিনতে ফার্মের একই পরিমাণ ব্যয় পড়ে সেই সমস্ত উপাদান সমন্বয়ের সঞ্চারপথকে সমব্যয় রেখা বলে। একটি নির্দিষ্ট সমব্যয় রেখার উপর প্রত্যেক বিন্দুতে ফার্মের ব্যয়ের পরিমাণ সমান। উচ্চতর সমব্যয় রেখা উচ্চতর ব্যয়ের স্তর নির্দেশ করে।

১১. সর্বোত্তম উপাদান সম্মিলন নির্বাচন (Choice of Best or Optimum Input Combination) : যে উপাদান সম্মিলনে মুনাফা সর্বাধিক, সেই সম্মিলন বা সমন্বয়ই হল সর্বোত্তম উপাদান সম্মিলন। এখন, সর্বাধিক মুনাফা দু'ভাবে পাওয়া যেতে পারে : (i) ব্যয় একই রেখে যদি উৎপাদন সর্বাধিক করা যায়, অথবা, (ii) উৎপাদন একই রেখে যদি ব্যয় সর্বনিম্ন করা যায়। দুটি ক্ষেত্রেই ফার্মের ভারসাম্য শর্ত একই। (i) প্রথম ক্রমের বা প্রয়োজনীয় শর্ত : সমোৎপাদন রেখার ঢাল = সমব্যয় রেখার ঢাল। (ii) দ্বিতীয় ক্রমের বা পর্যাপ্ত শর্ত: ভারসাম্য বিন্দুতে সমোৎপাদন রেখাকে মূল বিন্দুর দিকে উত্তল হতে হবে।

৪.১১ অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্নাবলি (প্রতিটি ২ নম্বরের) (Short Answer Type Questions : Each of 2 Marks)

(১) উৎপাদন কাকে বলে?

(২) উৎপাদনের উপাদান কয়টি ও কী কী?

(৩) গড় ও প্রান্তিক উৎপাদনের সংজ্ঞা দিন।

(৪) ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়ম কাকে বলে?

(৫) পরিবর্তনীয় অনুপাতের নিয়ম কাকে বলে?

(৬) সমোৎপাদন রেখা কাকে বলে?

(৭) সমোৎপাদন রেখার একটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।

(৮) সমব্যয় রেখা কাকে বলে?

(৯) ফার্মের ব্যয়ের বৃদ্ধি ঘটলে সমব্যয় রেখার কীরূপ পরিবর্তন হবে?

(১০) কার্যকলাপের স্তর বলতে কী বোঝেন?

(১১) মোট উৎপাদন সর্বাধিক হলে প্রান্তিক উৎপাদনের মান কত হবে?

(১২) সমোৎপাদন রেখার ঢালের মান কত?

(১৩) সমব্যয় রেখার সমীকরণটি লিখুন।

(১৪) সমব্যয় রেখার ঢালের মান কত?

(১৫) ব্যয় একই রেখে উৎপাদন সর্বাধিক করার প্রথম ক্রমের শর্তটি কী?

(১৬) উৎপাদন একই রেখে ব্যয় সর্বনিম্ন করার প্রয়োজনীয় শর্তটি বিবৃত করুন।

(১৭) ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক পরিবর্তিতার কারিগরি নিয়মটি বিবৃত করুন।

(১৮) দুটি পরিবর্তনীয় উপাদানের ক্ষেত্রে ব্যয় সর্বনিম্ন করার দ্বিতীয় ক্রমের শর্তটি কী?

(১৯) দুটি উপাদানই পরিবর্তনীয় হলে উৎপাদন সর্বাধিক করার পর্যাপ্ত শর্তটি কী?

(২০) AP ও MP-র মধ্যে সম্পর্ক বিবৃত করুন।

মাঝারি দৈর্ঘ্যের উত্তরের প্রশ্নাবলি (প্রতিটি ৫ নম্বরের) (Medium Answer Type Questions : Each of 5 Marks)

(১) গড় ও প্রান্তিক উৎপাদনের মধ্যে সম্পর্ক বিবৃত করুন।

(২) পরিবর্তনীয় অনুপাতের নিয়মের ক্ষেত্রে কার্যকলাপের স্তর কোন্‌টি এবং কেন?

(৩) সমোৎপাদন রেখার সংজ্ঞা দিন। এর বৈশিষ্ট্যগুলি বিবৃত করুন।

(৪) দেখান যে সমোৎপাদন রেখা নিম্নমুখী বা ঋণাত্মক ঢালবিশিষ্ট হবে।

(৫) প্রমাণ করুন যে, সমোৎপাদন রেখা মূল বিন্দুর দিকে উত্তল হবে।

(৬) দেখান যে দুটি সমোৎপাদন রেখা পরস্পরকে ছেদ বা স্পর্শ করতে পারে না।

(৭) প্রমাণ করুন যে, উচ্চতর সমোৎপাদন রেখা উচ্চতর উৎপাদনের স্তর নির্দেশ করে।

(৮) সমব্যয় রেখার স্থানান্তর কখন এবং কীভাবে হতে পারে?

(৯) পরিবর্তনীয় অনুপাতের নিয়মের ক্ষেত্রে তিনটি স্তর কী কী?

(১০) একটি উপাদানের দামে পরিবর্তন ঘটলে সমব্যয় রেখার কীরূপ পরিবর্তন হবে?

দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্নাবলি (প্রতিটি ১০ নম্বরের) (Long Answer Type Questions : Each of 10 Marks)

(১) পরিবর্তনীয় অনুপাতের নিয়মটি চিত্র সহকারে ব্যাখ্যা করুন।

(২) সমোৎপাদন রেখার বৈশিষ্ট্যগুলি উপযুক্ত অনুমানের সাহায্যে প্রমাণ করুন।

(৩) ব্যয় একই রেখে কোন উৎপাদক কীভাবে তার উৎপাদনের পরিমাণ সর্বাধিক করবে?

(৪) কোনো উৎপাদন প্রতিষ্ঠান কীভাবে সর্বনিম্ন ব্যয়ের উপাদান সম্মিলন নির্বাচন করবে তা আলোচনা করুন।

(৬) দেখান যে উৎপাদন সর্বাধিক করার জন্য সমোৎপাদন রেখার ঢাল ও সমব্যয় রেখার ঢালের সমতা প্রয়োজনীয় কিন্তু পর্যাপ্ত শর্ত নয়।

৪.১২ নির্বাচিত গ্রন্থাবলি

1. Sarkhel, Jaydeb & Seikh Salim (2016) : An Introduction to Business Economics, Book Syndicate Private Limited.
2. Koutsoyiannis, A. (1979) : Modern Microeconomics, Macmillan
3. Lipsey, R. (1983) : An Introduction to Positive Economics, ELBS
4. সরখেল, জয়দেব ও সেখ সেলিম (২০১৫) : ব্যবসায় অর্থনীতি ও ভারতের আর্থিক ব্যবস্থা, বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড।

একক ৫ ❑ ব্যয় তত্ত্ব

গঠন

৫.১ উদ্দেশ্য

৫.২ প্রস্তাবনা

৫.৩ স্বল্পকাল ও দীর্ঘকাল

৫.৪ স্বল্পকালীন ব্যয়

৫.৪.১ মোট স্থির ব্যয়, মোট পরিবর্তনীয় ব্যয় ও মোট ব্যয়

৫.৪.২ গড় স্থির ব্যয়, গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় ও গড় ব্যয়

৫.৪.৩ স্বল্পকালীন মোট ব্যয় রেখা থেকে গড় ব্যয় রেখা অঙ্কন, বা, গড় ব্যয় রেখার U আকৃতির ব্যাখ্যা

৫.৪.৪ স্বল্পকালীন গড় ও প্রান্তিক ব্যয়ের সম্পর্ক

৫.৫ দীর্ঘকালীন ব্যয়

৫.৫.১ দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় রেখার আকৃতি

৫.৫.২ স্বল্পকালীন মোট ব্যয় রেখা থেকে দীর্ঘকালীন মোট ব্যয় রেখা অঙ্কন

৫.৫.৩ দীর্ঘকালীন গড় ও প্রান্তিক ব্যয়ের সম্পর্ক

৫.৬ সারাংশ

৫.৭ অনুশীলনী

৫.৮ নির্বাচিত গ্রন্থতালিকা

৫.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে শিক্ষার্থীরা জানতে পারবে

- স্বল্পকালীন মোট ব্যয় রেখার আকৃতি
- স্বল্পকালীন গড় ব্যয়ের প্রকৃতি
- গড় ও প্রান্তিক ব্যয়ের সম্পর্ক

- দীর্ঘকালীন ব্যয়ের বৈশিষ্ট্য
- স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন ব্যয়ের সম্পর্ক

৫.২ প্রস্তাবনা

কোনো দ্রব্য বা সেবাকার্য উৎপাদন করতে বিভিন্ন উপাদান বা উপকরণ লাগে। সেগুলি হল জমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন। এর জন্য ফার্মকে ব্যয় বহন করতে হয়। একে উৎপাদন ব্যয় বলে। এই উৎপাদন ব্যয় প্রধানত যে সকল অভ্যন্তরীণ বিষয়ের উপর নির্ভর করে সেগুলি হল : উপাদানগুলির পরিমাণ এবং তাদের ব্যবহারের অনুপাত, উপাদানগুলির দাম, উপাদানগুলির দক্ষতা, উৎপাদন পদ্ধতি ও প্রযুক্তি প্রভৃতি। এছাড়া, কতকগুলি বাহ্যিক বিষয়ের উপরও ফার্মের উৎপাদন ব্যয় নির্ভর করে। সেগুলি হল, সরকারের আর্থিক ও রাজস্ব নীতি, সরকারি কর ও ভরতুকি ব্যবস্থা, বৈদেশিক বাণিজ্য নীতি প্রভৃতি। বর্তমান এককে আমরা উৎপাদন ব্যয়ের উপর এই বাহ্যিক বিষয়গুলির প্রভাব আলোচনা করবো না। আমরা শুধুমাত্র ফার্মের আর্থিক উৎপাদন ব্যয় সম্পর্কে আলোচনা করবো। উৎপাদন কার্যে ব্যবহৃত উপাদানগুলির জন্য ফার্ম যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে তাই হল আর্থিক উৎপাদন ব্যয়। এই আর্থিক উৎপাদন ব্যয়ের প্রকৃতি নিয়ে আমরা আলোচনা করবো।

৫.৩ স্বল্পকাল ও দীর্ঘকাল

ফার্মের উৎপাদন ব্যয় আলোচনা করার সময় উৎপাদন কাল সম্পর্কে ধারণা থাকা দরকার। উৎপাদনের কালকে আমরা দু'ভাগে ভাগ করতে পারি : স্বল্পকাল ও দীর্ঘকাল। স্বল্পকাল হল এমন এক সময়কাল যার মধ্যে ফার্ম তার সমস্ত উপাদানের পরিমাণ পরিবর্তিত করতে পারে না। অন্যদিকে, দীর্ঘকাল হল এমন এক সময়কাল যার মধ্যে ফার্ম সমস্ত উপকরণের পরিমাণ পরিবর্তিত করতে পারে। অর্থাৎ দীর্ঘকালে সমস্ত উপকরণই হল পরিবর্তনীয় উপাদান বা উপকরণ। স্বল্পকালে উপাদানগুলিকে দু'ভাগে ভাগ করা যায় : স্থির উপাদান ও পরিবর্তনীয় উপাদান। স্থির উপাদান বলতে সেই উপাদানগুলিকে বোঝায় যাদের পরিমাণ স্বল্পকালে পরিবর্তন করা যায় না। এদের পরিমাণ স্বল্পকালে স্থির থাকে। অন্যদিকে, পরিবর্তনীয় উপাদান হল সেই সমস্ত উপাদান যাদের পরিমাণ স্বল্পকালে পরিবর্তন করা যায়।

৫.৪ স্বল্পকালীন ব্যয়

স্বল্পকালে সমস্ত উপকরণগুলিকে দু'ভাগে ভাগ করা হয় : স্থির উপাদান ও পরিবর্তনীয় উপাদান। সুতরাং স্বল্পকালীন ব্যয়ের মধ্যে দুঃটি অংশ থাকবে : একটি স্থির উপাদান এবং একটি পরিবর্তনীয় উপাদান। ব্যয়ের এই দুটি অংশ (component) নিয়ে আমরা আলোচনা করব।

৫.৪.১. মোট স্থির ব্যয়, মোট পরিবর্তনীয় ব্যয় ও মোট ব্যয়

স্বল্পকালে স্থির উপাদানগুলির জন্য ফার্মের যে ব্যয় হয় তাকে বলে মোট স্থির ব্যয় (Total Fixed Cost বা TFC)। অন্যদিকে, পরিবর্তনীয় উপাদানগুলির জন্য ফার্মের যে ব্যয় হয় তাকে বলে মোট পরিবর্তনীয় ব্যয় (Total Variable Cost বা TVC)। সুতরাং, স্বল্পকালে ফার্মের মোট ব্যয় (Total Cost বা TC) হল মোট স্থির ব্যয় ও মোট পরিবর্তনীয় ব্যয়ের সমষ্টি। অর্থাৎ TC = TFC + TVC। আমরা এই মোট ব্যয়গুলির প্রকৃতি নিয়ে আমরা এখন আলোচনা করবো।

TFC হল স্থির উপাদানগুলির জন্য ব্যয়, যেমন, কারখানা বিল্ডিংয়ের ভাড়া, ভারী যন্ত্রপাতির ভাড়া, অফিসারদের বেতন, মূলধনের ক্ষয়ক্ষতি বা অবচয় প্রভৃতি। এই সমস্ত ব্যয় উৎপাদনের পরিমাণের উপর নির্ভর করে না। উৎপাদন বাড়ালে বা কমালেও স্থির ব্যয় একই থাকে। উৎপাদন শূন্য হলেও অর্থাৎ উৎপাদন সাময়িক বন্ধ থাকলেও ফার্মকে এই ব্যয় বহন করতে হয়। সুতরাং TFC রেখা উৎপাদন অক্ষের সঙ্গে সমান্তরাল হবে। ৪.১ নং চিত্রে আমরা TFC রেখা এঁকেছি। উৎপাদনের পরিমাণ যাই-ই হোক না কেন, TFC-র পরিমাণ হল OA। এবার TVC রেখার আকৃতি বিবেচনা করা যাক। TVC হল পরিবর্তনীয় উপাদানের জন্য ব্যয়। TVC-র উদাহরণ হল কাঁচামালের জন্য ব্যয়, জ্বালানি ব্যয়, অস্থায়ী শ্রমিকের মজুরি, পরিবহন ব্যয় প্রভৃতি। স্পষ্টতই, স্বল্পকালে ফার্মকে উৎপাদন বাড়াতে হলে এই পরিবর্তনীয় উপাদানগুলির নিয়োগ বাড়িয়েই তা করতে হয়। সুতরাং, উৎপাদন যত বাড়বে, পরিবর্তনীয় উপাদানের নিয়োগও তত বাড়বে অর্থাৎ TVC বাড়বে। আবার, উৎপাদনের পরিমাণ শূন্য ($q = 0$) হলে TVC ও শূন্য হবে। তাহলে TVC রেখা মূলবিন্দু থেকে শুরু হবে এবং তা ঊর্ধ্বমুখী হবে। TVC ঠিক কী রকম আকৃতির হবে তা পরিবর্তনীয় অনুপাতের নিয়মের উপর নির্ভর করবে। পরিবর্তনীয় অনুপাতের নিয়ম থেকে আমরা জানি যে, প্রথম দিকে পরিবর্তনীয় উপাদানের নিয়োগ যে হারে বাড়ানো হয়, উৎপাদন তার চেয়ে বেশি হারে বাড়ে অর্থাৎ TVC, উপাদানের স্তর (q) অপেক্ষা কম হারে বাড়ে। কিন্তু উৎপাদনের একটা স্তর পার হয়ে গেলে ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়ম কাজ করবে। ফলে উৎপাদনের চেয়ে TVC বেশি হারে বাড়বে। সুতরং, TVC রেখা প্রথমে অনুভূমিক বা উৎপাদন (q) অক্ষের দিকে অবতল ও পরে উত্তল হবে (চিত্র ৫.১)। তবে এটা বরাবর ঊর্ধ্বমুখী হবে কেননা বেশি উৎপাদন পেতে বেশি পরিমাণ পরিবর্তনীয় উপাদান নিয়োগ করতে হয়। ফলে উৎপাদন বাড়লে TVCও বাড়ে। আর TVC রেখা মূলবিন্দু থেকে শুরু হবে কারণ যখন উৎপাদনের পরিমাণ শূন্য, তখন পরিবর্তনীয় উপাদান নিয়োগ হবে না অর্থাৎ TVCও শূন্য হবে।

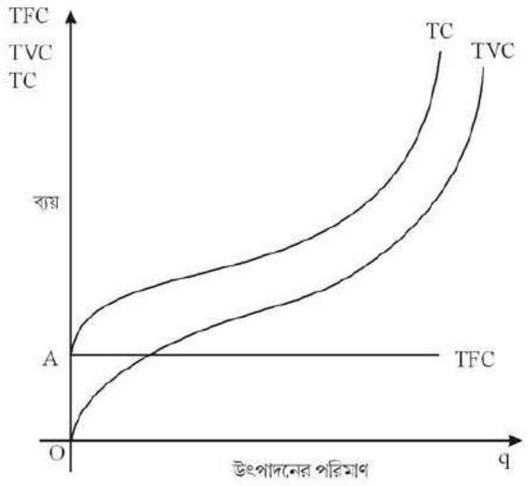

চিত্র ৫.১

এখন, মোট ব্যয় (TC) রেখার আকৃতি কেমন হবে দেখা যাক। আমরা জানি, TC = TFC + TVC। সুতরাং TFC ও TVC রেখাকে উল্লম্বভাবে যোগ করে আমরা TC রেখা পেতে পারি। যখন q = 0, TC = TFC + 0 = TFC = OA. সুতরাং TC রেখা A বিন্দু থেকে শুরু হবে। ইহা TVC রেখার ন্যায় উর্দ্ধমুখী হবে এবং প্রথমে অবতল ও তারপর উত্তল হবে (চিত্র ৫.১)। TC রেখার TFC পরিমাণ ধনাত্মক উল্লম্ব ছেদাংশ থাকবে। আবার, TC = TFC + TVC, ∴ TFC = TC − TVC। সুতরাং TC ও TVC রেখার মধ্যে উল্লম্ব দূরত্ব হল TFC। এই TFC যেহেতু স্থির থাকে, সুতরাং TC ও TVC-এর মধ্যে উল্লম্ব দূরত্ব স্থির থাকবে এবং এই দূরত্ব TFC-র সমান।

৫.৪.২. গড় স্থির ব্যয়, গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় ও গড় ব্যয়

আমরা এখন স্বল্পকালের বিভিন্ন গড় ব্যয় নিয়ে আলোচনা করব।

□ গড় স্থির ব্যয় (Average Fixed Cost বা AFC) :

গড় স্থির ব্যয় বা $AFC = \frac{TFC}{q} = \frac{\text{মোট স্থির ব্যয়}}{\text{উৎপাদনের পরিমাণ}}$ । এখন, q বাড়ুক বা কমুক, TFC স্থির থাকে।

সুতরাং, q বাড়লে AFC কমবে এবং q কমলে AFC বাড়বে। সুতরাং AFC রেখা নিম্নমুখী হবে। তবে AFC কখনোই শূন্য বা ঋণাত্মক হতে পারে না। সংজ্ঞা থেকে দেখা যাচ্ছে, $q \to 0$, $AFC \to \infty$। আবার, $q \to \infty$, $AFC \to 0$। আবার, যেহেতু $AFC = TFC/q$, সুতরাং $AFC \times q = TFC$ বা ধ্রুবক। এর অর্থ হল, AFC রেখার উপর যে-কোনো বিন্দু থেকে দুটি অক্ষের উপর দুটি লম্ব টানলে যে আয়তক্ষেত্র পাওয়া যাবে, সেই আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল হবে TFC। এখন, সকল উৎপাদনের স্তরে TFC স্থির থাকে। তাহলে AFC রেখার উপর যে-কোনো বিন্দু নিয়ে আয়তক্ষেত্র গঠন করা হোক না কেন, সব আয়তক্ষেত্রের

ক্ষেত্রফল একই (= TFC) হবে। এ ধরনের রেখাকে বলে আয়তক্ষেত্রিক পরাবৃত্ত (Rectangular hyperbola)। সুতরাং AFC রেখাটি আয়তক্ষেত্রিক পরাবৃত্ত হবে। আমরা ৫.২নং চিত্রে এরূপ একটি AFC রেখা এঁকেছি।

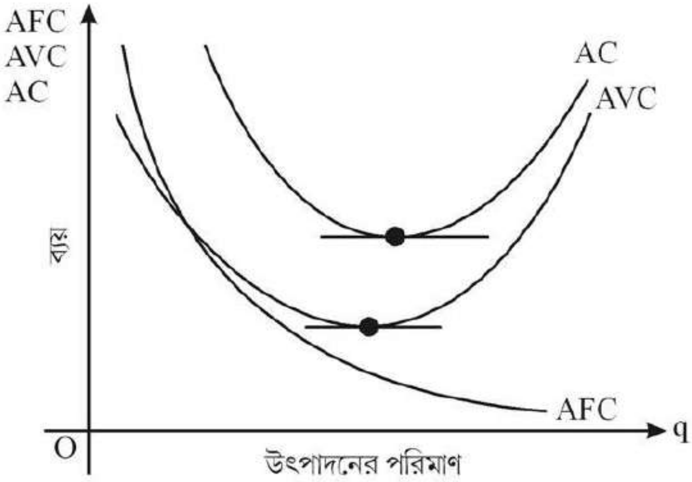

চিত্র ৫.২

□ গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় (Average Variable Cost বা AVC) :

গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় বা $AVC = \frac{TVC}{q}$। আমরা জানি, q বাড়লে TVCও বাড়ে। তাহলে AVC-র কী ঘটবে? সেটি জানা যাবে পরিবর্তনীয় অনুপাতের নিয়ম থেকে। আমরা জানি যে, পরিবর্তনীয় অনুপাতের নিয়ম অনুযায়ী, প্রথম দিকে q অপেক্ষা TVC কম হারে বাড়ে। কিন্তু উৎপাদনের একটা স্তরের পর q অপেক্ষা TVC বেশি হারে বাড়ে। সুতরাং AVC প্রথমে কমবে এবং q-এর একটা স্তরের পর AVC বাড়বে। সুতরাং AVC রেখা U-আকৃতির হবে। স্বল্পকালে পরিবর্তনীয় অনুপাতের নিয়মের দরুনই AVC রেখা U-আকৃতির হয়। অর্থাৎ AVC প্রথমে কমে, উৎপাদনের একটা স্তরে ইহা সর্বনিম্ন হয় এবং তারপর বাড়ে। ৫.২ নং চিত্রে আমরা এরূপ একটি AVC রেখা এঁকেছি।

□ গড় ব্যয় বা মোট গড় ব্যয় :

আমরা জানি TC = TFC + TVC। এখন উভয় পক্ষকে q দ্বারা ভাগ করে পাই, $\frac{TC}{q} = \frac{TFC}{q} + \frac{TVC}{q}$

বা, AC (বা, ATC) = AFC + AVC। অর্থাৎ গড় ব্যয় বা গড় মোট ব্যয় হল গড় স্থির ব্যয় ও গড় পরিবর্তনীয় ব্যয়ের সমষ্টি। সুতরাং AFC ও AVC রেখাকে উল্লম্বভাবে যোগ করে আমরা AC (বা, ATC) রেখা পাই। প্রথম দিকে উৎপাদন বাড়ার সাথে সাথে AFC ও AVC উভয়ই কমছে। সুতরাং, তাদের

যোগফল অর্থাৎ AC-ও কমবে। কিন্তু একটা স্তরের পর AVC বাড়তে শুরু করেছে, যদিও AFC কমেই চলেছে। উৎপাদনের একটা স্তরের পর AVC-র বাড়ার হার AFC কমার হারের চেয়ে বেশি হবে। তখন AC-ও বাড়তে শুরু করবে। সুতরাং AC রেখাও AVC রেখার মতো U আকৃতির হবে। পরবর্তনীয় অনুপাতের নিয়মের দরুনই AC রেখা U আকৃতির হয়ে তাকে। তবে লক্ষণীয় যে, AVC এবং AC উভয়েই U আকৃতির হলেও উভয়ের নিম্নতম বিন্দু কিন্তু একই উৎপাদনের স্তরে ঘটছে না। আমাদের ৫.২ নং চিত্রে একটি AC রেখা এঁকেছি। দেখা যাচ্ছে, যে উৎপাদনের স্তরে AVC সর্বনিম্ন হয়েছে, তার চেয়ে বেশি উৎপাদনের স্তরে AC সর্বনিম্ন হয়েছে। অন্যভাবে বলতে গেলে, AC রেখার সর্বনিম্ন বিন্দু AVC রেখার সর্বনিম্ন বিন্দুর ডানদিকে হবে। আবার, AC = AFC + AVC।

∴ AFC = AC – AVC। অতএব, AC ও AVC রেখার মধ্যে উল্লম্ব দূরত্ব হল AFC। যত q বাড়ে, AFC কমে। সুতরাং q যত বাড়বে, AC ও AVC-র মধ্যে উল্লম্ব দূরত্বও কমতে থাকবে। তবে AFC কখনোই শূন্য হয় না। ফলে AC ও AVC রেখা কখনোই মিলে যাবে না।

৫.৪.৩. স্বল্পকালীন মোট ব্যয় রেখা থেকে গড় ব্যয় রেখা অঙ্কন বা, গড় ব্যয় রেখার U আকৃতির ব্যাখ্যা :

পরিবর্তনীয় অনুপাতের নিয়ম কাজ করলে স্বল্পকালীন গড় ব্যয় রেখা U-আকৃতির হবে। আমরা জানি, কেবলমাত্র পরিবর্তনীয় উপাদানের পরিমাণ যদি ক্রমাগত বাড়ানো হয় তাহলে মোট উৎপাদন প্রথম দিকে বেশি হারে বাড়লেও একটা স্তরের পর তা কম কম হারে বাড়বে। একেই পরিবর্তনীয় অনুপাতের নিয়ম বলে। তাহলে এই নিয়ম অনুযায়ী প্রথম দিকে মোট ব্যয়, মোট উৎপাদনের চেয়ে কম হারে বাড়বে এবং উপাদানের একটা স্তরের পর মোট ব্যয়, মোট উৎপাদনের চেয়ে বেশি হারে বাড়বে। এখন, গড় ব্যয় = মোট ব্যয় ÷ মোট উৎপাদন। তাহলে গড় ব্যয় প্রথম দিকে কমবে এবং উৎপাদনের একটা স্তরের পর গড় ব্যয় বাড়বে। অর্থাৎ গড় ব্যয় রেখা U আকৃতির হবে।

৫.৩ নং রেখাচিত্রে বিষয়টি বোঝানো হয়েছে। চিত্রের উপরের অংশে আমরা মোট ব্যয় রেখা (TC) এঁকেছি। পরিবর্তনীয় অনুপাতের নিয়ম অনুযায়ী TC প্রথমে উৎপাদন অপেক্ষা কম হারে এবং পরে বেশি হারে বাড়ে। ফলে TC রেখা উৎপাদন অক্ষের বা অনুভূমিক অক্ষের দিকে প্রথমে অবতল ও তারপর উত্তল হবে। যখন উৎপাদনের পরিমাণ Oq_1, তখন মোট ব্যয় = Aq_1। সুতরাং গড় ব্যয় = Aq_1/Oq_1 = OA রেখার ঢাল। গড় ব্যয়ের এই মান আমরা চিত্রের নীচের অংশে A_1q_1 দূরত্ব দ্বারা দেখিয়েছি। দেখা যাচ্ছে যে, মোট ব্যয় রেখার কোনো বিন্দুতে গড় ব্যয় হল সেই বিন্দু এবং মূলবিন্দুর সংযোজক সরলরেখার ঢাল। তাহলে B বিন্দুতে অর্থাৎ Oq_2 পরিমাণ উৎপাদনে গড় ব্যয়ের পরিমাণ সর্বনিম্ন। ঐ বিন্দুতে গড় ব্যয়

$= \frac{Bq_2}{Oq_2}$ বা, OB রেখার ঢাল। গড় ব্যয়ের এই মান আমরা চিত্রের নীচের অংশে B_2q_2 দূরত্ব দ্বারা প্রকাশ করেছি। উৎপাদনের স্তর Oq_2 পার হয়ে গেলে গড় ব্যয় বাড়ছে। যেমন, C বিন্দুতে বা Oq_3 পরিমাণ উৎপাদনের স্তরে গড় ব্যয় হল OC রেখার ঢাল বা C_3q_3 (ধরি)। আমরা A_1, B_2, C_3 প্রভৃতি বিন্দুগুলি যোগ করে স্বল্পকালীন গড় ব্যয় রেখা (SAC) পাই। এভাবে মোট ব্যয় রেখা থেকে আমরা গড় ব্যয় রেখা টানতে পারি। দেখা যাচ্ছে, গড় ব্যয় প্রথমে কমছে, একটি সর্বনিম্ন মানে পৌঁছাচ্ছে এবং তারপর বাড়ছে অর্থাৎ গড় ব্যয় রেখা U আকৃতির হচ্ছে। পরিবর্তনীয় অনুপাতের নিয়মের জন্যই এটা হয়ে থাকে।

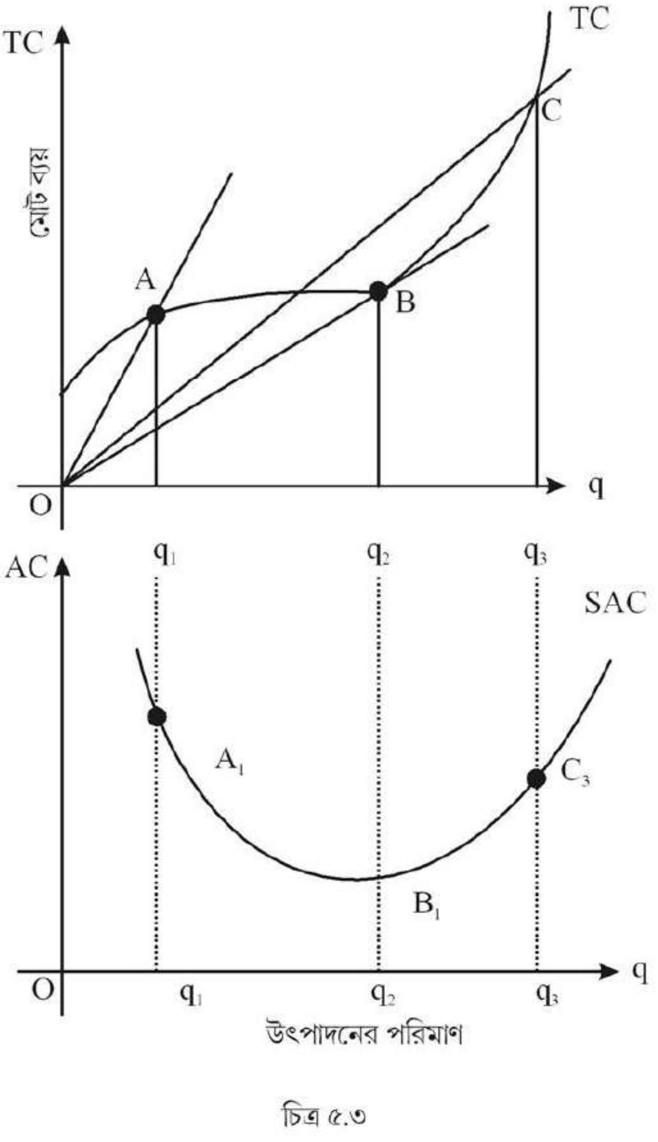

চিত্র ৫.৩

৫.৪.৪. স্বল্পকালীন গড় ও প্রান্তিক ব্যয়ের সম্পর্ক

AC বা গড় ব্যয় হল দ্রব্যের ইউনিট প্রতি ব্যয় অর্থাৎ $AC = \frac{TC}{q}$ । অন্যদিকে, বাড়তি এক ইউনিট উৎপাদন করলে মোট ব্যয় যতটা বাড়ে তাকে বলে প্রান্তিক ব্যয়। স্বল্পকালে যেহেতু মোট স্থির ব্যয় স্থির থাকে, সুতরাং মোট ব্যয়ের বৃদ্ধি = মোট পরিবর্তনীয় ব্যয়ের বৃদ্ধি। আমরা জানি, TC = TFC + TVC। $\Delta TC = 0 + \Delta TVC$ বা, $\frac{\Delta TC}{\Delta q} = \frac{\Delta TVC}{\Delta q} = MC$ । সুতরাং কোনো উৎপাদনের স্তরে MC হল ঐ উপাদানের বিন্দুতে TC বা TVC রেখার ঢাল। TC বা TVC রেখার আকৃতি দেখে বলা যায় যে, এই ঢাল প্রথমে কমে ও তারপর বাড়ে। সুতরাং, MC প্রথমে কমবে, একটা সময় সর্বনিম্ন হবে এবং তারপর বাড়বে। অর্থাৎ, MC রেখা U-আকৃতির হবে। পরিবর্তনীয় অনুপাতের নিয়মের দরুনই MC রেখা U আকৃতির হয়ে থাকে।

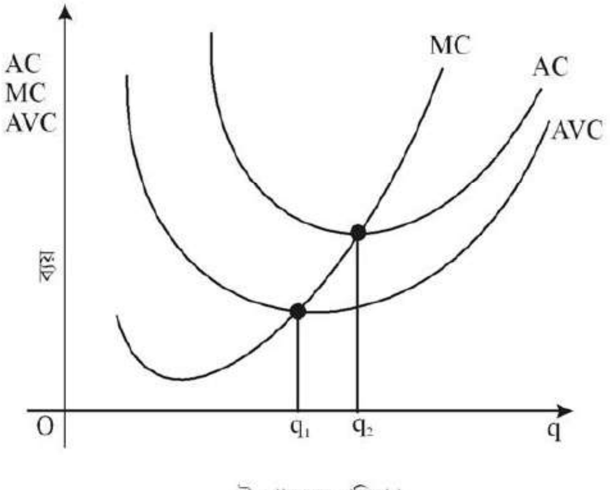

চিত্র ৫.৪

AC ও MC-র মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে। সেটি হল—যখন AC কমে, MC < AC। যখন AC বাড়ে, MC > AC। যখন AC সর্বনিম্ন, তখন MC = AC। আমরা এই সম্পর্কটি ৫.৪ নং ছবিতে দেখিয়েছি। q_2 পরিমাণ উৎপাদনের বাঁদিকে, AC কমছে এবং MC < AC। q_2-র ডানদিকে AC বাড়ছে এবং তখন MC > AC। আবার, q_2 পরিমাণ উৎপাদনে AC সর্বনিম্ন এবং তখন MC = AC হয়েছে।

আমরা বলেছি যে, $\frac{\Delta TC}{\Delta q} = \frac{\Delta TVC}{\Delta q} = MC$ । সুতরাং, AC ও MC-র মধ্যে যেরূপ সম্পর্ক, AVC ও MC-র মধ্যেও অনুরূপ সম্পর্ক থাকবে। যখন AVC কমে, MC < AVC। যখন AVC বাড়ে, MC = AC।

আর যখন AVC সর্বনিম্ন, তখন MC = AVC। আমাদের ৫.৪ নং ছবিতেও এই সম্পর্ক দেখা যাচ্ছে। যখন উৎপাদনের পরিমাণ q_1 অপেক্ষা কম, তখন AVC কমছে এবং MC < AVC। যখন উৎপাদনের পরিমাণ q_1 অপেক্ষা বেশি, তখন MC > AVC। আর যখন উৎপাদনের পরিমাণ q_1, তখন AVC সর্বনিম্ন এবং MC = AVC হয়েছে।

৫.৫ দীর্ঘকালীন ব্যয়

আমরা বলেছি, দীর্ঘকাল হল এমন এক সময় দৈর্ঘ্য, যে সময়কালের মধ্যে ফার্ম তার সমস্ত উপাদানের পরিমাণ পরিবর্তিত করতে পারে, সুতরাং, দীর্ঘকালে স্থির উপাদান বলে কিছু নেই; সব উপাদানই পরিবর্তনীয় উপাদান। দীর্ঘকালীন ব্যয় সম্পর্কে আলোচনায় আমরা প্রথমে দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় রেখা নিয়ে আলোচনা করব।

৫.৫.১ দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় রেখার আকৃতি

দীর্ঘকালে সব উপাদানই পরিবর্তনীয় উপাদান। দীর্ঘকালে কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করতে ফার্ম ঐ পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন যে আয়তনের কারখানা (plant) সবচেয়ে দক্ষ, সেই আয়তনের কারখানা গড়ে নেবে। স্বল্পকালে ফার্মের সেই সুবিধা নেই। সেক্ষেত্রে স্থির উপাদানগুলির পরিমাণ পরিবর্তন করতে পারে না। দীর্ঘকালে ফার্ম সমস্ত উপকরণের পরিমাণ পরিবর্তন করা যায়। উপাদানের পরিমাণ উপযুক্তভাবে এবং দক্ষভাবে পরিবর্তনের ক্ষেত্রে দীর্ঘকালে ফার্মের স্বাধীনতা বেশি। সেজন্য দীর্ঘকালীন ব্যয় (LTC) কখনোই স্বল্পকালীন ব্যয়ের (STC) চেয়ে বেশি হবে না অর্থাৎ LTC ≤ STC হবে। সুতরাং $\frac{LTC}{q} \leq \frac{STC}{q}$, বা LAC ≤ SAC। সুতরাং দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় কখনোই স্বল্পকালীন গড় ব্যয় অপেক্ষা বেশি হবে না। LAC হবে SAC রেখাগুলির envelope বা বহিঃস্পর্শক হবে। তাহলে স্বল্পকালীন গড় ব্যয় (SAC) রেখা থেকেই আমরা দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় (LAC) রেখা পেতে পারি।

বিষয়টি আমরা ৫.৫ নং চিত্রে ব্যাখ্যা করেছি। আমরা জানি, দীর্ঘকাল হল কয়েকটি স্বল্পকালের সমষ্টিমাত্র। মনে করি, তিনটি স্বল্পকাল নিয়ে আমাদের দীর্ঘকাল। এই তিনটি স্বল্পকালে ফার্মের তিন রকম আয়তনের কারখানা হয়। এই তিনটি কারখানার স্বল্পকালীন গড় ব্যয় রেখা যথাক্রমে SAC_1, SAC_2 এবং SAC_3। এক একটি SAC রেখা ফার্মের এক একটি আয়তন নির্দেশ করছে। SAC রেখা যত ডানদিকে অবস্থান করবে, ফার্মের আয়তন বা উৎপাদনের মাত্রা তত বড়। স্বল্পকালে ফার্ম তার আয়তন বা উৎপাদনের মাত্রা পরিবর্তন করতে পারে না। তাই স্বল্পকালে ফার্ম একটি নির্দিষ্ট SAC রেখার উপর অবস্থান করে। কিন্তু দীর্ঘকালে ফার্ম উৎপাদনের মাত্রার পরিবর্তন করতে পারে। ফলে ফার্মটি একটি SAC রেখার থেকে অন্য SAC রেখাতে সরে যেতে পার। দীর্ঘকালে কোনো পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করতে হলে যে SAC-তে

খরচ কম, ফার্মটি সেই SAC-টিই গ্রহণ করবে। যেমন, চিত্রে দেখা যাচ্ছে, Oq_1 বা তার কম পরিমাণ উৎপাদন করতে হলে ফার্ম SAC_1 রেখার উপর থাকবে। কেননা তখন গড় ব্যয় SAC_2 বা SAC_3 অপেক্ষা কম। তেমনি Oq_1 এবং Oq_2-র মধ্যে কোনো পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করতে হলে ফার্মটি SAC_2 রেখার উপর থাকবে অর্থাৎ দ্বিতীয় বা মাঝারি আয়তনের কারখানা তৈরি করে নেবে। তেমনি, Oq_2 অপেক্ষা বেশি উৎপাদন করতে হলে ফার্ম SAC_3-র উপর অবস্থান করবে। সুতরাং, SAC রেখাগুলির মোটা অংশগুলি নিয়ে LAC রেখা গঠিত হবে।

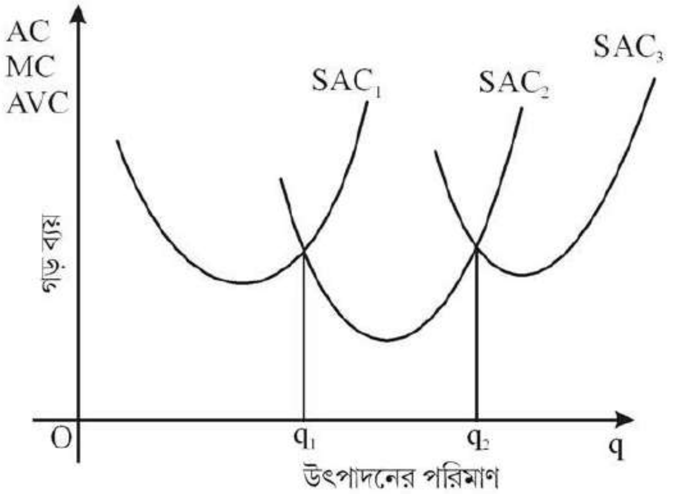

চিত্র ৫.৫

এখন যদি আমরা ধরে নিই যে, অংসখ্য রকম আয়তনের SAC রেখা আছে, তাহলে LAC রেখা একটি মসৃণ রেখায় পরিণত হবে। SAC রেখাগুলির সর্বোত্তম বিন্দুগুলি নিয়ে এই LAC রেখা গঠিত হয়েছে। (চিত্র ৫.৬)। LAC রেখা SAC রেখাগুলিকে মুড়ে রেখেছে। তাই LAC রেখাকে মোড়ক রেখা বা envelope curve বলা হয়। LAC রেখা SAC রেখাগুলির বহিঃস্পর্শক। এর তাৎপর্য হল, LAC কখনই SAC অপেক্ষা বেশি হবে না ($LAC \leq SAC$)। চিত্রে দেখা যাচ্ছে, Oq_0 পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করলে LAC সর্বনিম্ন হবে। এই আয়তনের ফার্মকে সর্বোত্তম বা কাম্য আয়তনের ফার্ম (optimum size of the firm) বলা হয়। ফার্মের কারখানার যে আয়তন হলে এর দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় সর্বনিম্ন হয়, সেই আয়তনের ফার্মকে কাম্য বা সর্বোত্তম আয়তনের ফার্ম বলে। আরও লক্ষণীয় যে, LAC রেখা SAC রেখার ন্যায় U-আকৃতির। তবে SAC রেখা U আকৃতির হয়ে থাকে পরিবর্তনীয় অনুপাতের নিয়মের জন্য। আর LAC রেখা U আকৃতির হয়ে থাকে মাত্রাগত প্রতিদানের নিয়মের জন্য। বর্ধমান প্রতিদানের নিয়ম কার্যকরী হলে LAC রেখা নিম্নমুখী হবে এবং হ্রাসমান প্রতিদান নিয়ম কার্যকরী হলে LAC রেখা ঊর্ধ্বমুখী হবে। যদি উৎপাদনের কম স্তরে বর্ধমান প্রতিদানের নিয়ম কাজ করে তাহলে LAC রেখা প্রথমে নিম্নমুখী হবে। এরপর উৎপাদনের একটা স্তর পার হয়ে গেলে ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়ম কাজ করে। ফলে LAC

রেখা ঊর্ধ্বমুখী হবে। তাহলে প্রথমে LAC কমবে এবং তারপর উৎপাদনের একটা স্তরের পর LAC বাড়বে। অর্থাৎ LAC রেখা U-আকৃতির হবে। যদি উৎপাদনের সকল স্তরে সমহার মাত্রাবৃদ্ধির প্রতিদান কাজ করে, তাহলে LAC রেখা অনুভূমিক হবে। সেক্ষেত্রে LAC রেখা সমস্ত SAC রেখাগুলির সর্বনিম্ন বিন্দু দিয়ে যাবে। ৫.৭ নং চিত্রে আমরা এরূপ একটি LAC রেখা এঁকেছি।

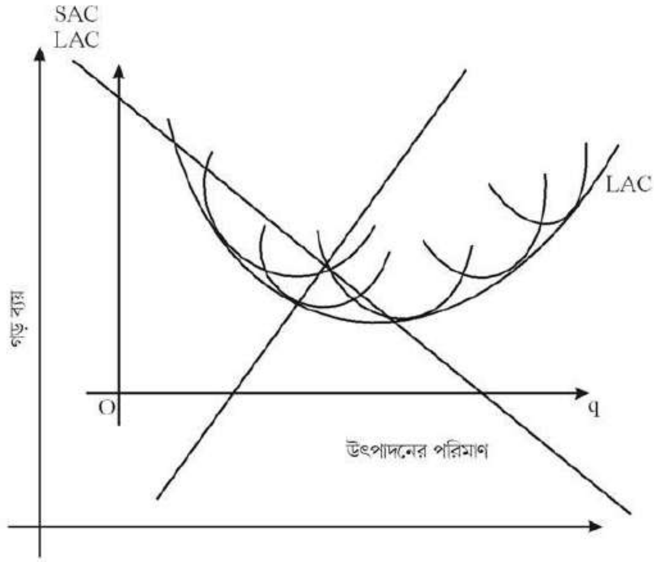

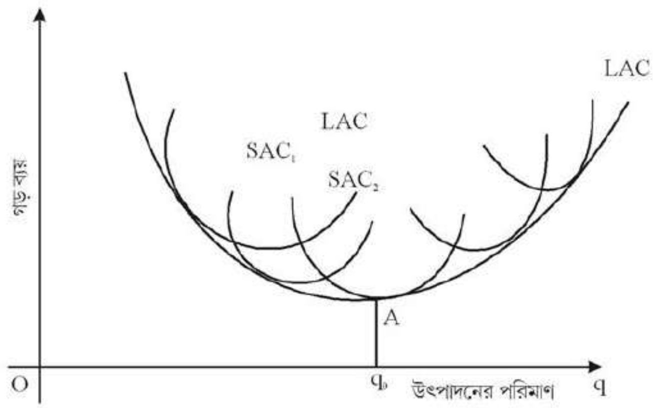

চিত্র ৫.৬

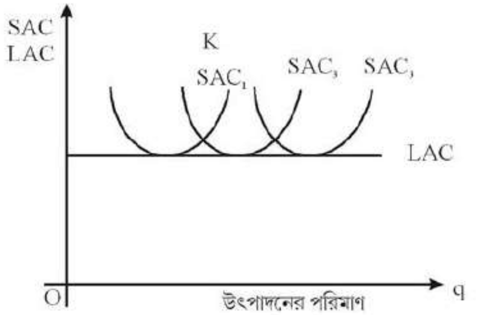

চিত্র ৫.৭

৫.৫.২. স্বল্পকালীন মোট ব্যয় রেখা থেকে দীর্ঘকালীন মোট ব্যয় রেখা অঙ্কন

ফার্ম দীর্ঘকালে সমস্ত উপাদানের পরিমাণই পরিবর্তন করতে পারে। সুতরাং দীর্ঘকালে স্থির ব্যয় বলে কিছু নেই, সবই পরিবর্তনীয় ব্যয়। সেজন্য দীর্ঘকালে মোট উৎপাদন শূন্য হলে মোট ব্যয়ও শূন্য হবে। সুতরাং, দীর্ঘকালীন মোট ব্যয় রেখা মূল বিন্দু থেকে শুরু হবে এবং তা ঊর্ধ্বমুখী হবে। কারণ বেশি উৎপাদন করতে হলে বেশি পরিমাণ উপাদান নিয়োগ করতে হবে। ফলে উৎপাদন (q) বাড়লে LTC বা মোট দীর্ঘকালীন ব্যয় বাড়বে। এখন, সকল উপাদানকেই দীর্ঘকালে একযোগে বাড়ানো যায়। সকল

উপাদানকে এক অনুপাতে বাড়ালে উৎপাদনের মাত্রা বেড়ে যায়। তখন মাত্রাবৃদ্ধির প্রতিদানর নিয়ম (Law of returns to scale) কাজ করে। মাত্রাবৃদ্ধির প্রতিদান আবার তিন ধরনের : মাত্রাবৃদ্ধির বর্ধমান প্রতিদান, মাত্রাবৃদ্ধির সমহার প্রতিদান এবং মাত্রাবৃদ্ধির হ্রাসমান প্রতিদান। কোন্ ধরনের মাত্রাবৃদ্ধির প্রতিদান কার্যকরী হচ্ছে তার উপর দীর্ঘকালীন মোট ব্যয় রেখার আকৃতি নির্ভর করে।

দীর্ঘকাল বলতে আমরা কয়েকটি স্বল্পকালের সমষ্টি বুঝে থাকি। সুতরাং, স্বল্পকালীন মোট ব্যয় (STC) রেখা থেকে আমরা দীর্ঘকালীন মোট ব্যয় (LTC) রেখা পেতে পারি। ঠিক যেমন LAC রেখা হল SAC রেখাগুলির বহিঃস্পর্শক, LTC রেখা হবে STC রেখাগুলির বহিঃস্পর্শক। আমরা জানি যে, LAC কখনোই SAC কে ছাড়িয়ে যায় না অর্থাৎ $LAC \leq SAC$। উভয় পক্ষকে উৎপাদনের পরিমাণ (q) দ্বারা গুণ করলে পাই, $LAC \times q \leq SAC \times q$ অর্থাৎ $LTC \leq STC$। তাহলে LTC ও STC অপেক্ষা বেশি হবে না। অন্যভাবে বলতে গেলে, LTC রেখা হবে STC রেখাগুলির বহিঃস্পর্শক। বিষয়টি আমরা ৫.৮ নং চিত্রে ব্যাখ্যা করেছি।

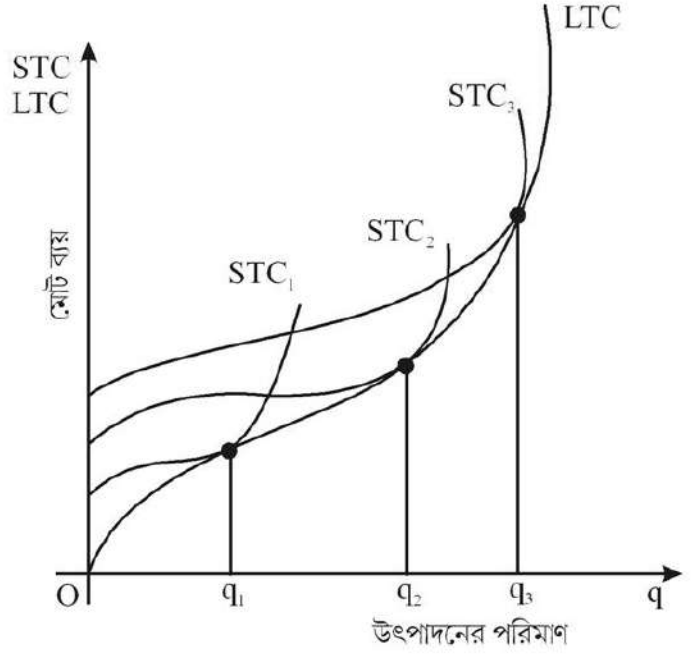

চিত্র ৫.৮

আমরা ধরে নিচ্ছি যে, আমাদের দীর্ঘকাল তিনটি স্বল্পকালের সমষ্টি। প্রতিটি স্বল্পকালের জন্য আমরা একটি করে স্বল্পকালীন মোট ব্যয় রেখা (STC) পাই। স্বল্পকালে কারখানার আয়তন স্থির থাকে। কারখানার এক একটা আয়তনের জন্য আমরা এক একটা STC রেখা পাবো। চিত্রে আমরা তিন রকমের আয়তনের কারখানার জন্য তিনটি STC রেখা টেনেছি। ছোটো আয়তনের কারখানার জন্য মোট ব্যয় রেখা হল STC_1। তেমনি, মাঝারি ও বড় আয়তনের কারখানার জন্য মোট ব্যয় রেখা হল যথাক্রমে STC_2 এবং

STC_3। চিত্রে দেখা যাচ্ছে যে, Oq_1 পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করতে হলে ছোটো কারখানায় উৎপাদন করা অর্থাৎ STC_1-এর উপর থাকাই সবচেয়ে লাভজনক। কেননা তখন মোট ব্যয় সবচেয়ে কম। তেমনি, Oq_2 পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করতে STC_2-র উপরে থাকা বা মাঝারি আয়তনের কারখানায় উৎপাদন করতে STC_3 সবচেয়ে দক্ষ। এভাবে, স্বল্পকালীন মোট ব্যয় রেখাগুলির সর্বোত্তম বিন্দুগুলি নিয়ে দীর্ঘকালীন মোট ব্যয় রেখা (LTC) গঠিত হবে। LTC রেখা হবে STC রেখাগুলির বহিঃস্পর্শক। এর অর্থ হল, LTC কখনোই STC অপেক্ষা বড় হবে না ($LTC \leq STC$)। এর কারণ হল, দীর্ঘকালে ফার্ম সমস্ত রকমের ব্যয় পরিবর্তন (adjust) করতে পারে, কিন্তু স্বল্পকালে ফার্ম স্থির ব্যয়কে পরিবর্তন করতে পারে না। চিত্রে আমরা কারখানার আয়তন অসংখ্য রকমের হতে পারে এটা ধরে নিয়ে দীর্ঘকালীন মোট ব্যয় রেখা পেয়েছি।

LTC রেখা মূল বিন্দু থেকে শুরু হবে এবং সেটি উর্ধ্বমুখী হবে। যদি উৎপাদনের সকল স্তরে সমহার মাত্রাবৃদ্ধির প্রতিদান কার্যকরী হয়, তাহলে LTC রেখা মূল বিন্দুগামী উর্ধ্বমুখী সরলরেখা হবে (চিত্র ৫.১০.ক)। যদি ধরা হয় যে, উৎপাদন স্তরের প্রথম দিকে বর্ধমান মাত্রাবৃদ্ধির প্রতিদান এবং উৎপাদনের একটা স্তরের পর হ্রাসমান মাত্রাবৃদ্ধির প্রতিদান কাজ করছে, তাহলে LTC রেখা অনুভূমিক অক্ষের দিকে বা উৎপাদন (q) অক্ষের দিকে প্রথমে অবতল ও তারপর উত্তল হবে। এরূপ অনুমান করে নিয়েই আমরা চিত্রে LTC রেখা অঙ্কন করেছি।

৫.৫.৩. দীর্ঘকালীন গড় ও প্রান্তিক ব্যয়ের সম্পর্ক

কোনো দ্রব্যের একক প্রতি দীর্ঘকালীন ব্যয় হল ঐ দ্রব্যের দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় (LAC) অথাৎ, LAC = LTC ÷ উপাদনের পরিমাণ = LTC ÷ q। অন্যদিকে, কোনো দ্রব্য এক একক বেশি উৎপাদন করলে মোট দীর্ঘকালীন ব্যয় যতটা বাড়ে, তাকে ঐ দ্রব্যের ঐ একক বা ইউনিটের প্রান্তিক ব্যয় (LMC) বলে অর্থাৎ $LMC = \frac{\Delta LTC}{\Delta q}$। LTC রেখার কোনো বিন্দুতে মোট ব্যয় রেখার ঢাল হল ঐ বিন্দুতে LMC-র পরিমাণ। এখন, LTC রেখা সাধারণত প্রথম দিকে অনুভূমিক বা উৎপাদন (q) অক্ষের দিকে অবতল এবং তারপর উত্তল হয়। সুতরাং, LTC রেখার ঢাল বা LMC প্রথমে কমবে, একটা বিন্দুতে সর্বনিম্ন হবে এবং তারপর বাড়বে। অন্যভাবে বলতে গেলে, LMC রেখা U আকৃতির হবে। তেমনি LTC রেখার কোনো বিন্দুতে LAC হল সেই বিন্দু ও মূলবিন্দুর সংযোজক সরলরেখার ঢাল। এখন, LTC রেখার আকৃতি বিবেচনা করলে বোঝা যায় যে, LAC প্রথমে কমবে, একটি বিন্দুতে সর্বনিম্ন হবে এবং তারপর বাড়বে অর্থাৎ LAC রেখাও U-আকৃতির হবে। মাত্রাবৃদ্ধির প্রতিদানের নিয়মের দরুনই LAC এরূপ U আকৃতির হয়ে থাকে।

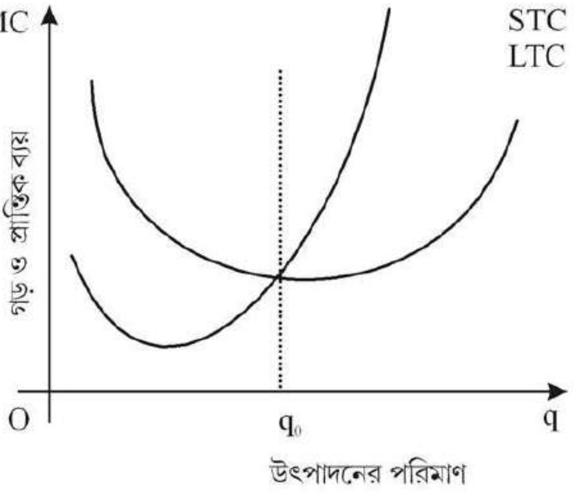

চিত্র ৫.৯

এখন, SAC এবং SMC-র মধ্যে আমরা যেরকম সম্পর্ক পেয়েছি, LAC ও LMC-র মধ্যেও অনুরূপ সম্পর্ক বিদ্যমান। সম্পর্কটি হল, যখন LAC কমে বা নিম্নমুখী হয়, তখন LMC < LAC। আবার যখন LAC বাড়ে, তখন LMC > LAC হয়। আর যখন LAC সর্বনিম্ন, তখন LMC = LAC হয়। আমরা ৫.৯ নং চিত্রে এই সম্পর্ক দেখিয়েছি। উৎপাদন q_0 অপেক্ষা কম হলে LAC কমে বা LAC রেখা নিম্নমুখী। তখন LMC রেখা LAC রেখার নীচে অবস্থান করছে। উৎপাদনের পরিমাণ q_0 অপেক্ষা বেশি হলে LAC বাড়ে বা LAC রেখা ঊর্ধ্বমুখী হয়। তখন LMC রেখা, LAC রেখার উপরে অবস্থান করে অর্থাৎ LMC > LAC হয়। আর উৎপাদনের পরিমাণ ঠিক q_0 হলে LAC সর্বনিম্ন হয় এবং ঐ সর্বনিম্ন বিন্দুতে LMC রেখা, LAC রেখাকে ছেদ করে অর্থাৎ LMC = LAC হয়।

তবে যদি উৎপাদনের সকল স্তরে সমহার মাত্রাবৃদ্ধির প্রতিদান কাজ করে, তাহলে LTC এবং উৎপাদন (q) একই হারে বাড়ে। ফলে LTC রেখা একটি মূলবিন্দুগামী সরলরেখা হয় (চিত্র ৫.১০ক)। এখন $LAC = \frac{LTC}{q}$ । যদি LTC এবং q একই হারে বাড়ে তাহলে LAC ধ্রুবক হবে। তখন LAC রেখা একটি অনুভূমিক সরলরেখা হবে। LAC ধ্রুবক হলে LMCও ধ্রুবক হবে এবং LAC = LMC হবে। অর্থাৎ সমহার প্রতিদানের ক্ষেত্রে LAC = LMC = ধ্রুবক হবে এবং LAC ও LMC রেখা সমাপতিত হবে। চিত্র ৫.১০ (ক ও খ)-এ এটা দেখানো হয়েছে।

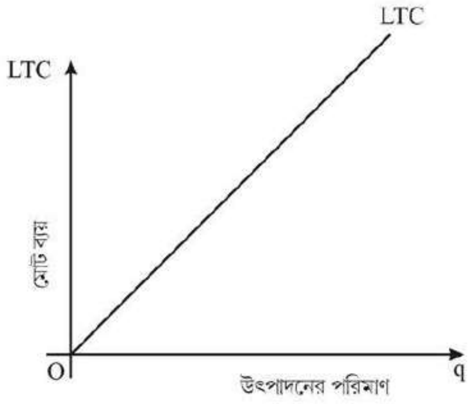

চিত্র ৫.১০ (ক)

চিত্র ৫.১০ (খ)

৫.৬ সারাংশ

1. স্বল্পকাল ও দীর্ঘকাল (Short run and Long run) : যে সময়কালের মধ্যে ফার্ম তার সমস্ত উপাদানের পরিমাণ পরিবর্তন করতে পারে না, সেই সময়কালকে স্বল্পকাল বলে। অন্যদিকে, যে সময়কালের মধ্যে ফার্ম তার সমস্ত উপাদানের পরিমাণ পরিবর্তন করতে পারে তাকে বলে দীর্ঘকাল।

2. স্বল্পকালীন স্থির, পরিবর্তনীয় ও মোট ব্যয় (Short run Fixed, Variable and Total Costs) : স্বল্পকালে উৎপাদনের উপাদানগুলিকে দু'ভাগে ভাগ করা যায় : স্থির উপাদান ও পরিবর্তনীয় উপাদান। স্থির উপাদানগুলির জন্য ফার্মের যে ব্যয় হয়, তাকে বলে মোট স্থির ব্যয়। অন্যদিকে, পরিবর্তনীয় উপাদানগুলির জন্য ব্যয় হল মোট পরিবর্তনীয় ব্যয়। মোট স্থির ব্যয় উপাদানের পরিমাণের উপর নির্ভর করে না, কিন্তু মোট পরিবর্তনীয় ব্যয় উৎপাদনের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। মোট স্থির ব্যয় এবং মোট পরিবর্তনীয় ব্যয়ের সমষ্টি হল মোট ব্যয়।

3. গড় স্থির ব্যয়, গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় এবং গড় ব্যয় (Average Fixed Cost, Avearage Variable Cost and Average Cost) : গড় স্থির ব্যয় হল দ্রব্যের ইউনিট প্রতি স্থির ব্যয়। মোট স্থির ব্যয়কে উংপাদনের পরিমাণ দিয়ে ভাগ করলে পাওয়া যায় গড় স্থির ব্যয়। তেমনি, গড় পরিবর্তনীয় হল দ্রব্যের ইউনিট প্রতি পরিবর্তনীয় ব্যয়। মোট পরিবর্তনীয় ব্যয়কে উৎপাদনের পরিমাণ দিয়ে ভাগ করলে পাওয়া যায় গড় পরিবর্তনীয় ব্যয়। আর গড় ব্যয় হল দ্রব্যের ইউনিট প্রতি ব্যয় অর্থাৎ মোট ব্যয়কে উৎপাদনের পরিমাণ দিয়ে ভাগ করে গড় ব্যয় পাওয়া যায়। অন্যভাবে, গড় ব্যয় হল গড় স্থির ব্যয় ও গড় পরিবর্তনীয় ব্যয়ের সমষ্টি। গড় স্থির ব্যয় (AFC) রেখা নিম্নমুখী অর্থাৎ উৎপাদনের পরিমাণ বাড়লে গড় স্থির ব্যয় কমবে। অন্যদিকে, উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ার সাথে সাথে গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় (AVC)

প্রথমের দিকে কমে এবং তারপর বাড়ে। অর্থাৎ AVC রেখা U আকৃতির হয়। গড় ব্যয়ও উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ার সাথে সাথে প্রথমের দিকে কমে এবং তারপর বাড়ে। অর্থাৎ AVC রেখার ন্যায় গড় ব্যয় (AC) রেখাও U-আকৃতির হয়ে থাকে।

4. গড় ব্যয় (AC) ও প্রান্তিক ব্যয়ের (MC) সম্পর্ক (Relation between Average Cost (AC) and Marginal Cost (MC) : যখন গড় ব্যয় (AC) কমে, তখন প্রান্তিক ব্যয় (MC) গড় ব্যয় অপেক্ষা কম (MC < AC)। যখন গড় ব্যয় বাড়ে, প্রান্তিক ব্যয় তখন গড় ব্যয় অপেক্ষা বেশি (MC > AC)। যখন গড় ব্যয় সর্বনিম্ন, তখন প্রান্তিক ব্যয় ও গড় ব্যয় সমান হয় (MC = AC)।

5. দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় রেখার আকৃতি (Shape of Long run Average Cost Curve) : স্বল্পকালীন গড় ব্যয় (SAC) রেখাগুলির বহিঃস্পর্শক হবে দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় (LAC) রেখা। এর তাৎপর্য হল, LAC কখনোই SAC অপেক্ষা বড় হবে না (LAC ≤ SAC)। যদি আমরা ধরে নিই যে, উৎপাদনের নিম্ন স্তরে বর্ধমান প্রতিদানের নিয়ম এবং তারপর হ্রাসমান প্রতিদানের নিয়ম কাজ করছে তাহলে দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় রেখা U আকৃতির হবে। অবশ্য উৎপাদন পদ্ধতিতে সব উৎপাদনের স্তরে সমহার মাত্রাবৃদ্ধির প্রতিদান কাজ করলে দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় রেখা অনুভূমিক হবে।

6. দীর্ঘকালীন মোট ব্যয় রেখার আকৃতি (Shape of Long run Total Cost Curve) : স্বল্পকালীন মোট ব্যয় (STC) রেখাগুলি থেকে আমরা দীর্ঘকালীন মোট ব্যয় (LTC) রেখা টানতে পারি। STC রেখাগুলির বহিঃস্পর্শক হবে LTC রেখা। এর তাৎপর্য হল, LTC কখনোই STC অপেক্ষা বেশি হবে না (LTC ≤ STC)। LTC রেখা মূলবিন্দু থেকে শুরু হবে এবং ঊর্ধ্বমুখী হবে। উৎপাদনের নিম্নস্তরে বর্ধমান প্রতিদানের নিয়ম এবং তারপর হ্রাসমান প্রতিদানের নিয়ম কাজ করলে LTC রেখা অনুভূমিক অক্ষের দিকে প্রথমে অবতল এবং তারপর উত্তল হবে। অবশ্য যদি উৎপাদনের সকল স্তরে সমহার মাত্রাবৃদ্ধির প্রতিদান কাজ করে তাহলে LTC রেখা মূলবিন্দুগামী ঊর্ধ্বমুখী সরলরেখা হবে।

7. দীর্ঘকালীন গড় ও প্রান্তিক ব্যয়ের সম্পর্ক (Relation between Long run Average and Marginal Costs) : স্বল্পকালীন AC ও MC-র মধ্যে যে সম্পর্ক রয়েছে, দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় (LAC) এবং দীর্ঘকালীন প্রান্তিক ব্যয়ের (LMC) মধ্যে একই সম্পর্ক বিদ্যমান। যখন LAC কমে, তখন LMC < LAC হয়। যখন LAC বাড়ে, তখন LMC > LAC হয়। যখন LAC সর্বনিম্ন তখন LAC = LMC হয়। উৎপাদনের প্রথম দিকে বর্ধমান প্রতিদানের নিয়ম এবং উৎপাদনের একটা স্তরের পর হ্রাসমান প্রতিদানের নিয়ম কাজ করলে এরূপ সম্পর্ক কাজ করে। অবশ্য যদি উৎপাদনের সকল স্তরে সমহার মাত্রাবৃদ্ধি প্রতিদান কাজ করে তাহলে LTC রেখা মূলবিন্দু থেকে সরলরেখা হবে এবং LAC ও LMC রেখা সমান্তরাল হবে এবং LAC ও LMC সমাপতিত হবে।

৫.৭ অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্নাবলি : প্রতিটি প্রশ্ন ২ নম্বরের : (Short Answer Type Questions : Each of 2 Marks)

১. উৎপাদনের ক্ষেত্রে স্বল্পকাল কাকে বলে?

২. উৎপাদনে দীর্ঘকাল বলতে কী বোঝেন?

৩. মোট স্থির ব্যয় বেয়ার আকৃতি কীরূপ?

৪. গড় স্থির ব্যয় কাকে বলে?

৫. গড় স্থির ব্যয়ের আকৃতি কীরূপ?

৬. গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় রেখার আকৃতি কেমন?

৭. গড় ব্যয় কাকে বলে?

৮. গড় ব্যয় রেখার আকৃতি কীরূপ?

৯. স্বল্পকালীন গড় ব্যয় রেখা কেন U আকৃতির?

১০. গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় রেখা U আকৃতি হয় কেন?

১১. প্রান্তিক ব্যয় কাকে বলে?

১২. মোড়ক রেখা কাকে বলে?

১৩. LAC রেখার আকৃতি সাধারণত কীরূপ?

১৪. LAC রেখা U আকৃতির হয় কেন?

১৫. সমাহার মাত্রাবৃদ্ধির প্রতিদানের ক্ষেত্রে LTC রেখার আকৃতি কীরূপ হবে?

১৬. স্বল্পকালীন MC রেখার আকৃতি কীরূপ?

১৭. সমহার মাত্রাবৃদ্ধির প্রতিদানের ক্ষেত্রে LAC রেখার আকৃতি কেমন হবে?

১৮. যখন AC কমে, তখন AC ও MC-র মধ্যে সম্পর্ক কীরূপ?

১৯. যখন AC সর্বনিম্ন, তখন AC ও MC-র মধ্যে সম্পর্ক কী?

২০. যখন AC কমে, তখন কী MC বাড়তে পারে?

মাঝারি দৈর্ঘ্যের উত্তরের প্রশ্নাবলি : প্রতিটি ৫ নম্বরের (Medium Answer Type Questions : Each of 5 Marks)

১. স্বল্পকালীন মোট ব্যয় রেখাগুলির আকৃতি বর্ণনা করুন।

২. AFC রেখার আকৃতি ব্যাখ্যা করুন।

৩. AC ও MC-র মধ্যে সম্পর্ক বর্ণনা করুন।

৪. মোট স্থির ব্যয় রেখার আকৃতি ব্যাখ্যা করুন।

৫. LAC ও LMC-র মধ্যে সম্পর্ক বিবৃত করুন।

৬. সমহার মাত্রাবৃদ্ধির প্রতিদানের ক্ষেত্রে LAC ও LMC-র সম্পর্ক ব্যাখ্যা করুন।

দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্নাবলি : প্রতি ১০ নম্বরের

(Long Answer Type Questions : Each of 10 Marks)

১. স্বল্পকালীন গড় ব্যয় রেখাগুলির আকৃতি ব্যখ্যা করুন।

২. স্বল্পকালীন মোট ব্যয় রেখা গড় ব্যয় রেখা অঙ্কন করুন।

৩. দেখান যে LAC রেখা SAC রেখাগুলির বহিঃস্পর্শক।

৪. SAC রেখা থেকে LAC রেখা অঙ্কন করুন।

৫. দেখান যে LTC রেখা STC রেখাগুলির বহিঃস্পর্শক।

৬. STC রেখা থেকে আপনি কীভাবে LTC রেখা অঙ্কন করবেন?

সারণি

p	q	TR	AR	MR
10	0	0	—	—
10	1	10	10	10
10	2	20	10	10
10	3	30	10	10
10	4	40	10	10
10	5	50	10	10

৫.৮ নির্বাচিত গ্রন্থাবলি

১. Salvatore, D. (2009) : Managerial Economics, Oxford University Press.

২. Maddala, G. S. & E. Miller (2007) : Microeconomics, Tata McGraw Hill

৩. Koutsoyiannis, A. (1979) : Modern Microeconomics, Macmillan

৪. Sarkhel, J & S. Salim (2016) : An Introduction to Business Economics, Book Syndicate Private Limited.

৫. ———, (2010) : Business Economics and Business Environment, Do.

৬. ———, (2010) : Economic Principles and Indian Economic Problems, Do.

একক ৬ ❑ বাজার

গঠন

৬.১ উদ্দেশ্য

৬.২ প্রস্তাবনা

৬.৩ বাজারের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

৬.৪ বাজারের শ্রেণিবিভাগ

৬.৫ পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে ফার্মের স্বল্পকালীন ভারসাম্য

৬.৬ ফার্মের স্বল্পকালীন জোগান রেখা : আয়-ব্যয় সমতার বিন্দু ও উৎপাদন বন্ধের বিন্দু।

৬.৭ পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে ফার্ম ও শিল্পের দীর্ঘকালীন ভারসাম্য

৬.৮ পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে দাম নির্ধারণ এবং চাহিদা ও জোগানের পরিবর্তনের প্রভাব

৬.৯ একচেটিয়া বাজার ও তা উদ্ভবের কারণ

৬.৯.১ একচেটিয়া বাজারে মোট, গড় ও প্রান্তিক আয়

৬.১০ একচেটিয়া বাজারে স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন ভারসাম্য

৬.১১ একচেটিয়া কারবারীর ভারসাম্যর বৈশিষ্ট্যসমূহ

৬.১১.১ একচেটিয়া ক্ষমতার মাত্রা ও তার পরিমাপ

৬.১১.২ একচেটিয়া কারবারির ক্ষমতার সীমা

৬.১২ দাম স্বতন্ত্রকারী একচেটিয়া কারবার

৬.১২.১ কখন দাম স্বতন্ত্রীকরণ সম্ভব

৬.১২.২ কখন দাম স্বতন্ত্রীকরণ লাভজনক

৬.১২.৩ দাম স্বতন্ত্রীকরণের প্রকারভেদ

৬.১২.৪ দাম স্বতন্ত্রকারী একচেটিয়া কারবারির ভারসাম্য

৬.১২.৫ দাম স্বতন্ত্রীকরণ কি সমর্থনযোগ্য বা কাম্য?

৬.১৩ পূর্ণ প্রতিযোগিতা ও একচেটিয়া বাজারের তুলনা

৬.১৪ একচেটিয়া প্রতিযোগিতার বাজারে ভারসাম্য

৬.১৫ অলিগোপলি বাজারের ধারণা ও বৈশিষ্ট্যসমূহ

৬. ১৬ সারাংশ

৬.১৭ অনুশীলনী

৬.১৮ নির্বাচিত গ্রন্থতালিকা

৬.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে শিক্ষার্থীরা জানতে পারবে

- বাজারের বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণিবিভাগ
- পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন ভারসাম্য
- একচেটিয়া বাজারের ভারসাম্যর বৈশিষ্ট্য
- একচেটিয়া কারবারীর দাম স্বতন্ত্রীকরণ প্রক্রিয়া
- একচেটিয়া প্রতিযোগিতার বাজারে ভারসাম্য
- অলিগোপলি বাজারের বৈশিষ্ট্য

৬.২ প্রস্তাবনা

ব্যষ্টিগত অর্থনীতির মূল কাজ হল কোনো দ্রব্য বা সেবাচার্যের দাম নির্ধারণ করা। এখন, কোনো দ্রব্যের দাম নির্ধারণের পিছনে দুটি প্রধান অর্থনৈতিক শক্তি কাজ করে। একটি হল চাহিদা এবং অপরটি হল জোগান। চাহিদা এবং জোগানের ঘাত প্রতিঘাতের দ্বারা কোনো দ্রব্যের দাম নির্ধারিত হয়। আমরা ২ ও ৩ নং এককে চাহিদা বিষয়টি আলোচনা করেছি। তেমনি উৎপাদন (একক ৪) ও ব্যয় তত্ত্বে (একক ৫) আমরা প্রকৃতপক্ষে দ্রব্যের জোগানের দিক্‌টি আলোচনা করেছি। কিন্তু এতেই দাম নির্ধারণের আলোচনা শেষ হয় না। এই চাহিদা ও জোগানের আপেক্ষিক শক্তি কেমন হবে তা বাজারের অবস্থার উপর নির্ভর করে। বাজারেই ক্রেতা ও বিক্রেতা মিলিত হয়। ক্রেতাদের দিক থেকে আসে চাহিদা, আর বিক্রেতারা দেয় জোগান। এখন, এই চাহিদা ও জোগানের শক্তির মাত্রা নির্ভর করে বাজারের ক্রেতা ও বিক্রেতার সংখ্যা, দ্রব্যের প্রকৃতি, বাজারের নতুন ফার্মের প্রবেশের উপর। এজন্যই আমরা দাম নির্ধারণের প্রক্রিয়া বুঝতে বাজার সম্পর্কে আলোচনা করে থাকি।

৬.৩ বাজারের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

সাধারণ অর্থে বাজার বলতে আমরা কোনো স্থানকে বুঝি যেখানে ক্রেতা ও বিক্রেতা মিলিত হয়ে দ্রব্য ও সেবাকার্যের কেনাবেচা করে। কিন্তু অর্থশাস্ত্রের বাজার বলতে কোনো স্থানকে বোঝায় না। এখানে দ্রব্যের নাম অনুসারে বাজারের নামকরণ হয়, যেমন, মাছের বাজার, পাটের বাজার, চালের বাজার, আলুর বাজার, শেয়ার বাজার, ঋণের বাজার প্রভৃতি। অর্থনীতিতে বাজার বলতে একটি আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে বোঝানো হয়। কোনো দ্রব্য বা সেবাকার্যের ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মধ্যে যে আর্থ-সামাজিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে তাকেই অর্থনীতিতে বাজার বলা হয়।

বাজারের কাজ প্রধানত দু'টি। এক, ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে বাজার। ক্রেতা দ্রব্যটি কিনে ভোগ করতে চায়, আর বিক্রেতা দ্রব্যটি বেচে রেভিনিউ পেতে চায়। বিক্রেতার উৎপাদন, আর ক্রেতার সেই উৎপন্ন দ্রব্যের ভোগ, এই দুয়ের মধ্যে ব্যবধান দূর করে বাজার। দুই, বাজারের আর একটি কাজ হল দ্রব্য বা সেবাকার্যের দাম নির্ধারণ করা। দাম নির্ধারিত হয় চাহিদা ও জোগানোর ঘাত-প্রতিঘাতের দ্বারা। চাহিদা আসে ক্রেতাদের নিকট থেকে, আর জোগান আসে উৎপাদন বা বিক্রেতাদের কাছ থেকে। দামের পিছনে এই দুই শক্তি বাজারেই কাজ করে।

৬.৪ বাজারের শ্রেণিবিভাগ

বিভিন্ন মাপকাঠিতে বাজারের শ্রেণিবিভাগ করা যেতে পারে। যেমন, বাজারের বিস্তৃতি বা পরিধি অনুসারে বাজারের স্থানীয় বাজার, জাতীয় বাজার এবং আন্তর্জাতিক বাজারে ভাগ করা যেতে পারে। আবার, দ্রব্যের প্রকৃতি অনুসারে বাজারের শ্রেণিবিভাগ করা হয়। এক্ষেত্রে দ্রব্যের নাম অনুসারে বাজারের শ্রেণিবিভাগ করা হয়, যেমন, আলুর বাজার, গমের বাজার, কাপড়ের বাজার, তুলোর বাজার, মাছের বাজার প্রভৃতি। তেমনি, সেবাকার্যের ক্ষেত্রে শ্রমের কাজার, ঋণের বাজার প্রভৃতি। আবার, বিক্রীত দ্রব্যটি ক্রেতাকে সঙ্গে সঙ্গে প্রদান করা হচ্ছে কি না, সেই অনুযায়ী বাজারকে তাৎক্ষণিক বাজার (spot market) এবং আগাম বাজার (forward market) এই দুইভাগে ভাগ করা যায়। আবার, চাহিদা অনুযায়ী দ্রব্যের জোগান খাপ খাওয়াতে কতটা সময় লাগে সেই অনুযায়ী মার্শাল বাজারকে অতি স্বল্পমেয়াদি, স্বল্পমেয়াদি, দীর্ঘমেয়াদি এবং অতি দীর্ঘমেয়াদি বাজারে ভাগ করেছেন। তবে অর্থনীতিতে বাজার সম্পর্কে আলোচনায় প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে বাজারের শ্রেণিবিভাগ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বাজারে প্রতিযোগিতার মাত্রা নির্ধারিত হয় মূলত দুটি বিষয়ের উপর : বাজারে ক্রেতা ও বিক্রেতার সংখ্যা এবং দ্রব্যের প্রকৃতির উপর। এই প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে বাজারের নিম্নলিখিত শ্রেণিবিভাগ করা হয় :

(i) পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার (Perfect competition) : যে বাজারে অসংখ্য ক্রেতা ও বিক্রেতা

একটি সমজাতীয় দ্রব্যের লেনদেন করে এবং যে বাজারে ক্রেতা ও বিক্রেতার প্রবেশ অবাধ, সেই বাজারকে পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার বলে।

(ii) একচেটিয়া বাজার (Monopoly) : যে বাজারে একজন মাত্র বিক্রেতা ও অনেক ক্রেতা থাকে তাকে একচেটিয়া বাজার বলে। এই বাজারে নতুন বিক্রেতা প্রবেশ করতে পারে না এবং বেচাকেনার দ্রব্যটির কোনো ঘনিষ্ঠ বিকল্প থাকে না।

(iii) একচেটিয়া প্রতিযোগিতা বাজার (Monopolistic Competition) : যে বাজারে অনেক ক্রেতা এবং অনেক বিক্রেতা থাকে এবং বেচাকেনার দ্রব্যগুলি একটু পৃথকীকৃত কিন্তু ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত, সেই বাজারকে একচেটিয়া প্রতিযোগিতার বাজার বলে।

(iv) অলিগোপলি বাজার (Oligopoly) : যে বাজারে কিছু সংখ্যক (few) বিক্রেতা এবং অনেক ক্রেতা থাকে, সেই বাজারকে অলিগোপলি বাজার বলে। এখানে বিক্রেতাদের সংখ্যা এমন যে, তাদের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা (interdependence) থাকে।

(v) একচেটিয়া ক্রেতার বাজার (Monopoly) : যে বাজার একজন মাত্র ক্রেতা এবং অনেক বিক্রেতা থাকে, সেই বাজারকে একচেটিয়া ক্রেতার বাজার বলে। এই বাজারকে একচেটিয়া বিক্রেতার বাজারের বিপরীত অবস্থা বলে ভাবা যেতে পারে।

(vi) দ্বিপাক্ষিক একচেটিয়া বাজার (Bilateral monopoly) : যে বাজারে একজন মাত্র ক্রেতা এবং একজন মাত্র বিক্রেতা থাকে, সেই বাজারকে দ্বিপাক্ষিক একচেটিয়া বাজার বলে। এটি একচেটিয়া বিক্রেতা এবং একচেটিয়া ক্রেতার বাজার (monopoly-monopsony market)। এরূপ বাজারে ক্রেতা-বিক্রেতার যৌথ দর কষাকষির দ্বারা দ্রব্য বা সেবাকার্যের দাম নির্ধারিত হয়।

৬.৫ পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে ফার্মের স্বল্পকালীন ভারসাম্য

যে বাজারে অসংখ্য ক্রেতা ও বিক্রেতা একটি সমজাতীয় দ্রব্যের কেনাবেচা করে সেই বাজরকে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার বলা হয়। এই বাজারে ফার্ম বা বিক্রেতার স্বল্পকালীন ভারসাম্য আলোচনার জন্য কয়েকটি অনুমান করে নিচ্ছি :

(i) এই বাজারে অসংখ্য ক্রেতা ও অসংখ্য বিক্রেতা আছে। ক্রেতা ও বিক্রেতার সংখ্যা এত বেশি যে, কোনো একজন ক্রেতা বা বিক্রেতা দ্রব্যটির চাহিদা বা জোগানের পরিবর্তন ঘটিয়ে এর বাজার দামকে প্রভাবিত করতে পারে না।

(ii) দ্রব্যটি সমজাতীয়। এই দুই বৈশিষ্ট্য বর্তমান থাকলে বাজারে দ্রব্যটির একটিমাত্র দাম চালু থাকবে।

সেক্ষেত্রে বিক্রি যে হারে বাড়বে, মোট রেভিনিউ (TR) সেই হারে বাড়বে। কারণ TR = p × q. এখন যদি p বা স্থির ধরি, $p = p_0$, তাহলে $TR = p_0 \times q$। এখানে q যে হারে বাড়বে, TRও সেই হারে বাড়বে। সুতরাং TR রেখা মূলবিন্দুগামী সরল রেখা হবে (চিত্র ৬.১)। আবার, TR ≡ p × q। এখন, AR বা গড় রেভিনিউ $\equiv \frac{TR}{q} \equiv \frac{p \times q}{q} \equiv q$. সুতরাং, গড় রেভিনিউ সর্বদাই দ্রব্যের দামের সমান। চিত্রে TR রেখার ঢাল হল গড় রেভিনিউ বা AR. অতএব, পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে p বা AR রেখা অনুভূমিক সরলরেখা হবে (চিত্র ৬.১)। এখন, MR বা প্রান্তিক রেভিনিউ হল বাড়তি এক একক বিক্রি থেকে রেভিনিউ। দাম স্থির থাকলে এই বাড়তি রেভিনিউ হবে দামের সমান অর্থাৎ P = MR হবে।

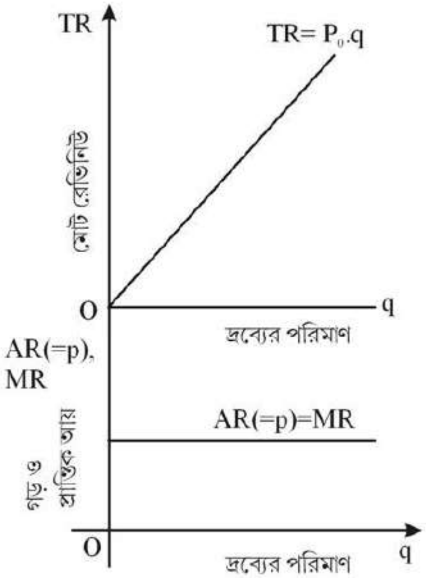

চিত্র ৬.১

তাহলে পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে p (=AR) = MR হবে এবং p = AR এবং MR রেখা অনুভূমিক হবে এবং তারা সমাপতিত হবে। আমাদের সারণিতে p = 10 ধরে একটা উদাহরণের সাহায্যে এটা দেখিয়েছি।

(iii) আমরা অনুমান করছি যে, প্রতিটি ফার্ম মুনাফা সর্বাধিক করতে চায়।

(iv) বাজারে যে-কোনো ফার্ম অবাধে প্রবেশ বা প্রস্থান করতে পারে।

(v) বাজারে কোনো সরকারি নিয়ন্ত্রণ নেই।

এই বৈশিষ্ট্যগুলি বর্তমান থাকলে তাকে আমরা বলে থাকি বিশুদ্ধ প্রতিযোগিতা (Pure Competition)। এর সঙ্গে নীচের আরো দুটি বৈশিষ্ট্য যোগ করলে সেই বাজারকে বলা হয় পূর্ণ প্রতিযোগিতা।

(vi) উপাদানের উপাদানগুলি সম্পূর্ণরূপে সচল। এর তাৎপর্য হল, প্রতিটি ফার্মই কোনো একটি নির্দিষ্ট উপাদান সমান দামে কিনছে।

(vii) বাজার সম্পর্কে ক্রেতা ও বিক্রেতার পূর্ণ জ্ঞান আছে।

এখন, একটি পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক ফার্ম স্বল্পকালে সেই বিন্দুতে ভারসাম্যে থাকবে যেখানে তার মুনাফা সর্বাধিক। মুনাফা সর্বাধিক করতে হলে দুটি শর্ত পূরণ হওয়া দরকার।

(i) p (=MR) = MC। এটি মুনাফা সর্বাধিক করার প্রয়োজনীয় বা প্রথম ক্রমের শর্ত। মুনাফা সর্বাধিক করার পর্যাপ্ত বা দ্বিতীয় ক্রমের শর্তটি হল :

(ii) ভারসাম্য বিন্দু ও তার সংলগ্ন অঞ্চলে MC রেখার ঢাল > 0 বা MC রেখাকে ঊর্ধ্বমুখী হতে হবে। যদি p (বা এখানে MR) > MC হয় তাহলে ফার্ম আরো উৎপাদন করে বাজারে বিক্রি করলে তার মুনাফা বাড়বে। আবার, p (=MR) < MC হলে ফার্ম বিক্রি কমালে তার মুনাফা বাড়বে। সুতরাং p (=MR) = MC হলে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক ফার্মের মুনাফা সর্বাধিক হবে। অবশ্য এর সঙ্গে দ্বিতীয় ক্রমের শর্তটিও পূরণ হতে হবে।

৬.২ নং চিত্রে আমরা এই ভারসাম্য দেখিয়েছি। p = MR একটি অনুভূমিক সরলরেখা কারণ পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে ফার্মের কাছে দাম বা p স্থির থাকে। এককভাবে কোনো ফার্ম দামকে পরিবর্তন করতে পারে না। এখন, ভারসাম্য অবস্থা নির্ণয় করার জন্য আমরা MC রেখা টানলাম। এই U-আকৃতির MC রেখা p = MR রেখাকে B_1 ও B বিন্দুতে ছেদ করেছে। সুতরাং, p(=MR) = MC শর্ত B_1 ও B বিন্দুতে পূরণ হয়েছে। কিন্তু B_1 বিন্দুটি ভারসাম্য বিন্দু নয় কেননা এখানে MC রেখার ঢাল < O বা MC রেখা নিম্নমুখী। ফার্মটি যদি B_1 বিন্দু থেকে আরো ডানদিকে যায় অর্থাৎ দ্রব্যের পরিমাণ বাড়ায়, তাহলে p > MC হয় এবং ফার্মের মুনাফা বাড়ে। এভাবে ফার্মটি B বিন্দুতে পৌঁছাবে। ঐ B বিন্দুতে ফার্মের ভারসাম্যর দুটি শর্তই পূরণ হয়েছে। সুতরাং B বিন্দু হল ভারসাম্য বিন্দু। ফার্মটি OA দামে Oq_0 পরিমাণ বিক্রি করবে। তখন মোট রেভিনিউ (TR) = p × q = OA × Oq_0 = □$OABq_0$। ফার্মের ব্যয়ের পরিমাণ জানার জন্য আমরা গড় ব্যয় রেখা (AC) টানলাম। Oq_0 পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে গড় ব্যয় = Fq_0. তাহলে, মোট ব্যয় (TC) = Fq_0 × Oq_0 = □$ODFq_0$. সুতরাং মুনাফা = □$OABq_0$ – □$ODFq_0$ = □ABFD। একে বলা হয় স্বাভাবিক মুনাফার অতিরিক্ত বা উদ্বৃত্ত মুনাফা, কেননা মোট ব্যয়ের (□$ODFq_0$) মধ্যে স্বাভাবিক মুনাফা অন্তর্ভুক্ত আছে।

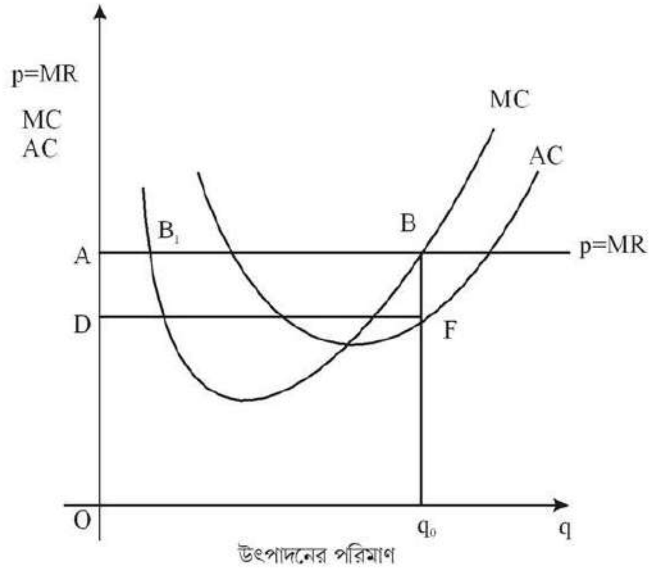

চিত্র ৬.২

অবশ্য পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে ফার্ম যে সর্বদাই স্বাভাবিকের অতিরিক্ত মুনাফা পাবে, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। স্বল্পকালে ফার্ম স্বাভাবিকের বেশি মুনাফা পেতে পারে, কেবলমাত্র স্বাভাবিক মুনাফা পেতে পারে অথবা এমনকি তার লোকসানও হতে পারে। তবে ঐ লোকসান TFC বা মোট স্থির ব্যয় অপেক্ষা বেশি হলে চলবে না। সেক্ষেত্রে ফার্ম উৎপাদন বন্ধ করে দেবে। স্বাভাবিক মুনাফা হল সেই সর্বনিম্ন মুনাফা যা না পেলে ফার্ম বা উদ্যোক্তা উৎপাদনের ও দ্রব্য বিক্রির কাজ নির্বাহ করবে না। অর্থাৎ, স্বাভাবিক মুনাফা হল উদ্যোগশক্তির জোগান দাম। তাই স্বাভাবিক মুনাফা ফার্মের মোট ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ, মোট ব্যয় = খাজনা + মজুরি + সুদ + স্বাভাবিক মুনাফা। সুতরাং ফার্ম উৎপাদন চালু রাখবে যদি সে অন্তত স্বাভাবিক মুনাফাটুকু পায়। তাই যখন মোট রেভিনিউ = মোট ব্যয় হয়, আমরা বলছি যে, ফার্ম স্বাভাবিক মুনাফা পাচ্ছে। এক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত মুনাফা শূন্য। সুতরাং মুনাফা স্বাভাবিকের চেয়ে কম হলে ফার্ম দীর্ঘকালে উৎপাদন বন্ধ করে দেবে।

আমরা ৬.৩ ও ৬.৪ নং চিত্রে আমরা ফার্মের আরো দু'রকমের স্বল্পকালীন ভারসাম্য দেখিয়েছি। প্রথমটিতে ফার্ম কেমলমাত্র স্বাভাবিক মুনাফা পাচ্ছে কিন্তু দ্বিতীয়টিতে ফার্ম স্বাভাবিক মুনাফা পাচ্ছে না। উভয় চিত্রেই ফার্মের ভারসাম্য বিন্দু B এবং Oq_0 হলে ভারসাম্য উৎপাদন ও বিক্রয়। তখন দাম বা গড় রেভিনিউ = OA বা Bq_0 এবং মোট রেভিনিউ = OA × Oq_0 = $\square OABq_0$। এখন, ৬.৩ নং চিত্রে গড় ব্যয় = AC = Bq_0 এবং মোট ব্যয় = AC × q = $Bq_0 \times Oq_0 = \square OABq_0$। সুতরাং এক্ষেত্রে, মোট রেভিনিউ = মোট ব্যয় এবং ফার্মটি কেবলমাত্র স্বাভাবিক মুনাফা পাচ্ছে যা মোট ব্যয়ের মধ্যেই ধরা আছে। কিন্তু ৬.৪ নং চিত্রে ফার্মের ভারসাম্য বিন্দুতে (B) গড় ব্যয় = F_1q_0 যা দাম অপেক্ষা বেশি ($F_1q_0 > Bq_0$ বা OA)। এক্ষেত্রে মোট ব্যয় = AC × q = $F_1q_0 \times Oq_0 = \square OD_1F_1q_0$। কিন্তু মোট রেভিনিউ =

□$OABq_0$। সুতরাং এক্ষেত্রে ফার্মের লোকসান = □ABF_1D_1। এই লোকসান যদি TFC অপেক্ষা কম হয় তাহলে স্বল্পকালে ফার্মটি উৎপাদন চালিয়ে যাবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, স্বল্পকালে একটি পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক ফার্ম উদ্বৃত্ত মুনাফা পেতে পারে, কেবলমাত্র স্বাভাবিক মুনাফা পেতে পারে অথবা ফার্মের লোকসানও হতে পারে। তবে যদি লোকসান হয়, সেই লোকসানের পরিমাণ TFC অপেক্ষা বেশি হওয়া চলবে না। স্বল্পকালে ফার্মটি উৎপাদন বন্ধ রাখলে তাকে TFC বহন করতে হয়। সুতরাং, লোকসানের পরিমাণ TFC অপেক্ষা কম বা সমান হলে ফার্মটির পক্ষে সেটি লাভজনক বা কম লোকসানের। সেজন্য ফার্মটি সেক্ষেত্রে উৎপাদন চালিয়ে যাবে। কিন্তু লোকসান TFC অপেক্ষা বেশি হলে ফার্মটি উৎপাদন বন্ধ করে দেবে। বিষয়টি আরো বিশদে আমরা পরের বিভাগে আলোচনা করেছি।

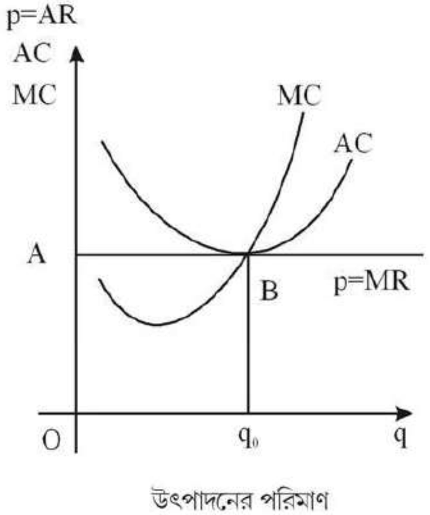

চিত্র ৬.৩

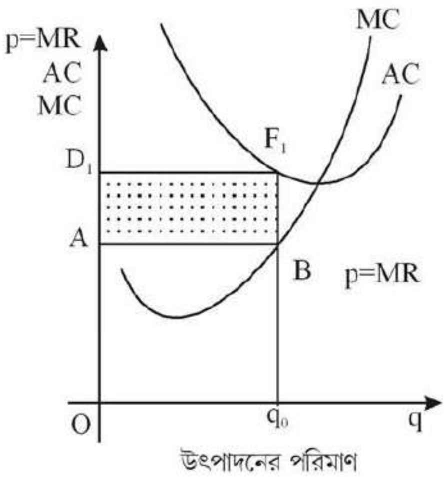

চিত্র ৬.৪

৬.৬ ফার্মের স্বল্পকালীন জোগান রেখা : আয়-ব্যয় সমতার বিন্দু ও উৎপাদন বন্ধের বিন্দু

বিভিন্ন দামে কোনো ফার্ম যে বিভিন্ন পরিমাণ দ্রব্য বিক্রি করতে চায়, সেই দাম ও জোগানের সমন্বয়ের সঞ্চারপথকে জোগান রেখা বলে। অন্যান্য বিষয় পরিবর্তিত অবস্থায় কোনো দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেলে সেই দ্রব্যের জোগান সাধারণত বাড়ে এবং দাম কমলে জোগান কমে। এটি জোগানের সূত্র বা নিয়ম। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক ফার্মের MC রেখা থেকে আমরা ফার্মের জোগান রেখা পেতে পারি। বিষয়টিকে ৬.৫ নং চিত্রে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

আমরা জানি, স্বল্পকালে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক ফার্মের ভারসাম্যের শর্ত হল দু'টি : (i) $p = MC$ এবং (ii) MC রেখাকে ঊর্ধ্বমুখী হতে হবে। চিত্রে আমরা MC রেখা এঁকেছি। ফার্মের ব্যয় ও মুনাফার পরিমাণ দেখানোর জন্য AC ও AVC রেখাও টেনেছি। এই AC ও AVC-র মধ্যে উল্লম্ব দূরত্ব হল AFC বা গড় স্থির ব্যয়।

এখন, দাম যদি OP_1 হয়, তাহলে $p = MC$ শর্ত পূরণ হয়েছে S_1 বিন্দুতে। ফার্মটি তখন Oq_1 পরিমাণ দ্রব্য জোগান দেবে। এক্ষেত্রে যেহেতু $p > AC$, ফার্মটি স্বাভাবিকের বেশি মুনাফা ভোগ করবে। আবার, দাম যদি OP_2 হয়, তাহলে $p = MC$ এই শর্ত পূরণ হয়েছে S_2 বিন্দুতে। সুতরাং তখন S_2 হল ভারসাম্য বিন্দু। সুতরাং OP_2 দামে ফার্মটি Oq_2 পরিমাণ দ্রব্য জোগান দেবে বা বিক্রি করবে। এক্ষেত্রে $p = AC$ বা $TR = TC$. সুতরাং ফার্মটি কেবলমাত্র স্বাভাবিক মুনাফা পাবে। এই S_2 বিন্দুকে বলা হয় **আয়-ব্যয় সমতার বিন্দু বা সমভঙ্গ বিন্দু**। এই বিন্দুতে $p = AC$ বা $TR = TC$ হয়ে থাকে। দাম যদি OP_2 অপেক্ষা কম হয়, তাহলে $P < AC$ এবং ফার্মটির লোকসান হবে। যেমন, OP_3 দামে $p = MC$ এই শর্ত পূরণ হয়েছে S_3 বিন্দুতে। এখানে S_3 হল ভারসাম্য বিন্দু। এই S_3 বিন্দুতে ফার্মটি AVC-র পুরোটা এবং AFC-র কিছুটা দামের দ্বারা পূরণ করতে পারছে। তবে AC-র সবটা পূরণ হচ্ছে না। সেক্ষেত্রে ফার্মটির লোকসান হচ্ছে বটে, তবে সেই লোকসান TFC অপেক্ষা কম। কেননা ফার্মটি এক্ষেত্রে TVC-র পুরোটা এবং TFC-র কিছুটা তার মোট রেভিনিউ দ্বারা পূরণ করতে পারছে। সেক্ষেত্রে ফার্মটির লোকসান TFC অপেক্ষা কম। কিন্তু স্বল্পকালে উৎপাদন বন্ধ রাখলে TFC-র পুরোটাই লোকসান হবে। সুতরাং ফার্মটি এখানে উৎপাদন চালিয়ে যাবে অর্থাৎ OP_3 দামে ফার্মটির জোগান হবে Oq_3 পরিমাণ। এখন, দাম যদি OP_4 হয়, তাহলে $p = MC$ হয়েছে S_4 বিন্দুতে। ঐ বিন্দুতে $p = AVC$ অর্থাৎ $p \times q = AVC \times q$ বা $TR = TVC$। সেক্ষেত্রে ফার্মটি কেবলমাত্র মোট পরিবর্তনীয় ব্যয় তুলতে পারছে। তাহলে ফার্মটির লোকসান হবে TFC পরিমাণ। আবার, ফার্মটি যদি উৎপাদন বন্ধ করে দেয়, তাহলেও তার লোকসান হবে TFC পরিমাণ। সুতরাং, এক্ষেত্রে ফার্মটি উৎপাদন চালাতেও পারে, আবার নাও চালাতে পারে। দাম OP_4 অপেক্ষা কম হলে ফার্ম উৎপাদন বন্ধ করে দেবে। AVC রেখার সর্বনিম্ন বিন্দুকে (S_4) বলা হয় উৎপাদন বন্ধের বিন্দু (Shut down point)। S_2 বিন্দুতে $p = AC$ বা $p \times q = AC \times q$ বা $TR = TC$. সেজন্য S_2 বিন্দুকে বলা হয় আয়-ব্যয় সমতার বিন্দু (break-even point)। এটি AC রেখার সর্বনিম্ন বিন্দুতে ঘটে থাকে। আার AVC রেখার সর্বনিম্ন বিন্দুতে $p = AVC$ হলে $TR = TVC$ হয়। ঐ বিন্দুকে বলা হয় উৎপাদন বন্ধের বিন্দু (Shut down point)।

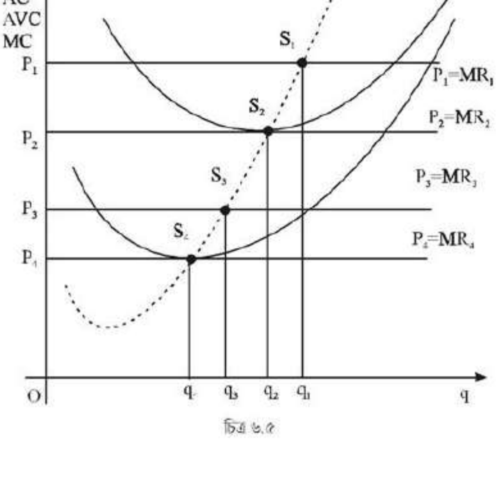

চিত্র ৬.৫

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ফার্মের MC রেখা থেকে দ্রব্যের দামের সঙ্গে জোগানের পরিমাণের একটা সম্পর্ক পাওয়া যায়। যেমন, দাম OP_1 হলে জোগান Oq_1 পরিমাণ, দাম OP_2 হলে জোগান Oq_2 পরিমাণ ইত্যাদি। সুতরাং ফার্মের MC রেখাই হল এর জোগান রেখা। কিন্তু সমগ্র MC রেখার ফার্মের জোগান রেখা নয়। যেমন, দাম OP_4 অপেক্ষা কম হলে ফার্মের জোগান শূন্য। দাম OP_4 অপেক্ষা বেশি হলে জোগান নির্ধারিত হয় MC রেখা দ্বারা। তাহলে O বিন্দু থেকে P_4 পর্যন্ত এবং তারপর S_4 থেকে MC রেখা বরাবর উপরের অংশটি হল ফার্মের জোগান রেখা। আমরা অবশ্য OP_4 অংশটুকু না ধরে AVC রেখার সর্বনিম্ন বিন্দু থেকে MC রেখার ঊর্ধ্বমুখী অংশটিকেই জোগান রেখা বলে ধরে থাকি। আমরা ফার্মের জোগান রেখাটিকে নিম্নরূপে লিখতে পারি :

$S = S(p)$ যেখানে $p \geq$ সর্বনিম্ন AVC।

$= 0$ যখন $p <$ সর্বনিম্ন AVC।

আমরা দেখছি যে, অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত অবস্থায় দাম বাড়লে জোগান বাড়ে এবং দাম কমলে জোগান কমে। এটাই জোগানের নিয়ম। এই নিয়ম কাজ করলে জোগান রেখা বাঁদিক থেকে ডানদিকে ঊর্ধ্বমুখী হবে। বাজারের সমস্ত ফার্মের জোগান রেখাগুলি অনুভূমিকভাবে যোগ করে আমরা শিল্পের জোগান রেখা বা বাজার জোগান রেখা পাই। বিভিন্ন ফার্মের জোগান পরস্পর নিরপেক্ষ হলে শিল্পের জোগান রেখাও ঊর্ধ্বমুখী হবে।

৬.৭ পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে ফার্ম ও শিল্পের দীর্ঘকালীন ভারসাম্য

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে স্বল্পকালে কোনো ফার্ম স্বাভাবিকের বেশি মুনাফা পেতে পারে, কেবলমাত্র স্বাভাবিক মুনাফা পেতে পারে, অথবা তার লোকসানও হতে পারে। অবশ্য স্বল্পকালে যদি লোকসান হয়, সেই লোকসান TFC অপেক্ষা বেশি হবে না। কারণ স্বল্পকালে লোকসান TFC অপেক্ষা বেশি হলে ফার্মটি উৎপাদন বন্ধ করে দেবে। দীর্ঘকালে অবশ্য প্রতিটি ফার্মই কেবলমাত্র স্বাভাবিক মুনাফা ভোগ করবে। যদি মুনাফা স্বাভাবিকের বেশি হয়, তাহলে সেই মুনাফা দেখে নতুন ফার্ম বাজারে প্রবেশ করবে। এই বাজারে প্রবেশ অবাধ (free entry)। নতুন ফার্ম বাজারে তাদের দ্রব্য নিয়ে এলে বাজারে দ্রব্যের জোগান বাড়বে। চাহিদা অপরিবর্তিত থাকলে দাম কমবে। ফলে ফার্মগুলির মুনাফা কমবে। যতক্ষণ পর্যন্ত স্বাভাবিকের উদ্বৃত্ত মুনাফা থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া চলতে থাকবে অর্থাৎ দ্রব্যের জোগান বাড়বে, দাম কমবে এবং মুনাফা কমবে। অবশেষে উদ্বৃত্ত মুনাফা বিলুপ্ত হবে। তেমনি, বিপরীত ক্ষেত্রে, ফার্মগুলির লোকসান হলে আর্থিকভাবে দুর্বল ফার্মগুলি বাজার থেকে বেরিয়ে যাবে। ফলে দ্রব্যের জোগান কমবে। চাহিদা অপরিবর্তিত থাকলে দ্রব্যের দাম বাড়বে। ফলে লোকসান কমবে। যতক্ষণ পর্যন্ত লোকসান থাকবে, ততক্ষণ এই প্রক্রিয়া চলতে থাকবে। অবশেষে লোকসান বলে কিছু থাকবে না। সুতরাং দীর্ঘকালে প্রতিটি ফার্ম কেবলমাত্র স্বাভাবিক মুনাফা ভোগ করবে।

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে সমগ্র শিল্পটিও দীর্ঘকালীন ভারসাম্যে থাকবে যখন প্রতিটি ফার্মই দীর্ঘকালীন ভারসাম্যে থাকবে। এটি সম্ভব হবে যখন প্রতিটি ফার্মই দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় (LAC) রেখার সর্বনিম্ন বিন্দুতে উৎপাদন করবে এবং p = LAC হবে। তখন প্রতিটি ফার্মই স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করবে এবং ফলে কোনো নতুন ফার্মের শিল্পে প্রবেশ করার বা পুরনো ফার্মের শিল্প থেকে বেরিয়ে যাবার প্রবণতা থাকবে না। ফলে সমগ্র শিল্পটি ভারসাম্যে থাকবে।

পূর্ণ প্রতিযোগিতার দীর্ঘকালে ফার্ম ও শিল্পের ভারসাম্য ৬.৬ নং চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বাজারের সমস্ত ফার্মের জোগান রেখাগুলিকে অনুভূমিকভাবে যোগ করে আমরা শিল্পের জোগান রেখা (SS) পেয়েছি। এই রেখা সাধারণত বাঁদিক থেকে ডানদিকে ঊর্ধ্বমুখী হয়। তেমনি, বাজারে সমস্ত ক্রেতাদের চাহিদা রেখাগুলিকে অনুভূমিক ভাবে যোগ করে আমরা বাজার চাহিদা রেখা (DD) পাই। এই রেখা বাঁদিক থেকে ডানদিকে নিম্নমুখী হয়। বাজার চাহিদা রেখা ও বাজার জোগান রেখা পরস্পরকে E বিন্দুতে ছেদ করেছে। তখন ভারসাম্যের দাম OP_0। এই দামে ফার্মগুলির ভারসাম্যের বিন্দু হল B। চিত্রে দেখা যাচ্ছে যে, ফার্মগুলি দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় (LAC) রেখার সর্বনিম্ন বিন্দুতে উৎপাদন করছে এবং কেবলমাত্র স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করছে। B বিন্দুতে p (=MR) = SMC = LMC। এই সমতা নির্দেশ করেছে যে, ফার্মগুলি সর্বাধিক মুনাফা অর্জন করছে। আবার, ভারসাম্য বিন্দুতে p = SAC = LAC অর্থাৎ ফার্মগুলি কেবলমাত্র স্বাভাবিক মুনাফা পাচ্ছে। ফলে নতুন ফার্মের বাজারে প্রবেশের বা পুরনো ফার্মের বাজার ছেড়ে যাওয়ার কোনো প্রবণতা থাকবে না। ফলে সমগ্র শিল্পটি দীর্ঘকালে ভারসাম্যে থাকবে। সুতরাং, দীর্ঘকালীন ভারসাম্যর শর্ত হল :

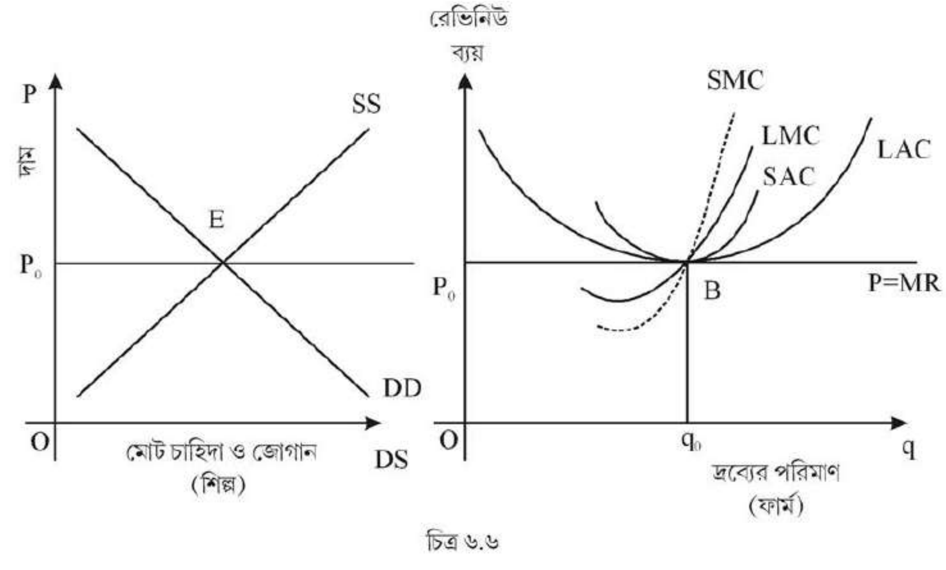

চিত্র ৬.৬

p (= MR) = SMC = LMC = SAC = LAC।

লক্ষণীয় যে, দীর্ঘকালে পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে প্রতিটি ফার্ম গড় ব্যয় রেখার সর্বনিম্ন বিন্দুতে উৎপাদন করবে অর্থাৎ দীর্ঘকালে ফার্মের উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার হবে এবং সম্পদের সর্বোত্তম (optimum) ব্যবহার ঘটবে। এজন্য পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারকে সবচেয়ে দক্ষ বাজার (most efficient form of market) বলা হয়।

৬.৮ পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে দাম নির্ধারণ এবং চাহিদা ও জোগানের পরিবর্তনের প্রভাব

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ভারসাম্য দাম নির্ধারিত হয় চাহিদা ও জোগানের ঘাত-প্রতিঘাতের দ্বারা। যে দামে বাজারের মোট চাহিদা ও মোট জোগান পরস্পর সমান হয়, সেই দামকেই ভারসাম্য দাম বলা হয়। এখন, পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে অসংখ্য ক্রেতা ও অসংখ্য বিক্রেতা থাকে। বাজারের সমস্ত ব্যক্তিগত চাহিদা রেখাগুলিকে অনুভূমিকভাবে যোগ করে আমরা মোট বা বাজার চাহিদা রেখা পাই। এই চাহিদা রেখা বাঁদিক থেকে ডানদিকে নিম্নমুখী। তেমনি, বাজারের সমস্ত বিক্রেতা বা ফার্মের জোগান রেখাগুলিকে অনুভূমিকভাবে যোগ করে আমরা মোট বা বাজার জোগান রেখা পেতে পারি। এই বাজার জোগান রেখা সাধারণত বাঁদিক থেকে ডানদিকে ঊর্ধ্বমুখী হবে। বাজার চাহিদা রেখা ও বাজার জোগান রেখা যে বিন্দুতে পরস্পরকে ছেদ করে, সেই বিন্দুতে ভারসাম্য দাম নির্ধারিত হবে।

৬.৭ নং চিত্রে DD হল বাজার চাহিদা রেখা এবং SS হল বাজার জোগান রেখা। এই দুই রেখা পরস্পরকে E বিন্দুতে ছেদ করেছে। ঐ বিন্দুতে মোট চাহিদা = মোট জোগান = P_0E। সুতরাং, E বিন্দু হল ভারসাম্য বিন্দু এবং OP_0 হল ভারসাম্য দাম। দেখানো যায় যে, চাহিদা রেখা নিম্নমুখী এবং জোগান রেখা ঊর্ধ্বমুখী হলে ভারসাম্যটি সর্বদাই স্থায়ী বা স্থিতিশীল (stable) হবে। এর অর্থ হল, ভারসাম্য অবস্থা থেকে কোনো কারণে বিচ্যুতি ঘটলে বাজারের শক্তি পুনরায় বাজারটিকে ভারসাম্য অবস্থায় নিয়ে আসবে।

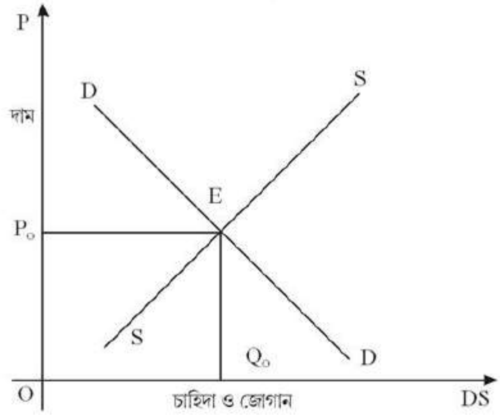

চিত্র ৬.৭

এখন, চাহিদা অথবা জোগানের অবস্থার পরিবর্তন ঘটলে ভারসাম্য দামের এবং দ্রব্যের পরিমাণের পরিবর্তন ঘটবে। প্রথমে আমরা কেবলমাত্র চাহিদার পরিবর্তন ঘটলে ভারসাম্য দামের কীরূপ পরিবর্তন ঘটবে তা বিবেচনা করছি। মনে করি, চাহিদা বেড়েছে। সেক্ষেত্রে সমগ্র চাহিদা রেখা ডানদিকে সরে যাবে। ধরা যাক নতুন চাহিদা রেখা হল D_1D_1 (চিত্র ৬.৮)। জোগান রেখা অপরিবর্তিত থাকছে। ফলে নতুন ভারসাম্য বিন্দু হল E_1 এবং ভারসাম্য দাম হল OP_1। সুতরাং, জোগান অপরিবর্তিত অবস্থায় কেবলমাত্র চাহিদা বাড়লে দ্রব্যের দাম বাড়বে। দ্রব্যের বিক্রিও বাড়বে ($OQ_1 > OQ_0$)। তেমনি, চাহিদা কমলে চাহিদা রেখা বাঁদিকে সরে আসবে। মনে করি, নতুন চাহিদা রেখা হল D_2D_2। তখন ভারসাম্য বিন্দু হল E_2 এবং ভারসাম্য দাম হল OP_2। অথাৎ জোগান অপরিবর্তিত রেখে চাহিদা কমলে ভারসাম্য দাম কমবে এবং দ্রব্যের ভারসাম্য পরিমাণও কমবে ($OQ_2 < OQ_0$)।

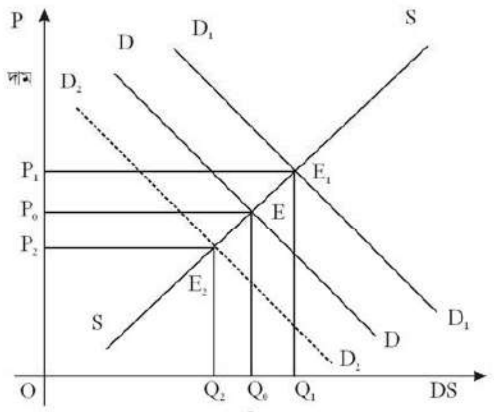

চিত্র ৬.৮

এখন, শুধুমাত্র জোগান পরিবর্তিত হলে ভারসাম্য দাম এবং দ্রব্যের পরিমাণের কীরূপ পরিবর্তন হবে তা দেখা যাক। মনে করি, প্রাথমিক চাহিদা ও জোগান রেখা ছিল যথাক্রমে DD ও SS (চিত্র ৬.৯)। তখন ভারসাম্য বিন্দু ছিল E এবং OP_0 ছিল ভারসাম্য দাম এবং OQ_0 ছিল ভারসাম্য পরিমাণ। এখন, মনে করি, চাহিদা অপরিবর্তিত অবস্থায় কেবলমাত্র দ্রব্যের জোগান বাড়ল। সেক্ষেত্রে জোগান রেখা ডানদিকে সরে যাবে। মনে করি, নতুন জোগান রেখা হল S_1S_1। তখন ভারসাম্য বিন্দু হল E_1। এই বিন্দুতে ভারসাম্য দাম কমে হল OP_1 এবং ভারসাম্য পরিমাণ বেড়ে হল OQ_1। অর্থাৎ, চাহিদা অপরিবর্তিত রেখে কেবলমাত্র জোগান বাড়লে ভারসাম্য দাম কমবে এবং ভারসাম্য পরিমাণ বাড়বে। তেমনি, জোগান কমলে জোগান রেখা বাঁদিকে সরে যাবে। মনে করি, নতুন জোগান রেখা হল S_2S_2। তখন ভারসাম্য দাম বেড়ে OP_2 এবং ভারসাম্য পরিমাণ কমে হবে OQ_2। অর্থাৎ, চাহিদা অপরিবর্তিত অবস্থায় জোগান কমলে ভারসাম্য দাম বাড়বে এবং দ্রব্যের ভারসাম্য পরিমাণ কমবে।

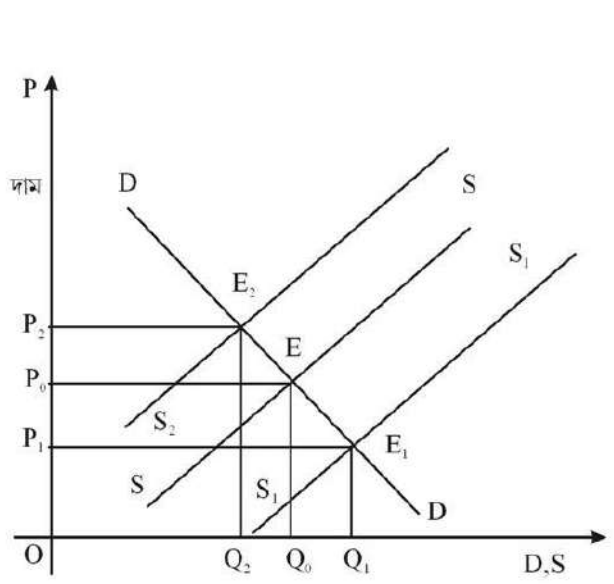

চিত্র ৬.৯

চাহিদা ও জোগান উভয়ই পরিবর্তিত হলে ভারসাম্য দাম ও ভারসাম্য পরিমাণ কমতে পারে, বাড়তে পারে বা একই থাকতে পারে। সেটি নির্ভর করবে চাহিদা ও জোগানের পরিবর্তনের দিক ও হারের উপর। মনে করি, প্রাথমিক চাহিদা রেখা ছিল DD এবং প্রাথমিক জোগান রেখা ছিল SS। তখন ভারসাম্য দাম ছিল OP_0 (চিত্র ৬.১০) এবং ভারসাম্য পরিমাণ ছিল OQ_0। এখন,যদি চাহিদা ও জোগান একই হারে বাড়ে তাহলে নতুন ভারসাম্য বিন্দু হবে E_1। তখন ভারসাম্য দাম একই থাকছে (OP_0), শুধু ভারসাম্য পরিমাণ বাড়বে ($OQ_1 > OQ_0$)। যদি চাহিদা ও জোগান একই হারে কমে, তাহলে নতুন ভারসাম্য বিন্দু হবে E_2। তখন ভারসাম্য দাম একই থাকবে (OP_0) কিন্তু ভারসাম্য পরিমাণ কমবে ($OQ_2 < OQ_0$)। কিন্তু যদি চাহিদা ও জোগান উভয়েই কমে এবং চাহিদা বেশি হারে কমে, তাহলে ভারসাম্য দাম কমবে। আর যদি জোগান বেশি হারে কমে, তাহলে ভারসাম্য দাম বাড়বে। তেমনি, যদি চাহিদা ও জোগান উভয়েই বাড়ে কিন্তু চাহিদা বেশি হারে বাড়ে, তাহলে ভারসাম্য দাম বাড়বে। আর যদি জোগান বেশি হারে বাড়ে তাহলে ভারসাম্য দাম কমবে। আবার, যদি চাহিদা বাড়ে ও জোগান কমে তাহলে ভারসাম্য দাম অবশ্যই বাড়বে এবং যদি চাহিদা কমে ও জোগান বড়ে, তাহলে ভারসাম্য দাম অবশ্যই কমবে।

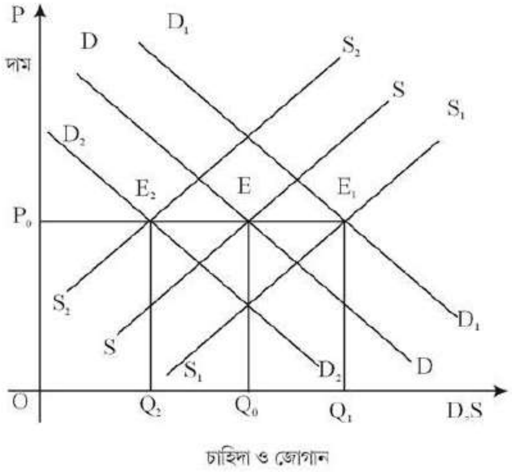

চিত্র ৬.১০

৬.৯ একচেটিয়া বাজার ও তা উদ্ভবের কারণ

যে বাজারে একজন মাত্র বিক্রেতা এবং অনেক ক্রেতা থাকে, দ্রব্যটির কোনো ঘনিষ্ঠ বিকল্প নেই এবং যে বাজারে প্রতিযোগী ফার্মের প্রবেশের বাধা আছে, সেই বাজারকে একচেটিয়া বাজার বলে। একচেটিয়া বাজারে ফার্ম ও শিল্পের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। এখানে একচেটিয়া ফার্মই শিল্প। একচেটিয়া বাজারের সংজ্ঞা থেকেই এই বাজারের বৈশিষ্টগুলি জানা যায়। সংক্ষেপে সেগুলি হল : (i) একজন বিক্রেতা, (ii) অনেক ক্রেতা, (iii) বাজারে নতুন ফার্মের প্রবেশের বাধা, (iv) দ্রব্যটির ঘনিষ্ঠ বিকল্প দ্রব্য নেই। (v) বিকল্প দ্রব্য ও প্রতিযোগী ফার্ম বা বিক্রেতা নেই বলে এই বাজারে বিজ্ঞাপন ব্যয় নেই, (vi) ফার্ম ও শিল্পের মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই। একচেটিয়া ফার্মই এখানে শিল্প।

একচেটিয়া অবস্থা উদ্ভবের কারণসমূহ (Causes of emergence of monopoly) : বাস্তবে একচেটিয়া অবস্থার উদ্ভব নানা কারণে হতে পারে। (i) দ্রব্যটির উৎপাদন কৌশল কেবলমাত্র একটি ফার্মের জানা থাকলে সেই ফার্ম একচেটিয়া সুবিধা ভোগ করবে। (ii) দ্রব্যটির উৎপাদনে যে গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামাল লাগে তা কেবলমাত্র একটি ফার্মের হাতে থাকলে একচেটিয়া অবস্থার উদ্ভব হবে। (iii) সরকার কোনো একটি ফার্মকে কোনো দ্রব্য উৎপাদন, বণ্টন, আমদানি বা রপ্তানির অনুমতি দিলে ঐ ফার্ম ঐ সকল ক্ষেত্রে একচেটিয়া সুবিধা ভোগ করবে। (iv) যে সকল দ্রব্য পুনরুৎপাদন করা যায় না (যেমন, রবীন্দ্রনাথের কবিতার পাণ্ডুলিপি, পিকাসোর আসল ছবি প্রভৃতি), সে সকল দ্রব্যের ক্ষেত্রে মালিক একচেটিয়া ক্ষমতা ভোগ করবে। (v) বাজারের আয়তন এমন ছোট যে দ্বিতীয় ফার্ম ঐ বাজারে লাভজনক ভাবে উৎপাদন ও বিক্রি করতে পারছে না। সেক্ষেত্রে ঐ বাজারে একচেটিয়া অবস্থার উদ্ভব হবে। (vi) প্রাকৃতিক সুবিধাজনিত কারণে কোনো ফার্ম কোনো দ্রব্য উৎপাদনে একচেটিয়া সুবিধা ভোগ করতে পারে। (vii) পেটেন্ট আইনের মাধ্যমেও কোনো ফার্ম একচেটিয়া অধিকার ভোগ করতে পারে। (viii) প্রতিযোগিতার দ্বারা যদি কোনো

ফার্ম অন্যান্য সকল প্রতিযোগী ফার্মকে বাজার থেকে বিতাড়িত করে, তাহলে ঐ বাজারে একচেটিয়া প্রতিষ্ঠিত হবে।

৬.৯.১ একচেটিয়া বাজারে মোট, গড় ও প্রান্তিক আয়

আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা প্রথমে **গড় রেভিনিউ (AR), প্রান্তিক রেভিনিউ (MR) এবং চাহিদার দামগত স্থিতিস্থাপতার মধ্যে সম্পর্ক** আলোচনা করব। গড় রেভিনিউ হল দ্রব্যের ইউনিট প্রতি রেভিনিউ। যদি কোনো দ্রব্যের দামকে p দ্বারা এবং বিক্রির পরিমাণকে q দ্বারা চিহ্নিত করি, তাহলে মোট রেভিনিউ, $R = p \times q$. অতএব গড় রেভিনিউ বা $AR = \frac{R}{q} = \frac{p \times q}{q} = p$. অতএব প্রান্তিক রেভিনিউ বা MR হল এক একক বিক্রির পরিবর্তনের ফলে মোট রেভিনিউর (R) পরিবর্তন। আমরা পরিবর্তন বোঝাতে 'Δ' চিহ্ন ব্যবহার করলে $MR = \frac{\Delta R}{\Delta q}$। আর চাহিদার দামগত স্থিতিস্থাপকতা (e) হল, অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত অবস্থায় কোনো দ্রব্যের দামের 1 শতাংশ পরিবর্তনের ফলে ঐ দ্রব্যের চাহিদার যত শতাংশ পরিবর্তন হয়।

অতএব, $$e = \frac{\frac{\Delta q}{q} \times 100}{\frac{\Delta p}{p} \times 100} = \frac{\Delta q}{q} \times \frac{P}{\Delta P} = \frac{p}{q} \cdot \frac{\Delta q}{\Delta p}.$$

চাহিদার নিয়ম কার্যকরী হলে Δp এবং Δq বিপরীত চিহ্নযুক্ত হবে। সুতরাং, $\frac{\Delta q}{\Delta p} < 0$। সুতরাং, e-এর মান ঋণাত্মক। e-এর পরম মান $= |e| = -\frac{p}{q} \cdot \frac{\Delta q}{\Delta p}$।

এখন, AR (বা p), MR ও |e|-এর মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা করা যেতে পারে।

আমরা জানি, $R = p \times q \quad \therefore \Delta R = p.\Delta q + q.\Delta p$

বা, $$\frac{\Delta R}{\Delta q} = p + q \cdot \frac{\Delta p}{\Delta q} = p\left(1 + \frac{q}{p} \cdot \frac{\Delta q}{\Delta p}\right) = p\left(1 - \frac{1}{-\frac{p}{q} \cdot \frac{\Delta q}{\Delta p}}\right).$$

$$\therefore MR = p\left(1-\frac{1}{|e|}\right) \text{ বা, } MR = AR\left(1-\frac{1}{|e|}\right) \text{।}$$

এটিই হল AR (বা p), MR ও চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার মধ্যে সাধারণ সম্পর্ক। আমরা জানি, পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে p বা AR রেখা অনুভূমিক সরলরেখা। সেক্ষেত্রে $e = \infty$ (অসীম)। সুতরাং, পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে, $MR = p\left(1-\frac{1}{\infty}\right) = p$. তাহলে, আমাদের সাধারণ সম্পর্কটি শুধু একচেটিয়া বাজার নয়, যে-কোনো অপূর্ণাঙ্গ বাজারের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

সম্পর্কটি রেখাচিত্রের মাধ্যমেও প্রামণ করা যায়। ৬.১০.ক নং চিত্রে আমরা p বা AR এবং MR রেখা টেনেছি। আলোচনা সহজ রাখার জন্য আমরা এদের সরলরেখা বলে ধরে নিয়েছি। চিত্রে যখন দাম বা AR হল OA, তখন চাহিদার পরিমাণ = OB. সুতরাং মোট রেভিনিউ TR = OA × OB = □OACB। আবার, TR = MR রেখার নীচের অঞ্চল = ক্ষেত্রফল ODEB। সুতরাং, ক্ষেত্রফল OACB = ক্ষেত্রফল ODEB।

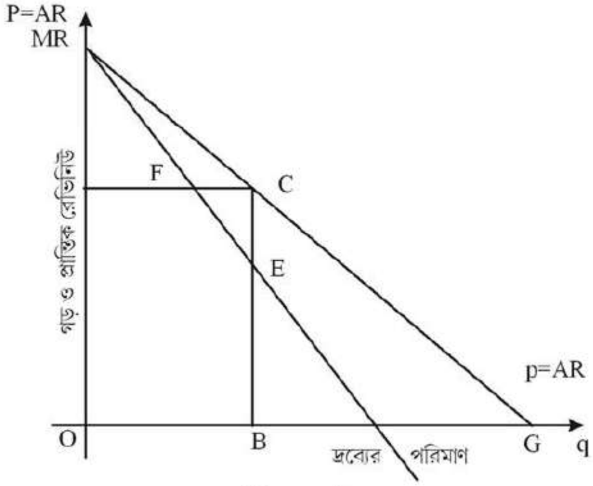

চিত্র ৬.১০/ক

অর্থাৎ $\Delta ADF = \Delta CEF$।

আবার, এই দুই ত্রিভুজের মধ্যে তুলনা করে পাই, $\angle DAF = \angle ECF$ (সমকোণ)।

$\angle ADF$ = একান্তর $\angle CEF$ এবং

$\angle AFD$ = বিপ্রতীপ $\angle EFC$। অতএব ত্রিভুজদ্বয় সদৃশকোণী। আবার, ওদের ক্ষেত্রফল সমান। সুতরাং ত্রিভুজদ্বয় সর্বসম।

$\therefore CE = AD.$

এখন, C বিন্দুতে, MR = BE = BC − CE = OA − AD

$\therefore MR = OA\left(1-\frac{AD}{OA}\right) = OA\left(1-\frac{1}{OA/AD}\right)$। এখন $OA/AD = \frac{GC}{DC} = |e|$ এবং OA = p বা AR.

সুতরাং, $MR = p\left(1-\frac{1}{|e|}\right) = AR\left(1-\frac{1}{|e|}\right)$।

p বা AR রেখা দেওয়া থাকলে আমরা এই সম্পর্ক থেকে MR রেখা সহজেই পেতে পারি (চিত্র ৬.১১)। AR রেখার D বিন্দুতে $e = \infty$।

$\therefore MR = AR\left(1-\frac{1}{\infty}\right) = AR = p$. সুতরাং, AR = p রেখার ন্যায় MR রেখাও D বিন্দু থেকে শুরু হবে। আবার, H যদি p = AR রেখার মধ্যবিন্দু হয়, তাহলে ঐ বিন্দুতে $|e| = 1$.

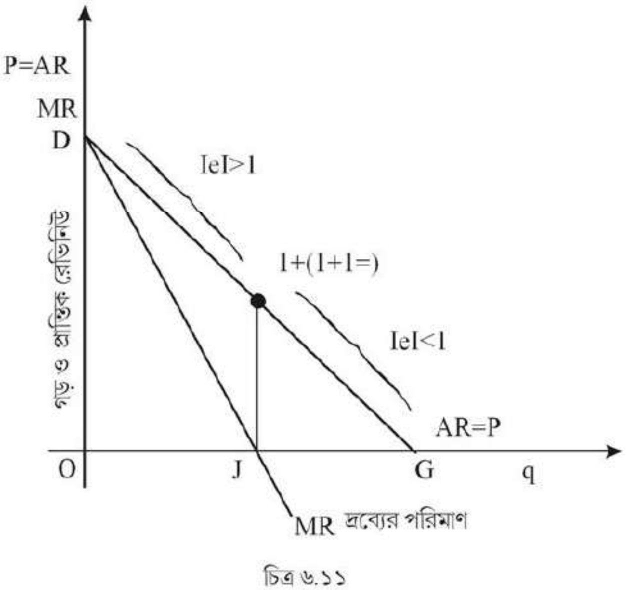

চিত্র ৬.১১

$\therefore MR = AR\left(1-\frac{1}{1}\right) = 0$. আবার, H যদি AR রেখার মধ্যবিন্দু হয়, তাহলে J বিন্দু OG দূরত্বের মধ্যবিন্দু হবে। অর্থাৎ MR রেখা J বিন্দু দিয়ে যাবে কেননা ঐ বিন্দুতে MR = 0 হবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, p = AR রেখা সরলরৈখিক হলে MR রেখা AR রেখার অনুভূমিক ছেদিতাংশের মধ্যবিন্দু দিয়ে যাবে।

এখন, D ও H-এর মধ্যে যে-কোনো বিন্দুতে $|e| > 1$. $\therefore MR = AR\left(1-\frac{1}{|e|}\right) > 0$ হবে। তেমনি, H ও G-এর মধ্যে যে-কোনো বিন্দুতে $|e|<1$ হয়। তখন, $MR = AR\left(1-\frac{1}{|e|}\right) < 0$ হবে। এই শর্তগুলি মেনেই আমরা ৬.১১ নং চিত্রে MR রেখা টেনেছি।

□ TR, AR, MR এবং চাহিদার দামগত স্থিতিস্থাপকতা (TR, AR,MR and Price Elasticity of Demand)

আমরা জানি, $MR = AR\left(1-\frac{1}{|e|}\right)$ বা $MR = p\left(1-\frac{1}{|e|}\right)$ যেহেতু p = AR। এই সম্পর্ক থেকেই আমরা TR, AR, MR ও |e|-এর মধ্যে সম্পর্ক পেতে পারি এবং AR বা MR রেখা দেওয়া থাকলে আমরা TR রেখা টানতে পারি। ৬.১২ নং চিত্রে এটা দেখানো হয়েছে। যেহেতু TR-এর পরিবর্তনকেই MR বলা হয়, MR ধনাত্মক হলে TR বাড়বে। তেমনি, MR ঋণাত্মক হলে TR কমবে। এখন, উপরের সম্পর্ক থেকে আমরা জানি যে, $|e| > 1$ হলে $MR > 0$ হয়, $|e|<1$ হলে $MR < 0$ হয় এবং $|e|=1$ হলে $MR = 0$ হয়। তাহলে আমরা বলতে পারি :

(i) যদি চাহিদা স্থিতিস্থাপক ($|e| > 1$) হয়, তাহলে দাম কমলে মোট রেভিনিউ বাড়বে এবং দাম বাড়লে মোট রেভিনিউ কমবে।

(ii) যদি চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হয় ($|e| < 1$), তাহলে দাম কমলে মোট রেভিনিউ কমবে এবং দাম বাড়লে মোট রেভিনিউ বাড়বে।

(iii) যদি চাহিদা একক স্থিতিস্থাপক ($|e| = 1$) হয়, তাহলে দামের পরিবর্তনের ফলে TR-এর কোনো পরিবর্তন হবে না কারণ তখন $MR = AR\left(1-\frac{1}{1}\right) = 0$ হয়। সেক্ষেত্রে TR স্থির থাকে বা সর্বাধিক হয়।

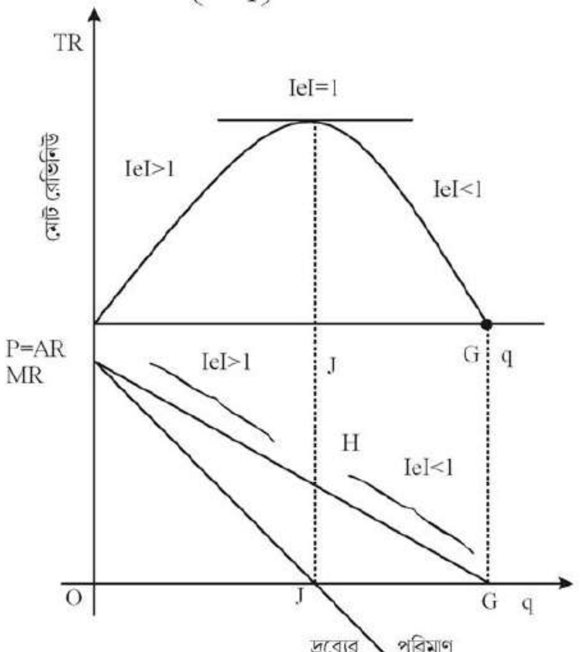

চিত্র ৬.১২

এই বিষয়গুলিই ৬.১২ নং চিত্রে দেখানো হয়েছে। দ্রব্যের OJ পরিমাণ বিক্রি পর্যন্ত $|e| > 1$ বরং সেজন্য $MR > 0$ এবং TR বাড়ছে। J বিন্দু ডানদিকে $|e| < 1$ হয়। ফলে $MR < 0$ এবং TR কমছে। যখন বিক্রির পরিমাণ ঠিক OJ, তখন $|e| = 1$ এবং $MR = 0$ হয়। সেক্ষেত্রে TR স্থির থাকে বা সর্বাধিক হয়।

৬.১০ একচেটিয়া বাজারে স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন ভাসাম্য

একচেটিয়া কারবারির লক্ষ্য হল মুনাফা সর্বাধিক করা। সুতরাং ঐ কারবারি সেই বিন্দুতে ভারসাম্য অবস্থায় থাকবে যেখানে তার মুনাফা সর্বাধিক। একচেটিয়া বাজারে মুনাফা সর্বাধিক করার শর্ত দুটি।

(i) প্রয়োজনীয় বা প্রথম ক্রমের শর্ত : $MR = MC$

(ii) পর্যাপ্ত বা দ্বিতীয় ক্রমের শর্ত : MC রেখার ঢাল > MR রেখার ঢাল অর্থাৎ MC রেখা যেন ভারসাম্য বিন্দুতে MR রেখাকে নীচের দিক থেকে ছেদ করে।

☐ স্বল্পকালীন ভারসাম্য (Short run equilibrium) :

আমরা একচেটিয়া কারবারির ভারসাম্য MR ও MC রেখার সাহায্যে দেখাতে পারি (চিত্র ৬.১৩)।

আমরা জানি, $MR = AR\left(1-\frac{1}{|e|}\right)$। সুতরাং, AR রেখা দেওয়া থাকলে আমরা MR রেখা সহজেই টানতে পারি। AR রেখা সরলরৈখিক হলে MR রেখাও সরলরৈখিক হবে এবং AR রেখার অনুভূমিক ছেদিতাংশের মধ্যবিন্দু দিয়ে MR রেখা যাবে। আমরা এই চিত্রে MC রেখাও টেনেছি। চিত্রে E বিন্দুতে MC রেখা MR রেখাকে নীচের দিক থেকে ছেদ করেছে। সুতরাং E বিন্দুতে ভারসাম্যের উভয় শর্তই পূরণ হয়েছে। তাই E বিন্দু হল ভারসাম্য বিন্দু। একচেটিয়া ফার্ম বা বিক্রেতা Oq_0 পরিমাণ দ্রব্য OA দামে বিক্রি করবে। তখন মোট রেভিনিউ = $OA \times Oq_0$ = ☐$OABq_0$। মোট ব্যয় জানার জন্য আমরা AC রেখাও আঁকলাম। Oq_0 পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদনে গড় ব্যয় (AC) = Fq_0 বা OD। সুতরাং মোট ব্যয় = $OD \times Oq_0$ = ☐$ODFq_0$। ∴ ☐ABFD হল একচেটিয়া ফার্মের মুনাফা। একে বলা হয় স্বাভাবিকের বেশি বা উদ্বৃত্ত মুনাফা (supernormal or excess profits) কারণ ফার্মের মোট ব্যয়ের মধ্যে স্বাভাবিক মুনাফা ধরা আছে।

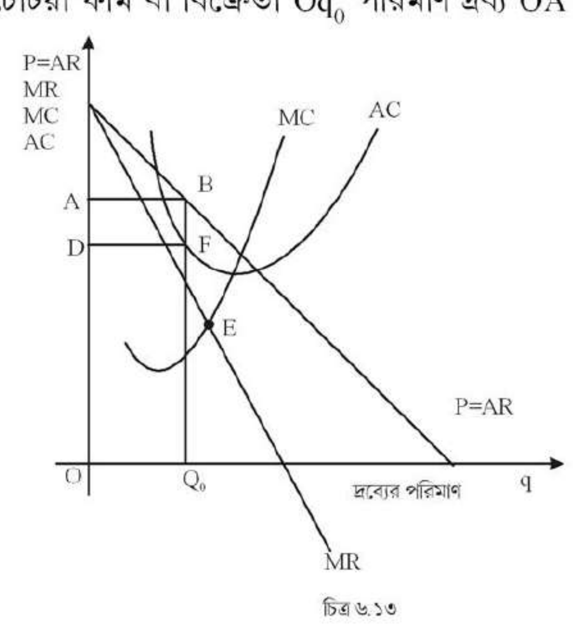

চিত্র ৬.১৩

অবশ্য স্বল্পকালে একচেটিয়া কারবারি সর্বদাই যে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি মুনাফা বা উদ্বৃত্ত মুনাফা পাবে

তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। যেমন, ৬.১৪ নং চিত্রে ভারসাম্য বিন্দু হল E যেখানে MC রেখা MR রেখাকে নীচের দিক থেকে ছেদ করেছে। তখন ভারসাম্য বিক্রি = Oq_0। তখন মোট রেভিনিউ = $OA \times Oq_0$ = মোট রেভিনিউ। এক্ষেত্রে একচেটিয়া কারবারি কেবলমাত্র স্বাভাবিক মুনাফা পাচ্ছে।

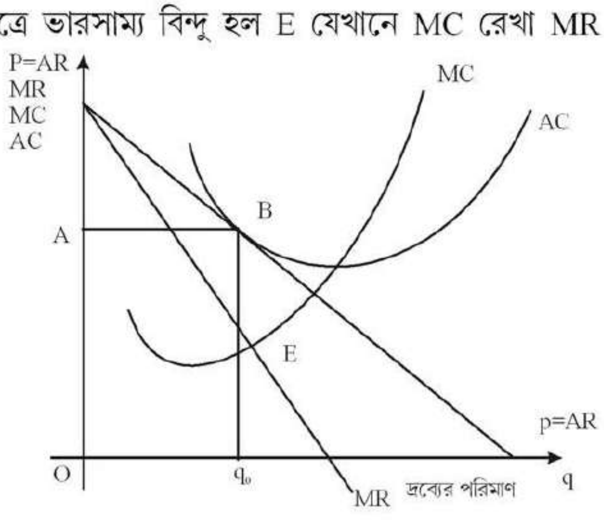

চিত্র ৬.১৪

আবার, ৬.১৫ নং চিত্রে ভারসাম্য বিন্দু আগের মতোই E যেখানে MC রেখা MR রেখাকে নীচের দিক থেকে ছেদ করেছে। তখন ভারসাম্য বিক্রি = Oq_0 এবং ভারসাম্য দাম = OA। ফলে মোট রেভিনিউ = $OA \times Oq_0$ = □$OABq_0$. কিন্তু এখন $AC = F_1q_0$ বা OD_1। তখন মোট ব্যয় = □$OD_1 \times Oq_0 = PD_1F_1q_0$. সুতরাং, ABF_1D_1 হল ফার্মের ক্ষতি। অবশ্য এই ক্ষতি যদি TFC অপেক্ষা বড় হয়, তাহলে একচেটিয়া কারবারি উৎপাদন বন্ধ করে দেবে। সুতরাং স্বল্পকালে একচেটিয়া ফার্ম উদ্বৃত্ত মুনাফা পেতে পারে, কেবলমাত্র স্বাভাবিক মুনাফা পেতে পারে অথবা তার লোকসানও হতে পারে। অবশ্য স্বল্পকালে এই লোকসান TFC অপেক্ষা বেশি হওয়া চলবে না। লোকসান TFC অপেক্ষা বেশি হলে একচেটিয়া ফার্মটি উৎপাদন বন্ধ করে দেবে।

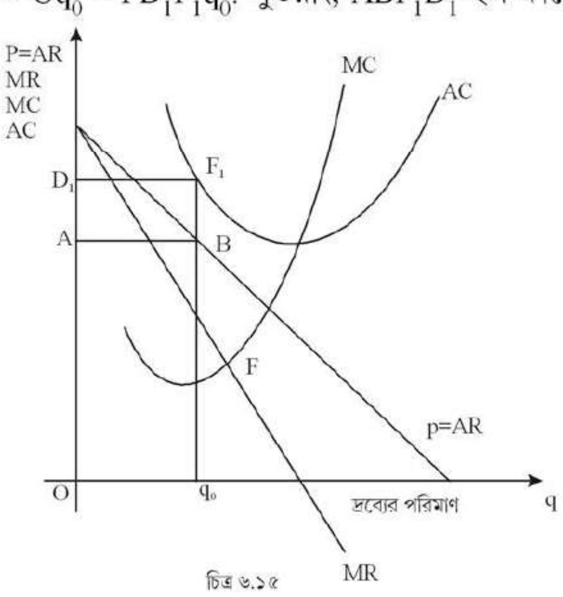

চিত্র ৬.১৫

□ একচেটিয়া কারবারির দীর্ঘকালীন ভারসাম্য (Long run equilibrium under monopoly) :

দীর্ঘকালীন ভারসাম্য অবস্থায় একচেটিয়া কারবারি স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি মুনাফা (চিত্র ৬.১৩) অথবা স্বাভাবিক মুনাফা (চিত্র ৬.১৪) পেতে পারে। দীর্ঘকালে ফার্মটি লোকসান হলে একচেটিয়া ফার্ম উৎপাদন চালাবে না। সুতরাং দীর্ঘকালে ফার্মটি উদ্বৃত্ত মুনাফা কিংবা স্বাভাবিক মুনাফা পাবে। একচেটিয়া বাজারে দীর্ঘকালে ফার্মটি উদ্বৃত্ত মুনাফা কিংবা স্বাভাবিক মুনাফা পাবে। একচেটিয়া বাজারে দীর্ঘকালে উদ্বৃত্ত মুনাফা থাকতে পারে কারণ এই বাজারে নতুন ফার্ম প্রবেশ করতে পারে না। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে প্রবেশ অবাধ হওয়ায় দীর্ঘকালে উদ্বৃত্ত মুনাফা থাকে না এবং সকল ফার্ম কেবলমাত্র স্বাভাবিক মুনাফা ভোগ করে। আর একটি বিষয়ও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। দীর্ঘকালে একচেটিয়া কারবারি LAC রেখার সর্বনিম্ন বিন্দুতে অথবা সর্বনিম্ন বিন্দুর বাঁদিকে অথবা সর্বনিম্ন বিন্দুর ডানদিকে অবস্থান করতে পারে। এর অর্থ হল,

দীর্ঘকালে একচেটিয়া ফার্মের উৎপাদন ক্ষমতার অপূর্ণ ব্যবহার হতে পারে, অথবা পূর্ণ ব্যবহার হতে পারে, অথবা অতি ব্যবহার হতে পারে। সেটি নির্ভর করছে একচেটিয়া ফার্মের উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদার আয়তনের উপর। শুধু এইটুকু নিশ্চিত করে বলা যায় যে, দীর্ঘকালে লোকসান হলে একচেটিয়া ফার্ম উৎপাদন বন্ধ করে দেবে।

৬.১১ একচেটিয়া কারবারির ভারসাম্যর বৈশিষ্টসমূহ

একচেটিয়া বাজারের ভারসাম্যের কয়েকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। সংক্ষেপে সেগুলি হল নিম্নরূপ :

(i) একচেটিয়া কারবারি কখনোই তার চাহিদা রেখার বা AR রেখার অস্থিতিস্থাপক অংশে ভারসাম্যে থাকবে না। কারণ, আমরা জানি, $MR = AR\left(1-\frac{1}{|e|}\right)$। এখন, চাহিদা রেখার অস্থিতিস্থাপক অংশে $|e| < 1$. তখন $MR < 0$ অর্থাৎ দ্রব্যের বিক্রি বাড়লে মোট রেভিনিউ কমে যায়। কোনো মুনাফা সর্বাধিককারী ফার্ম এটা চাইবে না। আমাদের ৬.১২ নং চিত্রে দেখা যাচ্ছে যে, HG অংশে $|e| < 1$ এবং তখন TR নিম্নমুখী বা MR ঋণাত্মক। একচেটিয়া কারবারি কখনোই এই HG অংশে বা অস্থিতিস্থাপক অংশে ($|e| < 1$) ভারসাম্যে থাকবে না।

(ii) পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে MC নিম্নমুখী হলে ভারসাম্য অর্জিত হয় না, কিন্তু একচেটিয়া বাজারে MC রেখা নিম্নমুখী হলে ভারসাম্য হতেও পারে, আবার নাও হতে পারে। ভারসাম্য পেতে গেলে MC রেখা দ্বারা MR রেখাকে নীচের দিক থেকে ছেদ করতে হবে। যদি MC রেখা MR রেখাকে নীচের দিক থেকে ছেদ না করে তাহলে একচেটিয়া কারবারি ভারসাম্যে থাকবে না। যেমন আমাদের ৬.১৬ এবং ৬.১৭ নং ছবিতে MC রেখা বাঁদিক থেকে ডানদিকে নিম্নমুখী অর্থাৎ MC রেখার ঢাল ঋণাত্মক। উভয় চিত্রেই E বিন্দুতে MR = MC হয়েছে। কিন্তু ৬.১৬ নং চিত্রের E বিন্দুটি ভারসাম্য বিন্দু কেননা সেখানে

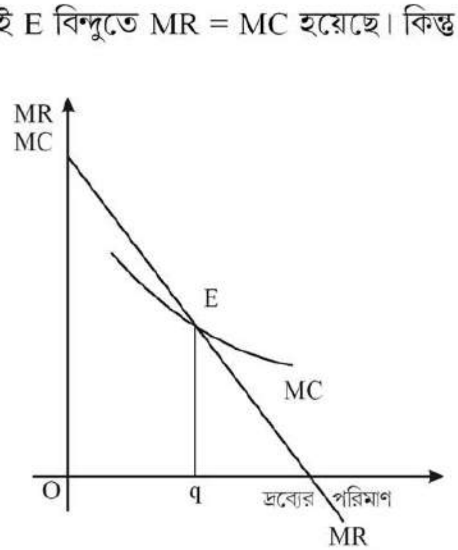

চিত্র ৬.১৬

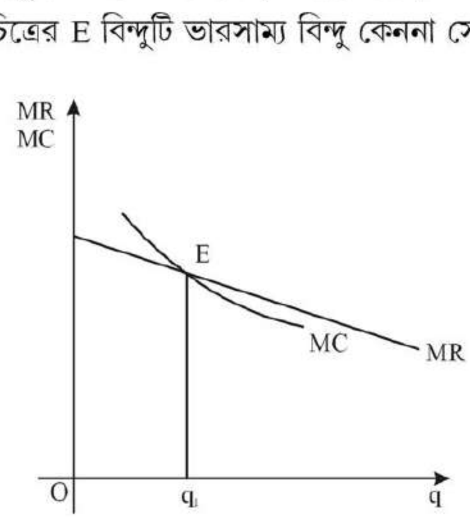

চিত্র ৬.১৭

MC রেখা MR রেখাকে নীচের দিক থেকে ছেদ করেছে অর্থাং ভারসাম্যর দুটো শর্তই পালিত হচ্ছে। কিন্তু ৬.১৭ নং ছবিতে E বিন্দুতে MC রেখা MR রেখাকে উপরের দিক থেকে ছেদ করেছে। এখানে ভারসাম্যের দ্বিতীয় শর্তটি পালিত হয়নি। সুতরাং দ্বিতীয় চিত্রের E বিন্দু ভারসাম্য বিন্দু নয়।

(iii) একচেটিয়া বাজারে ভারসাম্য বিন্দুতে $p > MC$ বা প্রান্তিক ব্যয় (MC) দ্রব্যের দাম অপেক্ষা কম হবে। এটি সহজেই দেখানো যায়। আমরা জানি, একচেটিয়া বাজারে ভারসাম্যের প্রথম ক্রমের শর্ত বা প্রয়োজনীয় শর্ত হল, $MR = MC$। অতএব, ভারসাম্য বিন্দুতে $p > MC$। অর্থাৎ একচেটিয়া বাজারে ভারসাম্য দাম সর্বদাই প্রান্তিক ব্যয় অপেক্ষা বেশি হবে। কিন্তু পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে দাম স্থির বলে $p = MR$। আবার, ভারসাম্য বিন্দুতে $MR = MC$ $\therefore$ $p = MC$. অর্থাৎ পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে ভারসাম্য বিন্দুতে দাম ও প্রান্তিক ব্যয় পরস্পর সমান হয়।

(iv) একচেটিয়া ফার্ম গড় ব্যয় (AC) রেখার সর্বনিম্ন বিন্দুতে উৎপাদন করতে পারে, আবার নাও করতে পারে। এর অর্থ হল, ভারসাম্য বিন্দুতে একচেটিয়া ফার্মের উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার হতেও পারে, আবার নাও হতে পারে। কিন্তু পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে কোনো ফার্ম দীর্ঘকালে সর্বদাই গড় ব্যয় (AC) রেখার সর্বনিম্ন বিন্দুতে উৎপাদন করবে অর্থাৎ এই বাজারে ফার্মের সম্পদের কাম্য ব্যবহার ঘটবে। কিন্তু একচেটিয়া বাজারে তা ঘটতেও পারে, আবার নাও ঘটতে পারে।

(v) পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে MC রেখা থেকে দাম ও জোগানের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট সম্পর্ক পাওয়া যায়। MC রেখার একটা অংশ এই বাজারে ফার্মের জোগান রেখা বলে বিবেচিত হয়। কিন্তু একচেটিয়া বা যে-কোনো অপূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে MC রেখা থেকে দামের সঙ্গে দ্রব্যের জোগানের পরিমাণের কোনো নির্দিষ্ট বা অদ্বিতীয় (unique) সম্পর্ক পাওয়া যায় না। সেজন্য একচেটিয়া বা অপূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে জোগান রেখা অনুপস্থিত বলা হয় (Supply curve is said to be absent under monopoly or under any imperfectly competitive market)।

৬.১১.১. একচেটিয়া ক্ষমতার মাত্রা ও তার পরিমাপ

একচেটিয়া বিক্রেতার দাম বাড়ানোর ক্ষমতা কতটা, তাকে বলে একচেটিয়া ক্ষমতার মাত্রা। দ্রব্যের দাম ও পরিমাণের উপর কতটা নিয়ন্ত্রণ একচেটিয়া কারবারি আরোপ করতে পারে তা এই ধারণার দ্বারা পরিমাপ করা হয়। প্রতিযোগিতামূলক অবস্থা থেকে বাজারের বিচ্যুতি কতটা, তাও এই ধারণা থেকে কিছুটা বোঝা যায়। একচেটিয়া ক্ষমতার মাত্রা বিভিন্ন ভাবে পরিমাপ করা হয় :

(i) লার্নারের সূচক : একচেটিয়া ক্ষমতা পরিমাপের জন্য A.P. Lerner একটি সূত্র দিয়েছেন। তাঁর মতে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে কোনো একচেটিয়া ক্ষমতা নেই। এই বাজারে ভারসাম্য বিন্দুতে $p = MC$ বা, $p - MC = 0$. এক্ষেত্রে কোনো একচেটিয়া ক্ষমতা নেই বা একচেটিয়া ক্ষমতা শূন্য। সুতরাং, p যত MC অপেক্ষা বেশি হবে, একচেটিয়া ক্ষমতার মাত্রা তত বেশি হবে। অতএব, একচেটিয়া ক্ষমতার

সূচক বা লার্নারের সূচক = $I = \frac{p - MC}{p}$ । এখন, ভারসাম্য বিন্দুতে $MC = MR = p\left(1 - \frac{1}{|e|}\right)$ ।

$$\therefore I = \frac{p - MR}{p} = \frac{p - p\left(1 - \frac{1}{|e|}\right)}{p} = \frac{p \times \frac{1}{|e|}}{p} = \frac{1}{|e|} \text{ ।}$$

অর্থাৎ Lerner-এর একচেটিয়া ক্ষমতার সূচক হল চাহিদার দামগত স্থিতিস্থাপকতার অন্যোন্যক। একচেটিয়া ক্ষমতার সূচক এবং চাহিদার দামগত স্থিতিস্থাপতার মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক রয়েছে। $|e|$-এর মান যত বড় হবে, একচেটিয়া ক্ষমতার মাত্রা তত কম হবে। পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে $|e| = \infty$। সুতরাং একচেটিয়া ক্ষমতার মাত্রা = 0। আবার, বিশুদ্ধ একচেটিয়ার ক্ষেত্রে $|e| = 1$ এবং এই সূচকের মান একের সমান। আবার, উৎপাদন ব্যয় শূন্য হলে বা MC = 0 হলে এই সূচকের মান একের সমান। সুতরাং, একচেটিয়া ক্ষমতার সূচকের মান শূন্য থেকে একের মধ্যে বিরাজ করে। পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে এর মান শূন্য এবং বিশুদ্ধ একচেটিয়া অথবা কুর্নোর ব্যয়হীন একচেটিয়ার ক্ষেত্রে এর মান একের সমান হবে।

(ii) উদ্বৃত্ত মুনাফার পরিমাণ : পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে দীর্ঘকালে উদ্বৃত্ত মুনাফার পরিমাণ শূন্য, কিন্তু একচেটিয়া বাজারে এই মুনাফার পরিমাণ সাধারণত ধনাত্মক। সুতরাং, মুনাফার পরিমাণ স্বাভাবিকের চেয়ে যত বেশি, একচেটিয়া ক্ষমতাও তত বেশি। এখন, স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি মুনাফার উদ্ভব ঘটে যখন $p > AC$। সুতরাং $(p - AC)$-কে একচেটিয়া ক্ষমতার একটি পরিমাপ বলে ধরা যেতে পারে।

(iii) মুনাফার হার : মুনাফার হার হল মোট মুনাফা ও মোট বিনিয়োজিত মূলধনের অনুপাত। মুনাফার হার যত বেশি, একচেটিয়া ক্ষমতার মাত্রাও তত বেশি। পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে দীর্ঘকালে উদ্বৃত্ত মুনাফার হার শূন্য। সুতরাং, সেখানে একচেটিয়া ক্ষমতা শূন্য। কিন্তু একচেটিয়া বাজারে মুনাফার হার ধনাত্মক অর্থাৎ সেখানে বিক্রেতার একচেটিয়া ক্ষমতা আছে।

(iv) পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতার পরিমাণ : অধ্যাপক Triffin একচেটিয়া ক্ষমতার মাত্রা পরিমাপের জন্য চাহিদার পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতার ধারণা ব্যবহার করেছেন। চাহিদার পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতার (e_{xy}) সাংখ্য বা পরম মান থেকে দুটি দ্রব্য একে অপরের কতটা ঘনিষ্ঠ বিকল্প তা জানা যায়। পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে দ্রব্যগুলি সমজাতীয়। ফলে $e_{xy} = \infty$ (অসীম) এবং একচেটিয়া ক্ষমতা শূন্য। তাহলে, চাহিদার পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতার মান যত কম হবে, দ্রব্য দুটি তত দূরবর্তী বিকল্প হবে এবং একচেটিয়া ক্ষমতার মাত্রাও তত বেশি হবে। বিপরীত ক্ষেত্রে, পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতার মান যত বড় হবে, দ্রব্য দুটি তত নিকট বিকল্প হবে। সেক্ষেত্রে একচেটিয়া ক্ষমতাও তত কম হবে।

৬.১১.২. একচেটিয়া কারবারি ক্ষমতার সীমা (Limits to Monopoly Power)

একচেটিয়া কারবারি একাই দ্রব্যটির জোগান দেয়। ফলে দ্রব্যটির দামের উপর তার যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ

থাকে। অবশ্য যা খুশি দাম সে নিতে পারে না। দ্রব্যের দাম নির্ধারণের সময় তাকে কয়েকটি বাস্তব অবস্থা বিবেচনার মধ্যে রাখতে হয়। সংক্ষেপে সেগুলি নিম্নরূপ :

(i) অতিরিক্ত দাম নিলে জনমত তার বিরুদ্ধে চলে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে তার কারবারের সুনাম নষ্ট হবে। একচেটিয়া বিক্রেতা তা চাইবে না।

(ii) দাম খুব বেশি নিলে সরকার দ্রব্যটির উৎপাদন ও বণ্টনের ভার অধিগ্রহণ করতে পারে। সেক্ষেত্রে একচেটিয়া কারবারির অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়বে।

(iii) একচেটিয়া বিক্রেতা খুব বেশি দাম নিলে প্রতিযোগী ফার্ম বাজারে প্রবেশ করতে পারে। সেক্ষেত্রে একচেটিয়া বিক্রেতাকে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হবে এবং তার একচেটিয়া সুবিধা বিনষ্ট হবে। একচেটিয়া ফার্ম এটাও চাইবে না।

(iv) দাম অতিরিক্ত হলে ক্রেতারা বিকল্প দ্রব্যের ব্যবহার শুরু করতে পারে। কিছুদিন ব্যবহারের পর ক্রেতারা ঐ বিকল্প দ্রব্যের ভোগে অভ্যস্ত হয়ে যেতে পারে। সেক্ষেত্রেও একচেটিয়া বিক্রেতার বাজার নষ্ট হবে।

এ সমস্ত কারণে একচেটিয়া কারবারি তার দ্রব্যের যা-খুশি দাম নিতে পারে না। তাকে নানা বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনার মধ্যে রাখতে হয়। আমরা বলতে পারি, একচেটিয়া কারবারির দাম নির্ধারণের ক্ষমতা অসীম নয়, তা কতকগুলি বাস্তব বিষয়ের দ্বারা সীমায়িত। তবে একথা ঠিক যে, একচেটিয়া কারবারি যেহেতু একাই দ্রব্যটির জোগান দেয় এবং দ্রব্যটির ঘনিষ্ঠ বিকল্প নেই, সে দ্রব্যটির দাম কিছুটা বেশি নেবেই। অর্থাৎ একচেটিয়া বাজারে ক্রেতাকে একটু বেশি দাম দিতেই হবে। ফলে ক্রেতা বা ভোগকারীর উদ্বৃত্ত পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারের চেয়ে কম হয়। এজন্য বলা হয় যে, পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারের তুলনায় একচেটিয়া বাজারে ভোগকারীর উদ্বৃত্তের ক্ষেত্রে একটি অপূরণীয় ক্ষতি (deadweight loss) ঘটে থাকে। অনেকে এটিকে আবার একচেটিয়া বাজারের সামাজিক ব্যয় (social cost) বলে অভিহিত করেছেন।

৬.১২ দাম স্বতন্ত্রকারী বা মূল্য বিভেদকারী একচেটিয়া কারবার

যখন কোনো একচেটিয়া কারবারি একই দ্রব্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ক্রেতার নিকট ভিন্ন ভিন্ন দাম নেয় অথবা ঈষৎ পৃথকীকৃৎ দ্রব্যের ক্ষেত্রে দ্রব্যের পার্থক্যের তুলনায় দাম বেশি নেয় তখন ঐ একচেটিয়া কারবারিকে দাম স্বতন্ত্রকারী একচেটিয়া কারবার বা মূল্য বিভেদকারী একচেটিয়া কারবার বলে।

৬.১২.১ কখন দামস্বতন্ত্রীকরণ সম্ভব

দাম স্বতন্ত্রীকরণ সম্ভব হওয়ার জন্য কতকগুলি অনুকূল অবস্থা দরকার। সেগুলি হল :

(ক) দ্রব্যটি এমন হতে হবে যে তার পুনর্বিক্রয় করা যায় না।

(খ) ক্রেতার অজ্ঞতা বা অলসতার জন্য দাম স্বতন্ত্রীকরণ হতে পারে।

(গ) বিভিন্ন বাজারের মধ্যে আঞ্চলিক দূরত্ব এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যে আন্তর্জাতিক সীমানার বাধা থাকার ফলেও দাম স্বতন্ত্রীকরণ হতে পারে।

(ঘ) দ্রব্যটি একান্ত ব্যক্তিগত সেবাকার্য হলে দাম স্বতন্ত্রীকরণ বা পৃথকীকরণ ঘটতে পারে। যেমন, কোনো ডাক্তার তাঁর ধনী রোগীর কাছে বেশি ফি এবং গরীব রোগীর কাছে কম ফি নিতে পারেন।

(ঙ) ভোগকারীর বিশেষ আচরণের জন্যও দাম স্বতন্ত্রীকরণ হতে পারে। বিশেষ কোনো বাজার থেকে জিনিস কেনা সম্মানের ব্যাপার বলে বিবেচিত হলে ভোগকারী অনেক সময় বেশি দাম দিয়ে সেই বাজার থেকে কিনবে। যেমন, কোলকাতার নিউ মার্কেটে জিনিসপত্রের দাম অন্য বাজারের থেকে বেশি হলেও অনেক ক্রেতা ঐ বাজার থেকে জিনিস কেনে।

(চ) দ্রব্যের ব্যবহারের পার্থক্যের দরুনও দাম পৃথক হতে পারে। যেমন, কোনো শিক্ষক তাঁর নোট কোনো ছাত্রকে কম দামে এবং কোনো টিউটোরিয়াল হোমকে বেশি দামে বিক্রি করতে পারেন।

৬.১২.২ কখন দামস্বতন্ত্রীকরণ লাভজনক

দাম স্বতন্ত্রীকরণ বা মূল্য বিভেদকরণ যে সর্বদাই লাভজনক হবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। দাম স্বতন্ত্রীকরণ লাভজনক হতে গেলে দুটি শর্ত পূরণ হওয়া দরকার। সেই শর্ত দুটি হল :

(i) দাম স্বতন্ত্রীকরণকে লাভজনক হতে গেলে বিভিন্ন উপবাজারকে 'কার্যকরীভাবে' (effectively) আলাদা হতে হবে এবং সস্তার বাজার থেকে বেশি দামের বাজারে পুনর্বিক্রয়ের সম্ভাবনা থাকলে চলবে না।

(ii) বিভিন্ন উপবাজারে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার মান আলাদা হতে হবে। যদি দুটি বাজারের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার মান একই হয়, তাহলে একচেটিয়া কারবারির পক্ষে একই দাম নেওয়া লাভজনক, অর্থাৎ সেক্ষেত্রে দাম স্বতন্ত্রীকরণ লাভজনক নয়। বরং, যদি দুটি বাজারের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা আলাদা হয়, তাহলেই একচেটিয়া কারবারির পক্ষে দাম স্বতন্ত্রীকরণ লাভজনক। এক্ষেত্রে, যে বাজারে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কম, সেখানে বেশি দাম নেওয়া এবং যে বাজারের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বেশি, সেখানে কম দাম নেওয়া তার পক্ষে লাভজনক।

৬.১২.৩ দাম স্বতন্ত্রীকরণের প্রকারভেদ

প্রকৃতিগতভাবে দাম স্বতন্ত্রীকরণ তিন রকমের হতে পারে। সংক্ষেপে সেগুলি হল নিম্নরূপ :

(i) অঞ্চলভেদে দাম স্বতন্ত্রীকরণ (Regional or local pricediscrimination) : দ্রব্যটি যদি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন দামে বিক্রি হয় তবে তাকে আঞ্চলিক বা স্থানগত দাম স্বতন্ত্রীকরণ বলে।

(ii) ব্যক্তিগত সেবাকার্যে দাম স্বতন্ত্রীকরণ (Personal price discrimination) : দ্রব্যটি যদি সেবাকার্য হয় এবং ভিন্ন ভিন্ন ভোগকারীর নিকট ভিন্ন ভিন্ন দাম নেওয়া হয়, তবে তাকে ব্যক্তিগত দাম স্বতন্ত্রীকরণ

বা ব্যক্তিভেদে দাম স্বতন্ত্রীকরণ বলে। যেমন, কোনো উকিল তাঁর ধনী মক্কেলের কাছে বেশি ফি এবং গরীব মক্কেলের কাছে কম ফি নিতে পারেন। এটি ব্যক্তিগত দাম স্বতন্ত্রীকরণের উদাহরণ।

(iii) ব্যবহারগত বা ব্যবহারভেদে দাম স্বতন্ত্রীকরণ (Price discrimination according to use) : দ্রব্যের ব্যবহার অনুযায়ী দাম আলাদা হলে তাকে ব্যবহারগত দাম স্বতন্ত্রীকরণ বলে। যেমন, বিদ্যুৎ পর্ষদ কলকারখানাগুলিকে কম দামে এবং ভিডিও পার্লারগুলিকে বেশি দামে বিদ্যুৎ বিক্রি করতে পারে।

এছাড়া, A. C. Pigou দাম স্বতন্ত্রীকরণের মাত্রা অনুযায়ী অর্থাৎ একচেটিয়া কারবারি ক্রেতার কাছ থেকে কতটা বেশি দাম নিচ্ছে সেই অনুযায়ী দাম স্বতন্ত্রীকরণকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। সেগুলি হল : প্রথম মাত্রার দাম স্বতন্ত্রীকরণ (first degree price discrimination), দ্বিতীয় মাত্রার দাম স্বতন্ত্রীকরণ (second degree price discrimination) এবং তৃতীয় মাত্রার দাম স্বতন্ত্রীকরণ (third degree price discrimination)। ক্রেতা কোনো দ্রব্য পাবার জন্য সর্বাধিক যে দাম দিতে রাজি থাকে অর্থাৎ ক্রেতার যা চাহিদা-দাম (demand price), সেই দামই যখন একচেটিয়া কারবারি আদায় করতে পারে, তখন তাকে বলে প্রথম মাত্রার দাম স্বতন্ত্রীকরণ। একে পূর্ণ বা নিখুঁত দাম স্বতন্ত্রীকরণও বলা হয়। এক্ষেত্রে ক্রেতার ভোগ উদ্বৃত্ত বলে কিছু থাকে না। ভোগ উদ্বৃত্তের সবটাই বিক্রেতা হিসাবে একচেটিয়া কারবারি আদায় করে। একে 'take-it-or-leave-it' দাম স্বতন্ত্রীকরণও বলা হয়।

অন্যদিকে, যখন একচেটিয়া কারবাবরি তার দ্রব্যের চাহিদাকে কতকগুলি অংশে ভাগ করে এবং প্রতিটি অংশের যেটি সর্বনিম্ন চাহিদা-দাম সেই দামে দ্রব্যটি সংশ্লিষ্ট অংশে বিক্রি করে, তখন তাকে দ্বিতীয় মাত্রার দাম স্বতন্ত্রীকরণ বলে। আর, যখন কোনো একচেটিয়া কারবারি তার চাহিদাকে কয়েকটি অংশে ভাগ করে প্রতিটি অংশে এক একটি দাম আদায় করে, কিন্তু সেই দাম যে সেই অংশের সর্বনিম্ন চাহিদা-দামের সমান হবে তার কোনো কথা নেই, তখন তাকে তৃতীয় মাত্রার দাম স্বতন্ত্রীকরণ বলে। সাধারণভাবে দাম স্বতন্ত্রীকরণ বলতে আমরা এই তৃতীয় মাত্রার দাম স্বতন্ত্রীকরণকেই বুঝিয়ে থাকি।

৬.১২.৪ দাম স্বতন্ত্রকারী একচেটিয়া কারবারির ভারসাম্য

আমরা ধরে নিচ্ছি যে, দাম স্বতন্ত্রকারী একচেটিয়া কারবারি একটি কারখানায় দ্রব্য উৎপাদন করে দুটি উপবাজারে বিক্রি করছে। সুতরাং ঐ দুই বাজারে তার AR ও MR রেখা যথাক্রমে AR_1 ও MR_1 এবং AR_2 ও MR_2। তার গড় ও প্রান্তিক ব্যয় অপেক্ষক হল যথাক্রমে AC ও MC। আমরা আরও অনুমান করছি যে, একচেটিয়া কারবারি তার মুনাফা সর্বাধিক করতে চায়। সুতরাং, ঐ দাম স্বতন্ত্রকারী একচেটিয়া বিক্রেতা সেই বিন্দুতে ভারসাম্যে থাকবে যেখানে তার মুনাফা সর্বাধিক। এখন, মুনাফা সর্বাধিক করার শর্ত নির্ণয় করা যাক। যতক্ষণ পর্যন্ত $MR_1 > MC$, ততক্ষণ ঐ একচেটিয়া কারবারি আরো দ্রব্য উৎপাদন করে প্রথম বাজারে বিক্রি করতে পাঠাবে, এতে তার প্রথম বাজার থেকে প্রাপ্ত মুনাফার পরিমাণ বাড়বে। যখন $MR_1 = MC$ হবে, তখন আর ঐ কারবারি দ্রব্যের উৎপাদন ও বিক্রি বাড়াবে না। সুতরাং তার ভারসাম্যর

একটি শর্ত হল : $MR_1 = MC$। ঠিক একই যুক্তিতে, তার দ্বিতীয় উপবাজারে ভারসাম্যর শর্ত হল : $MR_2 = MC$। তাহলে এই দুটিকে একসঙ্গে লিখতে পারি : $MR_1 = MR_2 = MC$. এটি হল দাম স্বতন্ত্রকারী একচেটিয়া কারবারির ভারসাম্যর প্রথম ক্রমের বা প্রয়োজনীয় শর্ত। ভারসাম্যর পর্যাপ্ত বা দ্বিতীয় ক্রমের শর্ত হল : MC রেখার ঢালকে সম্মিলিত MR_1 ও MR_2 রেখার ঢালের অপেক্ষা বেশি হতে হবে।

আমরা রেখাচিত্রের সাহায্যে (চিত্র ৬.১৮) দাম স্বতন্ত্রকারী একচেটিয়া কারবারির ভারসাম্য দেখিয়েছি। (ক) এবং (খ) অংশে আমরা দুটি বাজারের AR ও MR রেখা টেনেছি। MR_1 ও MR_2 রেখাকে অনুভূমিক ভাবে যোগ করে আমরা চিত্রের গ-অংশে সম্মিলিত MR (combined MR) রেখা পেয়েছি। চিত্রের গ-অংশে আমরা MC রেখাও টেনেছি। এই MC রেখা সম্মিলিত MR রেখাকে (CMR) E বিন্দুতে নীচের দিক থেকে ছেদ করেছে। তাহলে E বিন্দুতে ভারসাম্যর উভয় শর্তই পূরণ হয়েছে। সুতরাং E বিন্দু হল ভারসাম্য বিন্দু। একচেটিয়া কারবারি Oq_0 পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করবে। তখন তার $MC = Eq_0$। এই MC-র সাথে সে MR_1 ও MR_2-কে সমান করবে। সেজন্য আমরা E বিন্দু থেকে অনুভূমিক অক্ষের সমান্তরাল করে বাঁদিকে MR_1 রেখা পর্যন্ত একটি সরলরেখা টানলাম। এই রেখা MR_1 রেখাকে E_1 বিন্দুতে এবং MR_2 রেখাকে E_2 বিন্দুতে ছেদ করেছে। সুতরাং, E_1 এবং E_2 বিন্দুতে যথাক্রমে $MR_1 = MC$ এবং $MR_2 = MC$ অর্থাৎ ভারসাম্যের প্রথম ক্রমের শর্ত পালিত হয়েছে। পাশাপাশি E বিন্দুতে ভারসাম্যর দ্বিতীয় ক্রমের শর্তও পালিত হয়েছে। সুতরাং E_1, E_2 এবং E বিন্দুগুলি হল ভারসাম্য বিন্দু। একচেটিয়া কারবারি প্রথম বাজারে O_1q_1 পরিমাণ এবং দ্বিতীয় বাজারে O_2q_2 পরিমাণ দ্রব্য বিক্রি করবে। স্পষ্টতই, $O_1q_1 + O_2q_2 = Oq_0$। এখন, দুটি বাজারে দাম জানা যাবে ঐ দুটি বাজারের চাহিদা রেখা (AR) থেকে। চিত্রে দেখা যাচ্ছে যে, প্রথম বাজারে দাম হবে O_1P_1 এবং দ্বিতীয় বাজারে দাম হবে O_2P_2। লক্ষণীয় যে, $O_1P_1 > O_2P_2$ অর্থাৎ যে বাজারে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কম, সেই বাজারে দাম বেশি হবে এবং যে বাজারে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বেশি, সেই বাজারে দাম কম হবে।

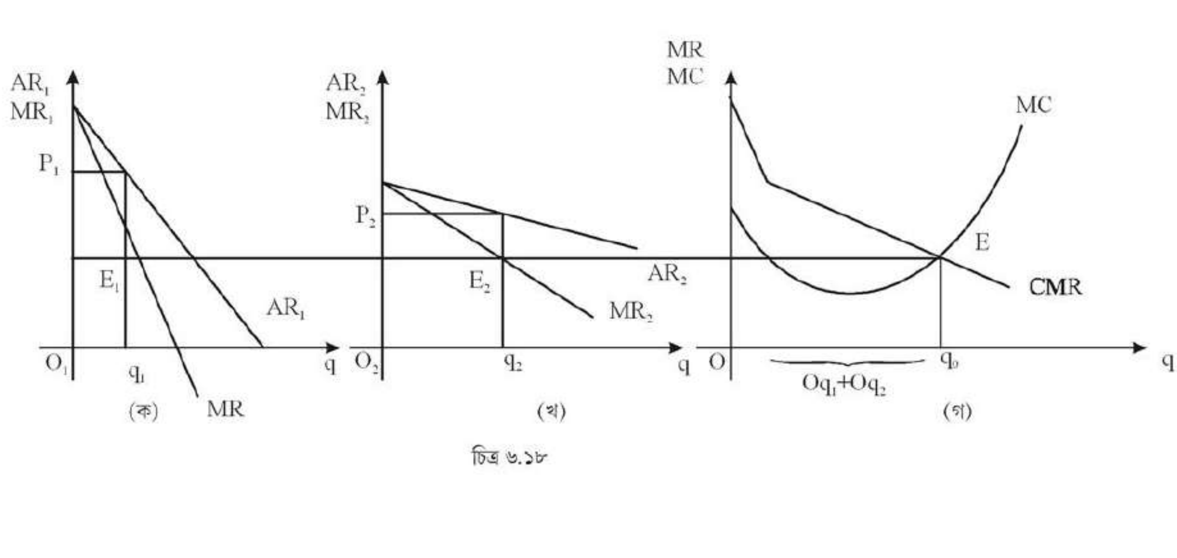

চিত্র ৬.১৮

৬.১২.৫. দাম স্বতন্ত্রীকরণ কি সমর্থনযোগ্য?

দাম স্বতন্ত্রীকরণের দ্বারা একচেটিয়া কারবারি একই দ্রব্যের জন্য বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে বিভিন্ন দাম নেয়। এটি নীতিগতভাবে সমর্থনীয় নয়। কিন্তু কখনও কখনও দাম স্বতন্ত্রীকরণ সমর্থনীয় বা কাম্য। যেমন, কোনো দেশের সরকার যদি বিনা শুল্কে বেবিফুড বা জীবনদায়ী ওষুধ আমদানি করে কিন্তু বিলাস দ্রব্যের উপর উচ্চহারে আমদানি শুল্ক বসায়, তবে তা সমর্থনযোগ্য। তেমনি, রেলে উচ্চ শ্রেণিতে ভাড়া সুবিধা অনুপাতে বেশি হলেও তা সমর্থনীয়। কারণ এই বাড়তি আয় দ্বারা রেল কোম্পানি শহরতলির মাসিক টিকিটে অথবা পণ্য পরিবহনে ভরতুকি দিয়ে থাকে। আবার, দাম স্বতন্ত্রীকরণ কোনো শিল্পকে টিকে থাকতেও সাহায্য করে। কোনো বই প্রকাশক হয়তো কোনো বই শুধু পেপারব্যাক অথবা শুধু রাজ সংস্করণ বের করে লাভ করতে পারছে না। কিন্তু উভয় সংস্করণই বের করে ও দাম স্বতন্ত্রীকরণের নীতি নিয়ে দু'ধরনের সংস্করণ ছাপানো লাভজনক হতে পারে। এসমস্ত ক্ষেত্রে দাম স্বতন্ত্রীকরণ সমর্থনযোগ্য এবং কাম্য বলে বিবেচিত হতে পারে।

৬.১৩ পূর্ণ প্রতিযোগিতা ও একচেটিয়া বাজারের তুলনা

পূর্ণ প্রতিযোগিতা ও একচেটিয়া বাজারের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য ও কিছু বৈসাদৃশ্য (বা পার্থক্য) আছে। আমরা সেগুলি এখন সংক্ষেপে উল্লেখ করব।

সাদৃশ্য (Similarities)

(i) উভয় বাজারেই একটি মাত্র দ্রব্য বিক্রি হচ্ছে যার কোনো ঘনিষ্ঠ বিকল্প নেই।

(ii) উভয় বাজারেই ধরা হয় যে, বিক্রেতার লক্ষ্য হল মুনাফা সর্বাধিক করা।

(iii) উভয় বাজারেই ধরা হয় যে, বাজারে অসংখ্য ক্রেতা আছে এবং তারা এককভাবে বাজার দামকে প্রভাবিত করতে পারে না।

(iv) পূর্ণ প্রতিযোগিতা ও একচেটিয়া উভয় বাজারেই বিক্রেতার ভারসাম্যর প্রথম ক্রমের শর্ত হল : $MR = MC$।

(v) উভয় বাজারেই স্বল্পকালে ফার্ম স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি মুনাফা, স্বাভাবিক মুনাফা অথবা স্বাভাবিকের চেয়ে কম মুনাফা পেতে পারে।

বৈসাদৃশ্য বা পার্থক্য (Dissimilarities or Differences) :

পূর্ণ প্রতিযোগিতা ও একচেটিয়া বাজারের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য থাকলেও এই দুই বাজারের মধ্যে নানা পার্থক্য আছে। বস্তুত পক্ষে সাদৃশ্য অপেক্ষা বৈসাদৃশ্য বা পার্থক্যই বেশি। আমরা সংক্ষেপে এই দুই বাজারের মধ্যে প্রধান প্রধান পার্থক্যগুলি উল্লেখ করছি।

(i) একচেটিয়া বাজারে বিক্রেতা একজন, কিন্তু পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে বিক্রেতা অসংখ্য। এখানে অনেক বিক্রেতা মিলে গঠিত হয় শিল্প। কিন্তু একচেটিয়া বাজারে একজন বিক্রেতা বা ফার্মই হল শিল্প।

(ii) পূর্ণ প্রতিযোগিতায় ফার্মের p বা AR রেখা হল অনুভূমিক সরলরেখা এবং p বা AR = MR। কিন্তু একচেটিয়া বাজারে p = AR রেখা নিম্নমুখী এবং p বা AR > MR।

(iii) পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে কোনো ফার্ম দাম গ্রহীতা এবং দ্রব্যের পরিমাণ নির্ধারক অর্থাৎ ফার্ম বাজার দামকে নির্দিষ্ট বলে ধরে নেয় এবং দ্রব্যের পরিমাণ নির্ধারণ করে। কিন্তু একচেটিয়া বাজারে দাম ও দ্রব্যের পরিমাণ উভয়ই চলরাশি। একচেটিয়া ফার্ম দাম-নির্মাতা, দাম-গ্রহীতা নয়। কিন্তু পূর্ণ প্রতিযোগিতায় ফার্মের কাছে দাম স্থির; সেখানে দ্রব্যের পরিমাণই শুধুমাত্র চলরাশি।

(iv) পূর্ণ প্রতিযোগিতায় ফার্মের ভারসাম্য অবস্থায় p = MC, কিন্তু একচেটিয়া বাজারের ভারসাম্য অবস্থায় p > MC।

(v) পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে ফার্মের ভারসাম্য অবস্থায় MC রেখাকে ঊর্ধ্বমুখী হতেই হবে। কিন্তু একচেটিয়া বাজারে ভারসাম্যর জন্য MC রেখাকে ঊর্ধ্বমুখী হতেই হবে তার কোনো মানে নেই। সেখানে যা প্রয়োজন তা হল, MC রেখা যেন MR রেখাকে নীচের দিক থেকে ছেদ করে।

(vi) দীর্ঘকালীন ভারসাম্য অবস্থায় পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক ফার্ম কেবলমাত্র স্বাভাবিক মুনাফা ভোগ করে। কিন্তু একচেটিয়া ফার্ম দীর্ঘকালে স্বাভাবিক মুনাফা বা স্বাভাবিকের বেশি মুনাফা পেতে পারে।

(vii) পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে ফার্মের MC রেখা থেকে এর জোগান রেখা পাওয়া যায়। কিন্তু একচেটিয়া বাজারে এরূপ জোগান রেখা টানা যায় না। পূর্ণ প্রতিযোগিতায় দাম ও জোগানের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট ও অদ্বিতীয় সম্পর্ক থাকে। কিন্তু একচেটিয়া বাজারে দাম ও জোগানোর পরিমাণের মধ্যে এরূপ কোনো নির্দিষ্ট বা অদ্বিতীয় সম্পর্ক নেই।

(viii) পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে দ্রব্যটির একটিই দাম চালু থাকে। ঐ দামে ক্রেতারা দ্রব্যটি কিনতে পারে। কিন্তু একচেটিয়া ফার্ম কোনো দ্রব্যের ভিন্ন ভিন্ন ইউনিটের জন্য আলাদা আলাদা দাম নিতে পারে অথবা ভিন্ন বাজারে ভিন্ন দাম নিতে পারে। একে বলা হয় দাম স্বতন্ত্রীকরণ বা মূল্য বিভেদকরণ। পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে ফার্ম দাম স্বতন্ত্রীকরণের নীতি গ্রহণ করতে পারে না।

৬.১৪ একচেটিয়া প্রতিযোগিতার বাজারে ভারসাম্য

যে বাজারে অনেক ক্রেতা ও অনেক বিক্রেতা প্রায় সমজাতীয় কিন্তু ঈষৎ পৃথকীকৃত (slightly differentiated) দ্রব্যের কেনাবেচা করে তাকে একচেটিয়া প্রতিযোগিতার বাজার বলে। অধ্যাপক চেম্বারলিন এবং অধ্যাপিকা জোয়ান রবিনসন পৃথক পৃথক ভাবে এই বাজার সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এরূপ

বাজারের উদাহরণ হিসাবে টুথপেস্টের বাজারের উল্লেখ করা যেতে পারে। বাজারে নানা ব্র্যান্ডের টুথপেষ্ট আছে, যেমন, কলগেট, বিনাকা, প্রমিস, ফরহ্যান্স, সিবাকা প্রভৃতি। প্রত্যেক কোম্পানিরই তার নিজের দ্রব্য উৎপাদনে একচেটিয়া ক্ষমতা রয়েছে। কিন্তু এই দ্রব্যগুলি একে অপরের ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত। সেজন্য এদের বিক্রির সময় বাজারে এক কোম্পানিকে অপর কোম্পানির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হয়। অর্থাৎ এক্ষেত্রে উৎপাদনে একচেটিয়া কিন্তু বিক্রিতে প্রতিযোগিতা রয়েছে। এটি বোঝাতেই একচেটিয়া প্রতিযোগিতা (monopolistic competition) কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে। এই বাজার আসলে একচেটিয়া এবং প্রতিযোগিতার বাজারের মিশ্র রূপ। এই বাজারের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ :

(i) ক্রেতা ও বিক্রেতার সংখ্যা অনেক, তবে পূর্ণ প্রতিযোগিতার মতো অত বেশি নয়।

(ii) দ্রব্যগুলি একে অপরের ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত, কিন্তু সেগুলি সমজাতীয় নয়— ঈষৎ পৃথকীকৃত। কালার, ডিজাইন, গন্ধ ইত্যাদির ভিত্তিতে এই পৃথকীকরণ হতে পারে।

(iii) এই বাজারে অবাধ প্রবেশের অধিকার আছে। ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েই এই বাজারে অবাধে প্রবেশ করতে পারে বা বাজার থেকে বেরিয়ে যেতে পারে।

(iv) প্রতিটি বিক্রেতাই দাম নির্মাতা—দাম গ্রহীতা নয়।

(v) একচেটিয়া প্রতিযোগিতার বাজারে সকল ফার্মই পৃথকীকৃত দ্রব্য উৎপাদন করে। সেজন্য ক্রেতাদের অবহিত রাখার জন্য প্রতিটি ফার্মকেই কিছু বিজ্ঞাপন ব্যয় বহন করতে হয়।

এখন, একচেটিয়া প্রতিযোগিতার বাজারে আমরা ধরে নিচ্ছি যে প্রতিটি ফার্মই মুনাফা সর্বাধিক করতে চায়। সুতরাং কোনো ফার্ম সেই অবস্থায় ভারসাম্যে থাকবে যেখানে তার মুনাফা সর্বাধিক। মুনাফা সর্বাধিক করতে হলে নিম্নলিখিত দুটি শর্ত পূরণ করতে হবে :

(i) প্রথম ক্রমের শর্ত বা প্রয়োজনীয় শর্ত : MR = MC অর্থাৎ প্রান্তিক আয় = প্রান্তিক ব্যয়। MR > MC হলে বিক্রি বাড়ালে মুনাফা বাড়বে। আবার, MR < MC হলে বিক্রি কমালে মুনাফা বাড়বে। তাহলে মুনাফা সর্বাধিক করতে হলে MR = MC হওয়া দরকার।

(ii) দ্বিতীয় ক্রমের শর্ত বা পর্যাপ্ত শর্ত : MC রেখার ঢাল > MR রেখার ঢাল। চিত্রের ভাষায় বলতে গেলে, MC রেখা যেন MR রেখাকে নীচের দিক থেকে ছেদ করে।

□ ফার্মের ভারসাম্য : আমরা ৬.১৯নং চিত্রে একচেটিয়া প্রতিযোগিতার বাজারে একটি ফার্মের ভারসাম্য দেখিয়েছি। এই বাজারে ফার্মগুলি দাম নির্মাতা (price-maker) অর্থাৎ তারা দাম কমিয়ে বিক্রি বাড়াতে পারে, অথবা দাম বাড়িয়ে বিক্রি কমাতে পারে। সুতরাং p = AR রেখা নিম্নমুখী হবে। আবার, এই বাজারে দ্রব্যগুলির ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত দ্রব্য আছে। তাই p বা AR রেখা স্থিতিস্থাপক বা অনেকটা চেটালো হবে। আমরা p বা AR রেখাকে সরলরৈখিক বলে ধরে নিয়েছি। AR যেহেতু সরলরেখা ও নিম্নমুখী, MR

রেখাও সরলরেখা এবং নিম্নমুখী হবে। MC রেখা U-আকৃতির। আমাদের ছবিতে MC রেখা MR রেখাকে E বিন্দুতে নীচের দিক থেকে ছেদ করেছে। সুতরাং E বিন্দু হল ভারসাম্য বিন্দু, কারণ ঐ বিন্দুতে ভারসাম্যর উভয় শর্তই পালিত হয়েছে। ভারসাম্য অবস্থায় একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক ফার্ম OA দামে Oq_0 পরিমাণ দ্রব্য বিক্রি করবে। ফলে তার মোট রেভিনিউ হবে = দাম × দ্রব্যের পরিমাণ = OA × Oq_0 = □$OABq_0$। এখন, মুনাফার পরিমাণ জানতে হলে আমাদের মোট ব্যয় জানতে হবে। মোট ব্যয় জানার জন্য আমরা ফার্মের গড় ব্যয় রেখা (AC) টানলাম। এই AC রেখাও U আকৃতির। চিত্রে দেখা যাচ্ছে যে, Oq_0 পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে গড় ব্যয় = Cq_0 বা OD। সুতরাং, মোট ব্যয় = OD × Oq_0 = □$ODFq_0$। অতএব ফার্মের মুনাফা = মোট রেভিনিউ—মোট ব্যয় = □$OABq_0$ – □$ODFq_0$ = □ABFD। একে বলা হয় স্বাভাবিকের উদ্বৃত্ত মুনাফা (Super-normal profit or excess profit) বা অতিরিক্ত মুনাফা। কেননা মোট ব্যয়ের মধ্যে স্বাভাবিক মুনাফা ধরা আছে। অবশ্য স্বল্পকালে একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক ফার্ম সর্বদাই যে এরূপ উদ্বৃত্ত মুনাফা পাবে তার কোনো মানে নেই। ঐ ফার্মের রেভিনিউ এবং ব্যয় রেখাগুলির অবস্থান এমন হতে পারে যে, ফার্মটি কেবলমাত্র স্বাভাবিক মুনাফা পাচ্ছে অথবা এমনকি তার লোকসান হচ্ছে। তবে লোকসান যেন মোট স্থির ব্যয় (TFC) অপেক্ষা বেশি না হয়। লোকসান TFC অপেক্ষা বেশি হলে ফার্মটি উৎপাদন বন্ধ করে দেবে। স্বল্পকালে উৎপাদন বন্ধ রাখলেও ফার্মকে TFC বহন করতে হয়। তাই স্বল্পকালে লোকসান TFC অপেক্ষা কম হলে ফার্মের পক্ষে উৎপাদন চালিয়ে যাওয়াই লাভজনক।

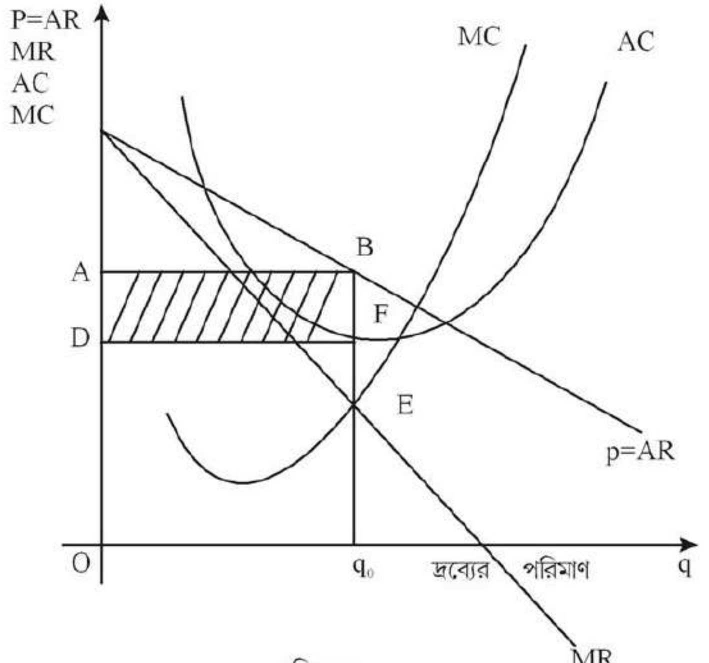

চিত্র ৬.১৯

□ **শিল্পের ভারসাম্য/গ্রুপ বা দলের ভারসাম্য (Industry/Group Equilibrium) :** একচেটিয়া প্রতিযোগিতার বাজারে শিল্পের ধারণাটি প্রযোজ্য নয়, কারণ শিল্প বলতে আমরা বুঝি সেই সমস্ত ফার্মের সমষ্টি যারা সমজাতীয় দ্রব্য উৎপাদন করছে। যেমন, কয়লার প্রতিটি কোলিয়ারি এক একটি ফার্ম। আর সমস্ত কোলিয়ারি মিলে হল কয়লা শিল্প। কিন্তু একচেটিয়া প্রতিযোগিতার বাজারে দ্রব্যগুলি এরূপ সমজাতীয় নয়। এক্ষেত্রে দ্রব্যগুলি প্রায় একজাতীয় কিন্তু ঈষৎ পৃথকীকৃত। তারা পরস্পরের ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত, কিন্তু পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারের ন্যায় সমজাতীয় (homogeneous) নয়। সেজন্য একচেটিয়া প্রতিযোগিতার বাজারে দল বা গ্রুপের ধারণা ব্যবহৃত হয়। এই বাজারে দল বা গ্রুপ বলতে সেই সমস্ত ফার্মের সমষ্টিকে বোঝায় যারা এমন দ্রব্য উৎপাদন করে যেগুলি একজাতীয় নয় কিন্তু সামান্য পৃথকীকৃত এবং পরস্পরের ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত। এই দল বা গ্রুপের ভারসাম্যর জন্য আগের দুটি শর্ত ছাড়াও আরো একটি শর্ত পালিত হতে হবে। সেটি হল :

(iii) নতুন ফার্ম ঐ গ্রুপে বা দলে প্রবেশ করবে না বা পুরনো ফার্ম ঐ গ্রুপ বা দল থেকে বেরিয়ে যাবে না। এই শর্তটি পূরণ হতে গেলে প্রতিটি একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক ফার্মকে কেবলমাত্র স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করতে হবে অর্থাৎ TR = TC বা, p = LAC হতে হবে।

৬.২০ নং চিত্রে আমরা একচেটিয়া প্রতিযোগিতার বাজারে গ্রুপ বা দলের ভারসাম্য দেখিয়েছি। ঊর্ধ্বমুখী LMC রেখা নিম্নমুখী MR রেখাকে E বিন্দুতে ছেদ করেছে। সুতরাং ঐ বিন্দুতে ভারসাম্যর প্রথম ও দ্বিতীয় ক্রমের শর্ত পূরণ হচ্ছে। E বিন্দুতে ভারসাম্য উৎপাদন ও বিক্রির পরিমাণ Oq_0 এবং ভারসাম্য দাম = OA বা Bq_0। এখন, যদি LAC রেখা B বিন্দুতে AR রেখাকে স্পর্শ করে, তাহলে p = LAC হবে। তখন, $p \times q = LAC \times q$ বা, মোট রেভিনিউ = মোট ব্যয়। ফলে তখন ফার্মটি শুধুমাত্র স্বাভাবিক মুনাফা ভোগ করবে। ফলে কোনো নতুন ফার্ম ঐ গ্রুপে বা দলে প্রবেশ করবে না বা পুরনো কোনো ফার্ম ঐ গ্রুপ বা দল থেকে বেরিয়ে যাবে না। এর ফলে সমগ্র গ্রুপ বা দলটি ভারসাম্যে থাকবে। এটিই হল একচেটিয়া প্রতিযোগিতার বাজারে গ্রুপ বা দলের ভারসাম্য।

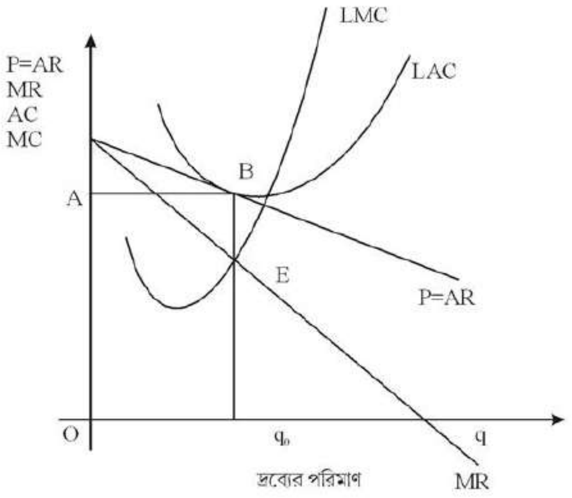

চিত্র ৬.২০

দীর্ঘকালীন ভারসাম্য (Long run Equilibrium) : একচেটিয়া প্রতিযোগিতার বাজারে দীর্ঘকালে প্রতিটি ফার্ম কেবলমাত্র স্বাভাবিক মুনাফা পাবে। কারণ ফার্মগুলি স্বাভাবিকের বেশি মুনাফা পেলে সেই মুনাফা দেখে নতুন ফার্ম আকৃষ্ট হবে। ঐ ফার্মগুলি তখন বাজারে প্রবেশ করবে। গ্রুপে ফার্মের সংখ্যা বাড়বে। দ্রব্যের জোগান বাড়বে। ফলে দাম কমবে। দাম কমলে মুনাফা কমবে। যতক্ষণ পর্যন্ত মুনাফা স্বাভাবিক মুনাফা অপেক্ষা বেশি হবে, ততক্ষণ এই প্রক্রিয়া চলতে থাকবে এবং অবশেষে উদ্বৃত্ত মুনাফা বলে কিছু থাকবে না। তেমনি, যদি স্বল্পকালে ফার্মগুলি লোকসান করে তাহলে অপেক্ষাকৃত দুর্বল ফার্মগুলি দীর্ঘকালে গ্রুপ থেকে বেরিয়ে যাবে। ফলে গ্রুপে ফার্মের সংখ্যা কমবে। দ্রব্যের জোগান কমবে এবং দাম বাড়বে। ফলে পুরনো ফার্মগুলির লোকসান কমবে। যতক্ষণ পর্যন্ত বাজারে লোকসান থাকবে, এই প্রক্রিয়া ততক্ষণ পর্যন্ত চলতে থাকবে। অবশেষে প্রতিটি ফার্ম কেবলমাত্র স্বাভাবিক মুনাফা পাবে।

এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দীর্ঘকালীন ভারসাম্যে p = LAC হয় এবং সেখানে প্রতিটি ফার্ম কেবলমাত্র স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করে। একচেটিয়া প্রতিযোগিতার বাজারেও দীর্ঘকালীন ভারসাম্যে p = LAC হয় এবং বাজারের প্রতিটি ফার্ম কেবলমাত্র স্বাভাবিক মুনাফা ভোগ করে। কিন্তু দুটি অবস্থার মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য আছে। পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে দাম স্থির এবং সেজন্য p = MR রেখা একটি অনুভূমিক সরলরেখা। ফলে p = MR রেখা U-আকৃতির LAC রেখার সর্বনিম্ন বিন্দুতে স্পর্শ করে এবং ঐ বিন্দুতে p = LAC হয়। অর্থাৎ পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে দীর্ঘকালে ফার্মগুলি LAC রেখার সর্বনিম্ন বিন্দুতে উৎপাদন করে এবং তাদের সম্পদের সর্বোত্তম ও কাম্য ব্যবহার ঘটে। কিন্তু একচেটিয়া প্রতিযোগিতার বাজারে p বা AR রেখা নিম্নমুখী। এরূপ রেখা U আকৃতির LAC রেখার সর্বনিম্ন বিন্দুতে স্পর্শ করতে পারে না। এখানে p = AR রেখা LAC রেখার সর্বনিম্ন বিন্দুর বাঁদিকে কোনো বিন্দুতে স্পর্শ করে। এক্ষেত্রে ভারসাম্য উৎপাদনের পরিমাণ সর্বোত্তম বা কাম্য উৎপাদন অপেক্ষা কম। এর অর্থ হল, একচেটিয়া প্রতিযোগিতার বাজারে দীর্ঘকালে ফার্মের উদ্বৃত্ত উৎপাদন ক্ষমতা (excess capacity) থাকবে। অনেকে এজন্য একচেটিয়া প্রতিযোগিতার বাজারকে অপচয়মূলক (wasteful) বলে মনে করেন। অবশ্য চেম্বারলিন এরূপ বাজারকে অপচয়মূলক বলে মনে করেন না। তাঁর মতে, এটি বিভিন্ন ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত দ্রব্য থেকে ভোগকারীর নির্বাচনের স্বাধীনতা ভোগ করার সামাজিক ব্যয় (social cost)।

৬.১৫ অলিগোপলি বাজারের ধারণা ও বৈশিষ্ট্যসমূহ

গ্রিক ভাষায় 'Oligos' শব্দের অর্থ ক্ষুদ্র (small), 'oligoi' শব্দের অর্থ হল কয়েকটি বা কতিপয়। সুতরাং সাধারণভাবে 'oligo' কথাটির অর্থ হল কয়েকটি বা অল্প সংখ্যক। আর, poly শব্দের অর্থ হল বহুসংখ্যক (many) বা অনেক পরিমাণ (much)। অর্থনীতিতে oligopoly বাজার বলতে এমন বাজারকে বোঝায় যে বাজারে অল্প কয়েকজন (few) বিক্রেতা এবং অনেক (many) ক্রেতা আছে। এখানে অল্প সংখ্যক (few) বিক্রেতা বলতে বোঝানো হচ্ছে, বিক্রেতার সংখ্যা এমন যে তাদের মধ্যে পরস্পর নির্ভরশীলতা

আছে। এর অর্থ হল, কোনো একজন বিক্রেতা যদি বিক্রয় কৌশলে পরিবর্তন ঘটায়, তাহলে তার প্রতিদ্বন্দ্বী বিক্রেতারাও তাদের বিক্রয় কৌশলে কোনো না কোনো পরিবর্তন ঘটাবে। যেমন, মনে করি, কোনো এক অলিগোপলি বিক্রেতা তার দ্রব্যের দাম কমাল। এর প্রতিক্রিয়ায় ঐ বিক্রেতার প্রতিদ্বন্দ্বী বিক্রেতারা তাদের দ্রব্যের দাম কমাতে পারে, অথবা বিজ্ঞাপন ব্যয় বাড়াতে পারে, অথবা ক্রেতাদের বাড়িতে বিনা খরচে বা কম খরচে দ্রব্যটি পৌঁছে দিতে পারে ইত্যাদি। অলিগোপলি বাজারে দ্রব্যটি সমজাতীয় হতে পারে, আবার সামান্য পৃথকীকৃত হতে পারে। দ্রব্যটি সমজাতীয় হলে তাকে বলে বিশুদ্ধ বা পূর্ণাঙ্গ অলিগোপলি (perfect oligopoly or oligopoly without product differentiation), আর দ্রব্যগুলি পৃথকীকৃত হলে তাকে বলে অপূর্ণাঙ্গ অলিগোপলি বা পৃথকীকৃত অলিগোপলি (imperfect oligopoly or oligopoly with product differentiation)।

অলিগোপলি বাজারের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে যার ফলে এই বাজারে আলোচনার চিরাচরিত কৌশলের দ্বারা বিক্রেতাদের আচরণ ব্যাখ্যা করা যায় না। সংক্ষেপে সেই বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ :

প্রথমত, এই বাজারে বিক্রেতার সংখ্যা অল্প কয়েকজন (few) বলে তাদের আচরণে পরস্পর নির্ভরশীলতা (interdependence) থাকে। এখানে একজন বিক্রেতার কোনো সিদ্ধান্ত অপর বিক্রেতার সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে। ফলে প্রতিটি বিক্রেতাকেই তার নিজের কৌশল সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে গেলে অপর বিক্রেতার সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে অনুমান করতে হয়। যেমন, একজন বিক্রেতা তার দ্রব্যের দাম কমানোর কথা বিবেচনা করার সময় এর সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া প্রতিদ্বন্দ্বী বিক্রেতাদের মধ্যে কীরূপ হতে পারে, তাও বিবেচনা করতে হয়।

দ্বিতীয়ত, আমরা জানি, কোনো দ্রব্যের চাহিদা একাধিক বিষয়ের উপর নির্ভর করে, যেমন, ঐ দ্রব্যের দাম, ভোগকারীর আয়, পরিবর্ত দ্রব্যের দাম, পরিপূরক দ্রব্যের দাম, বিজ্ঞাপন ব্যয় প্রভৃতি। দ্রব্যের নিজস্ব দাম ছাড়া অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকছে ধরে নিয়ে আমরা চাহিদা রেখা অঙ্কন করি। কিন্তু অলিগোপলির বাজারে কোনো ফার্ম তার দ্রব্যের দাম পরিবর্তন করলে অন্যান্য প্রতিযোগী ফার্ম কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানাবে তা ঐ বিশেষ বিক্রেতার জানা নেই। তারা তাদের দ্রব্যের দাম পরিবর্তন করতে পারে, বিজ্ঞাপন ব্যয়ের পরিবর্তন করতে পারে ইত্যাদি। সেক্ষেত্রে অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকছে না। তাই ফার্মের চাহিদা রেখাটি নির্দিষ্টভাবে জানা যাচ্ছে না। সেজন্য অলিগোপলি বাজারে ফার্মের সম্মুখস্থ চাহিদা রেখা আঁকা যায় না।

তৃতীয়ত, অলিগোপলি বাজারে একজন বিক্রেতার কার্যকলাপ দল বা গ্রুপের অন্যান্য ফার্মকে প্রভাবিত করে। তাই অলিগোপলি বাজারের কার্যকলাপ ব্যাখ্যা করতে হলে আমাদের গ্রুপ বা দলের আচরণ সম্পর্কে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। কিন্তু গ্রুপ বা দলের আচরণ ব্যাখ্যা করার কোনো সর্বসম্মত তত্ত্ব নেই। অলিগোপলি বাজারের ভারসাম্য আলোচনায় বা বিক্রেতাদের আচরণ বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে এটি একটি বড় সমস্যা।

চতুর্থত, আমরা উল্লেখ করেছি যে, অলিগোপলির বাজারে কোনো ফার্মের সম্মুখস্থ চাহিদা রেখা (p বা AR) টানা যায় না। আর p বা AR রেখা টানা যায় না বলে এর সংশ্লিষ্ট MR বা প্রান্তিক রেখা টানা যায় না। এখন, চিরাচরিত তত্ত্বে মুনাফা সর্বাধিককরণের শর্ত হল দুটি : (i) MR = MC এবং (ii) MC রেখার ঢাল > MR রেখার ঢাল। অলিগোপলির বাজারে MR রেখা টানা যায় না বলে মুনাফা সর্বাধিক করার এই চিরাচরিত পদ্ধতি বা কৌশল প্রয়োগ করা যায় না।

অলিগোপলি বাজারের এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যের কারণে বলা হয় যে, অলিগোপলি বাজারে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ অনিরূপণযোগ্য (indeterminate)। বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ বিভিন্ন ধরনের অনুমানের ভিত্তিতে বিভিন্ন রকমের মডেল বা তত্ত্ব প্রণয়ন করেছে। সেই মডেল বা তত্ত্বগুলি বর্তমান এককের আলোচ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত নয়।

৬.১৬ সারাংশ

১. পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার (Perfect Competition) : যে বাজারে অসংখ্য ক্রেতা ও অসংখ্য বিক্রেতা একটি সমজাতীয় দ্রব্যের কেনাবেচা করে এবং যে বাজারে ক্রেতা ও বিক্রেতা অবাধে প্রবেশ করতে অথবা অবাধে বাজার থেকে প্রস্থান করতে পারে, সেই বাজারকে পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার বলে।

২. পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে, ফার্মের স্বল্পকালীন ভারসাম্য (Short run Equilibrium of a Firm under Perfect Competition) : পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ফার্মের স্বল্পকালীন ভারসাম্যর শর্ত দুটি : (i) প্রয়োজনীয় বা প্রথম ক্রমের শর্ত : p = MC (ii) পর্যাপ্ত বা দ্বিতীয় ক্রমের শর্ত : MC রেখার ঢাল > 0 স্বল্পকালে একটি পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক উদ্বৃত্ত মুনাফা, স্বাভাবিক মুনাফা অথবা এমনকি লোকসান হতে পারে। অবশ্য যদি লোকসান হয়, তাহলে সেই লোকসান যেন TFC অপেক্ষা বেশি না হয়। লোকসান যদি TFC অপেক্ষা বেশি হয় তাহলে ফার্ম উৎপাদন বন্ধ করে দেবে।

৩. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক ফার্মের স্বল্পকালীন জোগান রেখা (Short run Supply Curve of a Firm under Perfect Competition) : পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে ফার্মের MC রেখা থেকে ফার্মের জোগান রেখা পাওয়া যায়। MC ও AVC রেখার ছেদবিন্দুর ডানদিকে MC-র উর্ধ্বমুখী অংশই হল ফার্মের জোগান রেখা।

৪. পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে ফার্ম ও শিল্পের দীর্ঘকালীন ভারসাম্য (Long run Equilibrium of Firm and Industry under Perfect Competition) : পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দীর্ঘকালে প্রত্যেকটি ফার্ম কেবলমাত্র স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করবে এবং LAC রেখার সর্বনিম্ন বিন্দুতে উৎপাদন করবে। ফলে এই বাজারে সম্পদের সর্বোত্তম বা কাম্য ব্যবহার ঘটে। প্রতিটি ফার্ম কেবলমাত্র স্বাভাবিক মুনাফা পায় বলে নতুন ফার্ম ঐ বাজারে প্রবেশ করে না বা পুরনো ফার্ম বাজার থেকে বেরিয়ে যায় না।

ফলে সমগ্র শিল্পটিও ভারসাম্যে থাকে। পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে ফার্ম ও শিল্পের দীর্ঘকালীন ভারসাম্যর শর্ত হল :

$$p\ (= MR) = SMC = LMC = SAC = LAC$$

৫. পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে দাম নির্ধারণ এবং চাহিদা ও জোগানের পরিবর্তনের প্রভাব (Price Determination under Perfect Competition and Effect of Change in Demand and Supply) : পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে মোট চাহিদা ও মোট জোগানের ঘাত-প্রতিঘাতে বাজার দাম নির্ধারিত হয়। বাজারের সমস্ত ক্রেতাদের চাহিদা যোগ করে বাজার চাহিদা রেখা পাওয়া যায়। তেমনি, সমস্ত ফার্মগুলির জোগান রেখাগুলি যোগ করে বাজার জোগান রেখা পাওয়া যায়। এই দুই রেখার ছেদবিন্দুতে ভারসাম্য দাম নির্ধারিত হয়। এখন, যদি শুধু চাহিদা বাড়ে, তাহলে দাম বাড়বে এবং শুধু চাহিদা কমলে দাম কমবে। তেমনি, যদি শুধু জোগান বাড়ে, তাহলে ভারসাম্য দাম কমবে এবং শুধু জোগান কমলে দাম বাড়বে। যদি চাহিদা ও জোগান একসাথে পরিবর্তিত হয় তাহলে ভারসাম্য দাম কমতে পারে, বাড়তে পারে, আবার একই থাকতে পারে। সেটি নির্ভর করবে চাহিদা ও জোগানের পরিবর্তনের দিক ও হারের উপর।

৬. একচেটিয়া বাজার ও তা উদ্ভবের কারণ (Monopoly and Causes of its Emergence) : যে বাজারে একজন বিক্রেতা ও অনেক ক্রেতা থাকে, দ্রব্যটির কোনো ঘনিষ্ঠ বিকল্প থাকে না এবং যে বাজারে নতুন ফার্ম প্রবেশ করতে পারে না। সেই বাজারকে একচেটিয়া বাজার বলে। বাস্তবে একচেটিয়া বাজার উদ্ভবের পিছনে প্রধান কারণগুলি : গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামালের একক মালিকানা, দ্রব্যটির উৎপাদন কৌশল কেবল একটি ফার্মের জানা আছে, সরকারি নিয়ন্ত্রণ, পেটেন্ট আইন, সংকীর্ণ বাজার, দ্রব্যটির পুনরুৎপাদনের সম্ভাবনা না-থাকা প্রভৃতি।

৭. AR (বা p), MR এবং চাহিদার দামগত স্থিতিস্থাপকতার মধ্যে সম্পর্ক (Relation among p or AR, MR and Price Elasticity of Demand) : দাম বা AR, MR এবং চাহিদার দামগত স্থিতিস্থাপকতার (|e|) মধ্যে সম্পর্ক হল : $MR = p\left(1-\frac{1}{|e|}\right) = AR\left(1-\frac{1}{|e|}\right)$

৮. একচেটিয়া বাজারে স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন ভারসাম্য (Short run and Long run Equilibrium under Monopoly) : একচেটিয়া কারবারির ভারসাম্যর শর্ত হল দুটি : (i) প্রয়োজনীয় বা প্রথম ক্রমের শর্ত : MR = MC (ii) পর্যাপ্ত বা দ্বিতীয় ক্রমের শর্ত : MC রেখার ঢাল > MR রেখার ঢাল। স্বল্পকালে ভারসাম্য বিন্দুতে একচেটিয়া বিক্রেতা স্বাভাবিকের বেশি মুনাফা পেতে পারে, কেবলমাত্র স্বাভাবিক মুনাফা পেতে পারে অথবা তার লোকসান হতে পারে। অবশ্য এই লোকসানের পরিমাণ TFC অপেক্ষা বেশি হলে চলবে না। দীর্ঘকালে একচেটিয়া কারবারি কেবলমাত্র স্বাভাবিক মুনাফা অথবা স্বাভাবিকের বেশি মুনাফা পেতে পারে।

৯. একচেটিয়া ক্ষমতার মাত্রা (Degree of Monopoly Power) : একচেটিয়া বিক্রেতার দাম বাড়ানোর ক্ষমতা কতটা অর্থাৎ দ্রব্যের দামের উপর তার নিয়ন্ত্রণ কতটা, তাই-ই পরিমাপ করা হয় একচেটিয়া ক্ষমতার মাত্রার ধারণা দ্বারা। অধ্যাপক লার্নারের সূত্র অনুযায়ী, একচেটিয়া ক্ষমতার মাত্রা বা সূচক $= \frac{P - MC}{P}$। দেখানো যায় যে, এটি চাহিদার দামগত স্থিতিস্থাপকতার পরম মানের অন্যোন্যকের সমান $\left(\frac{1}{|e|}\right)$। |e|-র মান যত বড় হবে, একচেটিয়া ক্ষমতার মাত্রা তত কম হবে। আর |e|-র মান যত কম হবে, একচেটিয়া ক্ষমতার মাত্রা তত বড় হবে। লার্নারের সূচকের মান শূন্য থেকে একের মধ্যে বিরাজ করে।

১০. দাম স্বতন্ত্রকারী একচেটিয়া কারবার (Price Discriminating Monopoly) : একই দ্রব্য ভিন্ন ভিন্ন ক্রেতার নিকট ভিন্ন ভিন্ন দামে বিক্রি করাকে বলে দাম স্বতন্ত্রীকরণ। একচেটিয়া বাজারে এটা ঘটতে পারে। যে একচেটিয়া কারবারি এই দাম স্বতন্ত্রীকরণ করে থাকে তাকে দাম স্বতন্ত্রকারী বা মূল্য বিভেদকারী একচেটিয়া কারবার বলে। ক্রেতার আচরণ, দ্রব্যের প্রকৃতি, বিভিন্ন বাজারের মধ্যে আঞ্চলিক দূরত্ব ইত্যাদি নানা কারণে দাম স্বতন্ত্রীকরণ হতে পারে। দাম স্বতন্ত্রীকরণ লাভজনক হতে গেলে বিভিন্ন উপবাজারে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার মান ভিন্ন হতে হবে।

১১. বিভিন্ন ধরনের দাম স্বতন্ত্রীকরণ (Different Types of Price Discrimination) : দাম স্বতন্ত্রীকরণ প্রধানত তিন প্রকার : ব্যক্তিভেদে দাম স্বতন্ত্রীকরণ, স্থানভেদে দাম স্বতন্ত্রীকরণ এবং দ্রব্যের ব্যবহার ভেদে দাম স্বতন্ত্রীকরণ। আবার, অধ্যাপক পিগু দাম স্বতন্ত্রীকরণকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন : প্রথম মাত্রার দাম স্বতন্ত্রীকরণ, দ্বিতীয় মাত্রার দাম স্বতন্ত্রীকরণ এবং তৃতীয় মাত্রার দাম স্বতন্ত্রীকরণ।

১২. দাম স্বতন্ত্রীকরণ কি কাম্য ? (Is Price Discrimination Desirable?) : দাম স্বতন্ত্রীকরণ কাম্য কিনা তার উত্তর এক কথায় দেওয়া যায় না। দাম স্বতন্ত্রীকরণের নানা অর্থনৈতিক ও সামাজিক তাৎপর্য আছে। তাই নানা বিশেষ পরিস্থিতিতে দাম স্বতন্ত্রীকরণ কাম্য বলে বিবেচিত হতে পারে।

১৩. একচেটিয়া প্রতিযোগিতার বাজার (Monopolistic Competition) : যে বাজারে অনেক ক্রেতা ও অনেক বিক্রেতা প্রায় সমজাতীয় কিন্তু ঈষৎ পৃথকীকৃত দ্রব্যের কেনাবেচা করে, সেই বাজারকে একচেটিয়া প্রতিযোগিতার বাজার বলে। এই বাজারে নতুন ফার্ম অবাধে প্রবেশ বা প্রস্থান করতে পারে। এই বাজারে ফার্মের ভারসাম্যর শর্ত হল দুটি : (i) প্রথম ক্রমের শর্ত বা প্রয়োজনীয় শর্ত : MR = MC, (ii) দ্বিতীয় ক্রমের শর্ত বা পর্যাপ্ত শর্ত : MC রেখার ঢাল > MR রেখার ঢাল। স্বল্পকালে ফার্মটি স্বাভাবিকের বেশি মুনাফা অথবা কেবল স্বাভাবিক মুনাফা পেতে পারে, এমনকি তার লোকসানও হতে পারে। অবশ্য লোকসান হলে তা যেন TFC অপেক্ষা কম হতে হবে। নতুবা ফার্মটি উৎপাদন বন্ধ করে দেবে। দীর্ঘকালে অবশ্য একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক ফার্ম কেবলমাত্র স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করবে। একচেটিয়া

প্রতিযোগিতার বাজারে শিল্পের বদলে গ্রুপের ধারণাটি ব্যবহার করা হয়। এই গ্রুপের ভারসাম্য পেতে গেলে আরো একটি শর্ত পালিত হওয়া দরকার। সেটি হল : কোনো নতুন ফার্ম ঐ গ্রুপে প্রবেশ করবে না অথবা গ্রুপ থেকে বেরিয়ে যাবে না। সেটি হতে গেলে গ্রুপের প্রতিটি ফার্মকে স্বাভাবিক মুনাফা পেতে হবে।

১৪. অলিগোপলি বাজার (Oligopoly Market) : যে বাজারে কয়েকজন বিক্রেতা ও অনেক ক্রেতা সমজাতীয় অথবা ঈষৎ পৃথকীকৃত দ্রব্যের কেনাবেচা করে, সেই বাজারকে অলিগোপলি বাজার বলে। এই বাজারের কয়েকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল : (i) প্রতিদ্বন্দ্বী ফার্মগুলির আচরণে পরস্পর নির্ভরশীলতা, (ii) ফার্মের সম্মুখস্থ চাহিদা রেখা অজ্ঞাত, (iii) ফার্মগুলির ক্ষেত্রে গ্রুপ বা দলের আচরণ কাজ করে এবং (v) ভারসাম্য নির্ধারণে চিরাচরিত পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায় না।

৬.১৭ অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্নাবলি : (প্রতিটি ২ নম্বরের) (Short Answer Type Questions : Each of 2 Marks)

১. বাজার কাকে বলে?

২. বাজারের প্রধান কাজ কী?

৩. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার কাকে বলে?

৪. একচেটিয়া বাজার কাকে বলে?

৫. একচেটিয়া প্রতিযোগিতার বাজার কাকে বলে?

৬. অলিগোপলি বাজার কাকে বলে?

৭. দ্বিপাক্ষিক একচেটিয়া বাজার কাকে বলে?

৮. আয়-ব্যয় সমতার বিন্দু কাকে বলে?

৯. সমভঙ্গ বিন্দু কাকে বলে?

১০. উৎপাদন বন্ধের বিন্দু কাকে বলে?

১১. পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে p ও MR-এর সম্পর্ক কী?

১২. পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে TR রেখার আকৃতি কেমন?

১৩. পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে AR ও MR রেখার আকৃতি কেমন?

১৪. পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে ফার্মের স্বল্পকালীন ভারসাম্যর শর্ত দুটি কী কী?

১৫. একচেটিয়া বাজারে AR ও MR রেখার আকৃতি কেমন?

১৬. একচেটিয়া কারবারির ভারসাম্যর শর্তগুলি কী কী?

১৭. দেখান যে একচেটিয়া বাজারে ভারসাম্য বিন্দুতে $p > MC$.

১৮. AR, MR ও $|e|$-র মধ্যে সম্পর্কটি লিপিবদ্ধ করুন।

১৯. একচেটিয়া ফার্ম কি দীর্ঘকালে স্বাভাবিকের বেশি মুনাফা পেতে পারে?

২০. একচেটিয়া ক্ষমতার মাত্রা কাকে বলে?

২১. লার্নারের সূচকের সংজ্ঞা দিন।

২২. দেখান যে, লার্নারের সূচক $= \frac{1}{|e|}$

২৩. একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় বিজ্ঞাপন ব্যয় থাকে কেন?

২৪. একচেটিয়া প্রতিযোগিতার বাজারে কি সম্পদের কাম্য ব্যবহার ঘটে?

২৫. অলিগোপলি বাজারের একটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।

২৬. দাম স্বতন্ত্রীকরণ কাকে বলে?

২৭. ব্যক্তিভেদে দাম স্বতন্ত্রীকরণের একটি উদাহরণ দিন।

২৮. ব্যবহারভেদে দাম স্বতন্ত্রীকরণের একটি উদাহরণ দিন।

২৯. দাম স্বতন্ত্রীকরণ কখন লাভজনক?

৩০. দাম স্বতন্ত্রীকরণ কি কাম্য?

মাঝারি দৈর্ঘ্যের উত্তরের প্রশ্নাবলি : (প্রতিটি ৫ নম্বরের) (Medium Answer Type Questions : Each of 5 Marks)

১. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের প্রধান অনুমানগুলি উল্লেখ করুন।

২. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক ফার্মের স্বল্পকালীন জোগান রেখা অঙ্কন করুন।

৩. একচেটিয়া বাজারের বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করুন।

৪. একচেটিয়া বাজারের উদ্ভবের কারণগুলি লিপিবদ্ধ করুন।

৫. AR, MR ও |e|-র মধ্যে সম্পর্ক গাণিতিকভাবে নির্ণয় করুন।

৬. পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে TR, AR এবং MR রেখা অঙ্কন করুন।

৭. কখন দাম স্বতন্ত্রীকরণ সম্ভব?

৮. একচেটিয়া কারবারীর ক্ষমতার মাত্রা বলতে কী বোঝেন?

৯. একচেটিয়া কারবারী কি তার দ্রব্যের যা খুশি তাই দাম নিতে পারে?

১০. MC রেখা নিম্নমুখী হলে কি একচেটিয়া বাজারে ভারসাম্য অর্জিত হতে পারে?

১১. দেখান যে একচেটিয়া কারবারি চাহিদা রেখার অস্থিতিস্থাপক অংশে ভারসাম্যে থাকবে না।

১২. দাম স্বতন্ত্রীকরণ কত রকমের ও কী কী?

১৩. অলিগোপলি বাজারের বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করুন।

১৪. একচেটিয়া কারবারির ভারসাম্যর শর্তগুলি বর্ণনা করুন।

১৫. একচেটিয়া কারবারির দাম বাড়ানোর ক্ষমতার সীমা বলতে কী বোঝেন?

১৬. একচেটিয়া ক্ষমতার মাত্রা আপনি কীভাবে পরিমাপ করবেন?

দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্নাবলি : (প্রতিটি ১০ নম্বরের) (Long Answer Type Questions : Each of 10 Marks)

১. প্রমাণ করুন যে, $MR = AR\left(1 - \frac{1}{|e|}\right)$

২. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একটি ফার্মের স্বল্পকালীন ভারসাম্যর শর্তগুলি আলোচনা করুন।

৩. পূর্ণ প্রতিযোগিতায় কোনো ফার্মের দীর্ঘকালীন ভারসাম্য অবস্থা বর্ণনা করুন।

৪. পূর্ণ প্রতিযোগিতায় দীর্ঘকালে শিল্পের ভারসাম্য অর্জনের শর্তগুলি কী কী?

৫. পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে ভারসাম্য দাম কীভাবে নির্ধারিত হয়? এই দামের উপর চাহিদা বা জোগানের পরিবর্তনের প্রভাব আলোচনা করুন।

৬. একচেটিয়া কারবারির স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন ভারসাম্য বর্ণনা করুন।

৮. মূল্য প্রভেদকারী একচেটিয়া কারবারির ভারসাম্য আলোচনা করুন।

৯. একচেটিয়া প্রতিযোগিতার বাজারে ফার্ম ও গ্রুপের ভারসাম্য বর্ণনা করুন।

১০. একচেটিয়া প্রতিযেতাগিতার বাজারে স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন ভারসাম্যর শর্তাবলি আলোচনা করুন।

৬.১৮ নির্বাচিত গ্রন্থাবলি

১. Kuotsoyiannis, A. (1979) : Modern Mocroeconomics, Macmillan

২. Salvatore, D. (2009) : Managerial Economics, Oxford University Press.

৩. ——— (2009) : Principles of Microeconomics, Oxford University Press

৪. Samuelson, P.A. & W.D. Nordhaus (1986) : Economics, McGraw Hill.

৫. Sarkhel, J & S. Salim (2016) : An Introduction to Business Economics, Book Syndicate Private Limited.

৬. সরখেল, জয়দেব, সেখ সেলিম ও সন্তোষ কুমার দত্ত (2018) : ব্যষ্টিগত অর্থনীতি ও রাশিবিজ্ঞান, বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড।

৭. সরখেল, জয়দেব ও সেখ সেলিম (2019) : ব্যষ্টিগত অর্থনীতি ও ভারতের অর্থনীতি, বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড।

একক ৭ ❑ বণ্টন তত্ত্ব

গঠন

৭.১ উদ্দেশ্য

৭.২ প্রস্তাবনা

৭.৩ বণ্টন সম্পর্কে প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্ত্ব

৭.৩.১ কিছু সংশ্লিষ্ট ধারণা

৭.৩.২ প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্বটির অনুমানসমূহ

৭.৩.৩ তত্ত্বটির ব্যাখ্যা

৭.৩.৪ তত্ত্বটির সীমাবদ্ধতা

৭.৪ শ্রমের জোগান রেখার আকৃতি

৭.৫ মজুরি নির্ধারণের আধুনিক তত্ত্ব

৭.৬ শ্রমিকের শোষণ

৭.৭ শ্রমিক সংঘ এবং এর কার্যাবলি

৭.৮ সুদের হারের তত্ত্ব

৭.৮.১ সুদের হারের প্রাচীন তত্ত্ব

৭.৮.২ সুদের হার সম্পর্কে ঋণযোগ্য তহবিল তত্ত্ব বা নয়া-প্রাচীন তত্ত্ব

৭.৮.৩ সুদের হারের তারল্য পছন্দ তত্ত্ব

৭.৮.৪ তারল্যের ফাঁদের ধারণা

৭.৯ মুনাফা ও তার উপাদানসমূহ

৭.১০ মুনাফা সম্পর্কে বিভিন্ন তত্ত্ব

৭.১০.১ ঝুঁকি বহন তত্ত্ব

৭.১০.২ অনিশ্চয়তা বহন তত্ত্ব

৭.১০.৩ মুনাফার উদ্ভাবন তত্ত্ব

৭.১০.৪ মুনাফার গতিশীলতা তত্ত্ব

৭.১১ দীর্ঘকালে কি মুনাফা থাকে?

৭.১২ সারাংশ

৭.১৩ অনুশীলনী

৭.১৪ নির্বাচিত গ্রন্থতালিকা

৭.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে শিক্ষার্থীরা জানতে পারবে

- বণ্টন তত্ত্ব বলতে কী বোঝায়?
- মজুরি কীভাবে নির্ধারিত হয়
- সুদের হার নির্ধারণের বিভিন্ন তত্ত্ব
- মুনাফা সম্পর্কে বিভিন্ন তত্ত্ব

৭.২ প্রস্তাবনা

কোনো দ্রব্য উৎপাদন করতে চার রকমের উপাদান লাগে। সেগুলি হল : জমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন। দ্রব্যটি উৎপন্ন হবার পর বাজারে বিক্রি করে পাওয়া যায় রেভিনিউ। এই রেভিনিউ এখন চারটি উপাদানের মধ্যে ভাগ বা বণ্টন করে দিতে হবে। জমির মালিক পাবে খাজনা, শ্রমিক পাবে মজুরি, মূলধনের মালিক পাবে সুদ এবং সংগঠক পাবে মুনাফা। এই রেভিনিউ কীভাবে চারটি উপাদানের মধ্যে বণ্টিত হবে সেটিই ব্যষ্টিগত অর্থনীতির বণ্টন তত্ত্বের মূলকথা। এখন, জমি, শ্রম, মূলধন প্রভৃতি উপাদানের প্রাপ্য কতটা তা নির্ধারণ করতে হলে এই উপাদানগুলির দাম কীভাবে নির্ধারিত হয় তা জানা দরকার। সুতরাং বণ্টন তত্ত্ব উপাদানগুলির দাম কীভাবে নির্ধারিত হয় তাই আলোচনা করে। এজন্য বণ্টন তত্ত্বকে উপাদানের দাম নিরূপণ তত্ত্বও (Theory of factor pricing) বলা হয়।

৭.৩ বণ্টন সম্পর্কে প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্ত্ব

অর্থনীতিতে বণ্টন তত্ত্ব কথাটি দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয়।

প্রথমত, সমষ্টিগত অর্থনীতিতে বণ্টন তত্ত্ব বলতে জাতীয় আয়ের বণ্টনের নীতিকে বোঝানো হয়।

দ্বিতীয়ত, ব্যষ্টিগত অর্থনীতিতে বণ্টন তত্ত্ব বলতে ফার্মের রেভিনিউ উপাদানগুলির মধ্যে বণ্টনের

নীতিকে বোঝানো হয়। এক কথায়, খাজনা, মজুরি, সুদ প্রভৃতি উপাদান-মূল্য কীভাবে নির্ধারিত হবে তা-ই ব্যষ্টিগত অর্থনীতির বণ্টন তত্ত্বের মূল আলোচ্য বিষয়। আমরা এখানে ব্যষ্টিগত অর্থনীতির বণ্টন তত্ত্ব নিয়েই আলোচনা করব। এটি আলোচনা করতে গেলে তত্ত্বটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিছু ধারণা (concepts) সম্পর্কে জানা প্রয়োজন।

৭.৩.১ কিছু সংশ্লিষ্ট ধারণা (Some Related Concepts)

বণ্টন সম্পর্কে প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্ত্ব আলোচনা করতে হলে আমাদের প্রথমেই জানা দরকার প্রান্তিক উৎপাদন বলতে ঠিক কী বোঝায়? কোনো উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতাকে তিন ভাবে পরিমাপ করা যেতে পারে। সেগুলি হল : (i) প্রান্তিক বাস্তব উৎপাদন (Marginal Physical Product বা MPP), প্রান্তিক উৎপাদনের মূল্য (Value of the Marginal Product বা VMP) এবং প্রান্তিক রেভিনিউ উৎপাদন (Marginal Revenue Product বা MRP)। ধারণা তিনটিকে সংক্ষেপে নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে।

প্রান্তিক বাস্তব উৎপাদন (MPP) : অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত অবস্থায় কোনো একটি উপাদান এক একক বেশি নিয়োগ করলে মোট উৎপাদন যতটা বাড়ে সেটি ঐ উপাদানের ঐ ইউনিটের প্রান্তিক বাস্তব উৎপাদন। উদাহরণস্বরূপ, ৭ জন শ্রমিক নিয়োগ করলে মোট উৎপাদন ছিল ৪০ একক। আট জন শ্রমিক নিয়োগ করে, মোট উৎপাদন হল ৫০ একক। তাহলে উৎপাদনের ঐ বাড়তি ১০ একক হল অষ্টম শ্রমিকের প্রান্তিক বাস্তব উৎপাদন।

প্রান্তিক উৎপাদনের মূল্য (VMP) : কোনো উপাদানের প্রান্তিক বাস্তব উৎপাদনের অর্থমূল্য হল ঐ উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদনের মূল্য। প্রান্তিক বাস্তব উৎপাদনের পরিমাণকে ঐ দ্রব্যের দাম দিয়ে গুণ করলেই প্রান্তিক উৎপাদনের মূল্য (VMP) পাওয়া যায়। অর্থাৎ, $VMP = P \times MPP$ যেখানে P হল উৎপন্ন দ্রব্যটির দাম।

প্রান্তিক রেভিনিউ উৎপাদন (MRP) : কোনো একটি উপাদান এক ইউনিট বেশি করে নিয়োগ করলে ফার্মের মোট রেভিনিউ যতটা বৃদ্ধি পায় তাকেই ওই উপাদানের ওই ইউনিটের প্রান্তিক রেভিনিউ উৎপাদন বলে।

সংক্ষেপে, $MRP = MR \times MPP$.

তাহলে আমরা পেলাম $VMP = P \times MPP$ এবং $MRP = MR \times MPP$। এখন, পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে দাম বা P স্থির থাকে বলে $P = MR$। সুতরাং, তখন $VMP = MRP$ হবে। ৭.১ নং চিত্রে এটা দেখানো হয়েছে। এখানে $VMP = MRP$ রেখা ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়মের দরুন নিম্নমুখী হয়েছে। কিন্তু অপূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে চাহিদা রেখা নিম্নমুখী বলে $P > MR$ হয়। ফলে, তখন $P \times MPP >$

MR × MPP বা, VMP > MRP হবে এবং MRP রেখা, VMP রেখার নীচে অবস্থান করবে। ৭.২নং চিত্রে এটা দেখানো হয়েছে। সুতরাং, VMP ও MRP-র মধ্যে সাধারণ সম্পর্ক হল : VMP ≥ MRP.

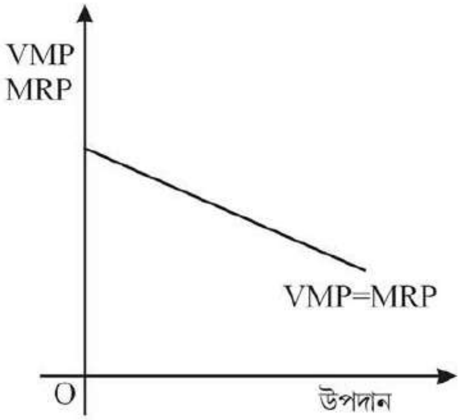

(পূর্ণ প্রতিযোগিতা)

চিত্র ৭.১

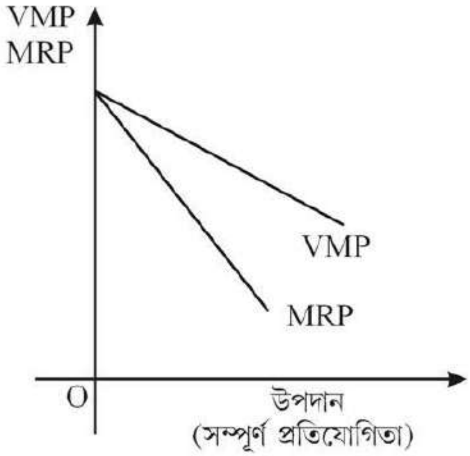

(সম্পূর্ণ প্রতিযোগিতা)

চিত্র ৭.২

৭.৩.২ প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্বটির অনুমানসমূহ

প্রান্তিক উৎপাদেনশীলতার তত্ত্বটি কয়েকটি অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত। সংক্ষেপে সেই অনুমানগুলি হল নিম্নরূপ :

(i) দ্রব্য এবং উপাদানের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা বর্তমান।

(ii) উৎপাদনের উপাদানগুলি সম্পূর্ণরূপে বিভাজ্য।

(iii) কোনো উপাদানের সমস্ত একক সমদক্ষ।

(iv) অন্যান্য উপাদানের পরিমাণ অপরিবর্তিত রেখে কেবল একটি উপাদানের নিয়োগ বাড়ানো যায়।

(v) উৎপাদনের উপাদানগুলি সম্পূর্ণরূপে সচল।

(vi) অন্যান্য উপাদানের নিয়োগ অপরিবর্তিত রেখে কেবল একটি উপাদানের নিয়োগ বাড়ালে ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়মে কাজ করে।

(vii) দেশে পূর্ণ নিয়োগ অবস্থা বর্তমান।

(viii) প্রতিটি ফার্মই মুনাফা সর্বাধিক করতে চায়।

৭.৩.৩. তত্ত্বটির ব্যাখ্যা

বণ্টনের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্ত্বটি দিয়েছেন নয়া-ধ্রুপদি অর্থনীতিবিদেরা। এই তত্ত্বের প্রথম

অবতারণা করে লংফিল্ড এবং থুনেন। এরপর তত্ত্বটিকে পরিমার্জিত করেন মেঙ্গার, উইকস্টিড, মার্শাল প্রমুখ অর্থনীতিবদগণ। এই তত্ত্বের মূলকথা দুটি : (i) কোনো উপাদানের দাম তার প্রান্তিক উৎপাদনের সমান হয়। (ii) যদি সমস্ত উপাদানকে তাদের প্রান্তিক উৎপাদশীলতা অনুযায়ী পাওনা দেওয়া হয় তাহলে মোট উৎপাদন পুরোপুরি নিঃশেষ হয়ে যাবে— কোনো উদ্বৃত্ত থাকবে না বা কোনো ঘাটতি থাকবে না। এগুলি প্রমাণ করার জন্য প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্বে কয়েকটি অনুমান করা হয়। এই অনুমানগুলি আমরা আগের বিভাগে উল্লেখ করেছি। এবার, এই অনুমানগুলির ভিত্তিতে কীভাবে কোনো উপাদানের দাম তার প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার সমান হয় তা আমরা ব্যাখ্যা করবো।

আমরা অনুমান করেছি যে, প্রতিটি ফার্ম মুনাফা সর্বাধিক করতে চায়। তাহলে ফার্ম কোনো উপাদান সেই পরিমাণ নিয়োগ করবে যে পরিমাণ নিয়োগ করলে ঐ উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদনের মূল্য ঐ উপাদানের দামের সমান হয় অর্থাৎ VMP = উপাদানের দাম হয়। যুক্তিটি এইরূপ : ফার্ম কোনো উপাদান বাড়তি এক একক নিয়োগ করে পায় ঐ উপাদানের প্রান্তিক বাস্তব উৎপাদন বা MPP। টাকার অঙ্কে এর মূল্য = প্রান্তিক উৎপাদনের মূল্য বা VMP = P × MPP। অন্যদিকে, ফার্মকে উপাদানটির জন্য দাম দিতে হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত VMP > উপাদানের দাম, ততক্ষণ পর্যন্ত ফার্মটি উপাদানটির নিয়োগ বাড়িয়ে যাবে কেননা এতে তার মুনাফা বাড়বে। ফার্মের মুনাফা বাড়ানোর সুযোগ (scope) শেষ হবে যখন VMP = উপাদানের দাম হবে। এটিই উপাদান নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বা প্রথম ক্রমের শর্ত। এখন, দ্রব্যের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকলে P = MR হয় এবং তার ফলে VMP = MRP হয়। সেক্ষেত্রে মুনাফা সর্বাধিক করার শর্ত হল : কোনো উপাদানের VMP (=MRP) = ঐ উপাদানের দাম। এটি অবশ্য মুনাফা সর্বাধিক করার জন্য প্রয়োজনীয় বা প্রথম ক্রমের শর্ত। মুনাফা সর্বাধিক করার পর্যাপ্ত বা দ্বিতীয় ক্রমের শর্ত হল : VMP বা MRP রেখাকে নিম্নমুখী হতে হবে। আমরা অনুমান করেছি যে, কেবলমাত্র একটি উপাদানের নিয়োগ ক্রমাগত বাড়িয়ে গেলে ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়ম কাজ করবে অর্থাৎ ঐ উপাদানের VMP বা MRP রেখা নিম্নমুখী হবে। সুতরাং আমাদের অনুমান অনুযায়ী, মুনাফা সর্বাধিককরণের পর্যাপ্ত বা দ্বিতীয় ক্রমের শর্ত পালিত হচ্ছে। তাহলে প্রথম ক্রমের শর্ত অনুযায়ী কোনো উপাদান দাম পাবে তার প্রান্তিক উৎপাদন মূল্যের সমান। যদি আমরা পরিবর্তনীয় উপাদানটিকে শ্রম ধরি, তাহলে শ্রমের দাম বা মজুরি হবে শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন মূল্যের সমান। আবার, আমাদের অনুমান অনুযায়ী, শ্রমের প্রতিটি ইউনিটই সমদক্ষ। সুতরাং শ্রমের প্রতিটি ইউনিটই অর্থাৎ প্রতিটি শ্রমিক প্রান্তিক উৎপাদন মূল্য অনুযায়ী মজুরি পাবে। এটিই প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্বের মূলকথা। মনে রাখা দরকার যে, প্রতি ইউনিট শ্রমিককে তার নিজ নিজ প্রান্তিক উৎপাদন অনুযায়ী মজুরি দেওয়া হচ্ছে না। বরং, শেষ ইউনিট শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন মূল্যের সমান মজুরি প্রত্যেক শ্রমিককে দেওয়া হচ্ছে।

বিষয়টিকে একটি রেখাচিত্রের সাহায্যে বোঝানো যেতে পারে। ৭.৩ নং চিত্রে আমরা উল্লম্ব অক্ষে VMP বা MRP (প্রান্তিক উৎপাদন মূল্য বা প্রান্তিক রেভিনিউ উৎপাদন) পরিমাপ করছি এবং অনুভূমিক

অক্ষে শ্রমের পরিমাণ পরিমাপ করছি। ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়মের দরুন VMP বা MRP রেখা নিম্নমুখী হয়েছে এবং দ্রব্যের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকায় VMP = MRP হয়েছে। মনে করি, আর্থিক মজুরির হার হল, W_0। A বিন্দুতে VMP বা MRP রেখা এবং মজুরি রেখা পরস্পরকে ছেদ করেছে। ঐ বিন্দুতে মুনাফা সর্বাধিককরণের দুটি শর্তই পালিত হচ্ছে। ঐ বিন্দুতে VMP বা MRP = W এবং VMP বা MRP রেখা নিম্নমুখী। সুতরাং, ফার্মটি OL_0 পরিমাণ শ্রম নিয়োগ করবে। এর কম শ্রমিক নিয়োগ করলে VMP বা MRP > আর্থিক মজুরি। ফলে তখন নিয়োগ বাড়ানো লাভজনক। আবার, শ্রম OL_0 অপেক্ষা বেশি নিয়োগ করা হলে VMP বা MRP < আর্থিক মজুরি হবে। ফলে তখন শ্রম নিয়োগ কমানো লাভজনক। সুতরাং, মুনাফা সর্বাধিককারী শ্রম নিয়োগের পরিমাণ হল OL_0। তখন শেষ ইউনিট শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন মূল্য = AL_0 যা আর্থিক মজুরির সমান। এভাবে কোনো উপাদানের দাম তার প্রান্তিক উৎপাদন মূল্যের সমান হবে।

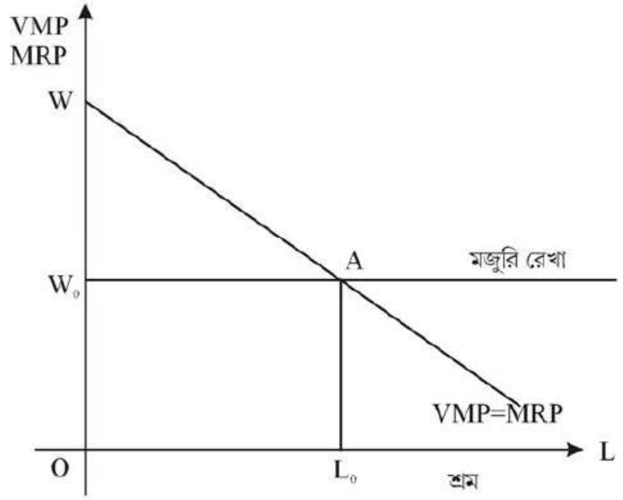

চিত্র ৭.৩

৭.৩.৪ তত্ত্বটির সীমাবদ্ধতা (Limitatins of the Theory)

বণ্টন সম্পর্কে প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্ত্বটি নানা অবাস্তব অনুমানের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এই তত্ত্বটির নানা সীমাবদ্ধতা আছে। বর্তমান অর্থনীতিবিদেরা এই তত্ত্বটিকে নানাভাবে সমালোচনা করেছেন। সংক্ষেপে এই সমালোচনাগুলি নিম্নরূপ :

(i) প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্বে ধরা হয় যে, উপাদানগুলি সম্পূর্ণরূপে বিভাজ্য। অর্থাৎ প্রতিটি উপাদানকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করা যায়। এই অনুমানটি বাস্তবসম্মত নয়। ভারী মেশিন বা যন্ত্রপাতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভাজ্য নয়; দৈনিক শ্রমদৈর্ঘ্যের কম পরিমাণ শ্রম বাস্তবে পাওয়া যায় না ইত্যাদি। সেক্ষেত্রে কোনো উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদন নির্ণয় করা যায় না।

(ii) এই তত্ত্বে অনুমান করা হয় যে, অন্যান্য উপাদানের পরিমাণ অপরিবর্তিত রেখে কেবলমাত্র একটি উপাদানের নিয়োগ বাড়ানো যায়। এই অনুমানটিও বাস্তবসম্মত নয়। বাড়তি একজন শ্রমিক নিয়োগ করলে তার সাথে কিছু যন্ত্রপাতিও দিতে হয়। অথবা বাড়তি একটা মেশিন নিয়োগ করলে সেই মেশিন চালানোর জন্য বাড়তি শ্রমিক নিয়োগ করতে হয়। এক্ষেত্রেও আমরা কোনো উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদন জানতে পারি না। আমরা বরং এক্ষেত্রে দুই বা ততোধিক উপাদানের সম্মিলিত বা যৌথ (combined) প্রান্তিক উৎপাদন পেতে পারি।

(iii) প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্বে প্রত্যেকটি উপাদানের বিভিন্ন ইউনিটকে সমজাতীয় বলে অনুমান করা হয়। এই অনুমানটিও অবাস্তব। বিশেষত শ্রমিকের ক্ষেত্রে এই অনুমান খাটে না। বিভিন্ন শ্রমিকের মধ্যে ট্রেনিং, স্বাস্থ্য, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি বিষয়ে পার্থক্য থাকতে পারে। ফলে বিভিন্ন শ্রমিকের উৎপাদশীলতার মধ্যে পার্থক্য থাকাই স্বাভাবিক।

(iv) এই তত্ত্বে ধরা হয় যে দ্রব্যের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা আছে। বাস্তবে বাজারে নানা অপূর্ণতা থাকে। অপূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতার বাজারই বাস্তবে দেখা যায়।

(v) এই তত্ত্বে ধরা হয় যে, উৎপাদনের উপাদানগুলি সম্পূর্ণরূপে সচল। বাস্তবে কিন্তু এটা ঘটে না। বিশেষ করে, শ্রমের বাজারে খুবই চলনশীলতার অভাব লক্ষ করা যায়। কোনো শ্রমিকের জীবিকা নির্বাচন তার ব্যক্তিগত রুচি ও পছন্দ, ধর্মীয় বিশ্বাস, সামাজিক রীতিনীতি ইত্যাদি নানা বিষয়ের উপর নির্ভর করে। কেবলমাত্র আর্থিক বিষয়ের দ্বারা কোনো শ্রমিকের বৃত্তি নির্বাচন নির্ভর করে না।

(vi) আধুনিক অর্থনীতিবিদগণের মতে, কোনো উপাদানের দাম তার চাহিদা ও জোগানের শক্তির দ্বারা নির্ধারিত হয়। প্রান্তিক উৎপাদশীলতা তত্ত্বটি কেবলমাত্র চাহিদার দিকটি বিবেচনা করে। কোনো উপাদানের চাহিদা তার প্রান্তিক উৎপাদশীলতার দ্বারা নির্ধারিত হয়। এর দ্বারা কোনো উপাদানের জোগান নির্ধারিত হয় না। সুতরাং, প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্ত্বটি উপাদানের দাম নির্ধারণের একটি দিক অর্থাৎ চাহিদার দিকটি বিবেচনা করে এবং অপর দিক অর্থাৎ জোগানের দিকটি অবহেলা করে। সেইদিক থেকে বিচার করলে তত্ত্বটিকে অসম্পূর্ণ বা একপেশে (one-sided or lop-sided) বলা যেতে পারে।

এসব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও একথা বলা যায় যে, কোনো উপাদানের দাম নির্ধারণে সেই উপাদানের উৎপাদনশীলতার বিশেষ ভূমিকা থাকে। প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্ত্বটি সেই বিশেষ সত্যের প্রতি আলোকপাত করে।

৭.৪ শ্রমের জোগান রেখার আকৃতি

শ্রমের জোগান রেখা সম্পর্কে দুটি স্তরে আলোচনা করা যেতে পারে। একট হল ব্যষ্টিগত স্তরে এবং অপরটি হল সমষ্টিগত স্তরে। সমষ্টিগত অর্থনৈতিতে শ্রমের জোগান রেখার আকৃতি সম্পর্কে দুটি মত

আছে। প্রথমটি হল ধ্রুপদি বা নয়া-ধ্রুপদি মত এবং দ্বিতীয়টি হল কেইন্‌স্-এর মত। ধ্রুপদি অর্থনীতিবিদদের মতে, কোনো দেশের মোট শ্রমের জোগান নির্ভর করে প্রকৃত মজুরির হারের উপর। প্রকৃত মজুরি বেশি হলে শ্রমের জোগান বেশি, এবং প্রকৃত মজুরি কম হলে শ্রমের জোগান কম। অর্থাৎ শ্রমের জোগান রেখা একটি ঊর্ধ্বমুখী রেখা হবে। অন্যদিকে, অর্থনীতিবিদ্ কেইন্‌স্-এর মতে, শ্রমের জোগানের পরিমাণ আর্থিক মজুরির হারের উপর নির্ভর করে। তিনি বলেছেন, দেশে প্রচলিত মজুরির হারে শ্রমের জোগান পূর্ণ নিয়োগের স্তর পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে স্থিতিস্থাপক অর্থাৎ শ্রমের জোগান রেখাটি প্রচলিত মজুরির স্তরে শ্রম অক্ষের সঙ্গে সমান্তরাল। কারণ এই প্রচলিত মজুরির হারকে আর কমানো যায় না। এটি নীচের দিকে অনমনীয় (rigid in the downward direction)। শ্রমের পূর্ণ নিয়োগ অবস্থার পর অবশ্য শ্রমের জোগান রেখাটি ঊর্ধ্বমুখী এবং তা প্রকৃত মজুরির উপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল।

এবার শ্রমের ব্যষ্টিগত জোগান রেখা সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে। সাধারণভাবে বলা যেতে পারে যে, শ্রমের ব্যক্তিগত জোগান রেখা বাঁদিক থেকে ডানদিকে ঊর্ধ্বমুখী হবে। ৭.৪ নং চিত্রে আমরা এরূপ একটি জোগান রেখা S_L টেনেছি। চিত্রে দেখা যাচ্ছে যে, মজুরির হার W_0 থেকে বেড়ে W_1 হলে শ্রমের জোগান L_0 থেকে বেড়ে L_1 হয়। মজুরির হার আরো বেড়ে W_2 হলে শ্রমের জোগান আরো বেড়ে L_2 হয়। মজুরি বাড়লে কেন শ্রমিক তার শ্রমের জোগান বাড়ায় তা নিম্নলিখিতভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

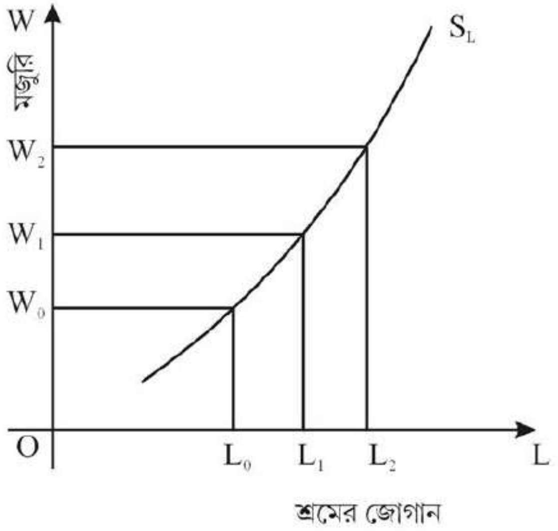

চিত্র ৭.৪

যখন মজুরির হার বৃদ্ধি পায়, তখন শ্রমিকের আর্থিক আয় বৃদ্ধি পায়। আয় বাড়লে সে বেশি ভোগ্য দ্রব্য কিনতে চায়। এখন, বিশ্রামকেও একটি ভোগ্য দ্রব্য বলে ভাবা যেতে পারে কারণ বিশ্রাম ভোগ করেও শ্রমিক উপযোগিতা পায়। এখন, যদি বিশ্রামকে একটি স্বাভাবিক দ্রব্য বলে ভাবা হয়, তাহলে মজুরি

বাড়লে আয় বাড়ার দরুন শ্রমিক বেশি বিশ্রাম ভোগ করতে চাইবে। অর্থাৎ সে কম পরিমাণ শ্রম জোগান দিতে চাইবে। এটিকে বলা যেতে পারে শ্রমের জোগানের উপর মজুরি বৃদ্ধির আয় প্রভাব। আবার, অন্যদিকে, মজুরির হার বাড়লে বিশ্রামের আপেক্ষিক দাম বেড়ে যায়। বিষয়টিকে একটি উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। মনে করি, আগে মজুরির হার ছিল ঘণ্টা প্রতি ২০ টাকা। এর অর্থ হল, 1 ঘণ্টা বিশ্রাম ছেড়ে দিলে শ্রমিক 20 টাকা উপার্জন করতে পারত। অর্থাৎ 1 ঘণ্টা বিশ্রামের দাম ছিল 20 টাকা। এখন, মনে করি, মজুরির হার বেড়ে ঘণ্টাপ্রতি 30 টাকা হল। তাহলে এখন শ্রমিক 1 ঘণ্টা বিশ্রাম ভোগ করলে 30 টাকা হারাবে বা 1 ঘণ্টা বিশ্রাম ত্যাগ করলে সে 30 টাকা পাবে। সুতরাং 1 ঘণ্টা বিশ্রামের মূল্য এখন 30 টাকা। অর্থাৎ বিশ্রামের আপেক্ষিক দাম বাড়ল। আমরা জানি, কোনো দ্রব্যের আপেক্ষিক দামের পরিবর্তন হলে একটি পরিবর্ত প্রভাব (substitution effect) কাজ করে। আপেক্ষিক দাম বাড়লে পরিবর্ত প্রভাবের জন্য ক্রেতা দ্রব্যটি কম পরিমাণ কেনে। এখানে মজুরি বাড়ার অর্থ বিশ্রামের আপেক্ষিক দাম বাড়া। সুতরাং পরিবর্ত প্রভাবের দরুন বিশ্রামের ভোগ কমবে অর্থাৎ মজুরি বাড়লে শ্রমিক কম বিশ্রাম ভোগ করে বেশি শ্রম জোগান দিতে চাইবে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, শ্রমের দাম বা মজুরি বাড়ার ফলে যে দাম প্রভাব তৈরি হচ্ছে, সেটিকে আয় প্রভাব ও পরিবর্ত প্রভাবে ভাগ করা যেতে পারে। আয় প্রভাবের জন্য শ্রমিক বেশি বিশ্রাম ভোগ করতে এবং কম শ্রম জোগান দিতে চাইছে। অন্যদিকে, পরিবর্ত প্রভাবের দরুন শ্রমিক কম বিশ্রাম ভোগ করে বেশি শ্রম জোগান দিতে চাইছে। সুতরাং, এখানে আয় প্রভাব এবং পরিবর্ত প্রভাব বিপরীত দিকে কাজ করছে। তাহলে মজুরি বাড়লে শ্রমের জোগান বাড়বে কি না সেটি এই দুই প্রভাবের আপেক্ষিক শক্তির উপর নির্ভর করবে। যদি পরিবর্ত প্রভাব, আয় প্রভাব অপেক্ষা বেশি শক্তিশালী হয়, তাহলে মজুরির হার বাড়লে শ্রমিক বেশি শ্রমের জোগান দেবে। আর যদি আয় প্রভাব, পরিবর্ত প্রভাব অপেক্ষা বেশি শক্তিশালী হয়, তাহলে মজুরির হার বাড়লে শ্রমের জোগান কমবে। সাধারণত ধরা হয় যে, প্রথমের দিকে মজুরির হার যখন বাড়ছে, তখন পরিবর্ত প্রভাব, আয় প্রভাব অপেক্ষা শক্তিশালী হয়। ফলে মজুরির হার বাড়ার সাথে সাথে শ্রমের জোগানও বাড়ে অর্থাৎ শ্রমের জোগান রেখাটি বাঁদিক থেকে ডানদিকে ঊর্ধ্বমুখী হয়ে থাকে। ৭.৪ নং চিত্রে আমরা যে ঊর্ধ্বমুখী শ্রমের ব্যক্তিগত জোগান রেখা (S_L) টেনেছি, সেখানে আমাদের অনুরূপ অনুমানই কাজ করছে। অর্থাৎ ধরা হয়েছে যে, মজুরির বৃদ্ধির পরিবর্ত প্রভাব, আয় প্রভাব অপেক্ষা বেশি শক্তিশালী।

কিন্তু মজুরি বৃদ্ধির পরিমাণ একটা স্তর পার হয়ে গেলে শ্রমিকের আর্থিক আয়ের অনেক বৃদ্ধি ঘটবে। তখন শ্রমিক আরো বেশি বেশি বিশ্রাম ভোগ করতে চাইতে পারে। অর্থাৎ বিশ্রাম তার কাছে শক্তিশালী স্বাভাবিক দ্রব্য (strongly normal good) বলে বিবেচিত হতে পারে। সেক্ষেত্রে আয় প্রভাব, পরিবর্ত প্রভাব অপেক্ষা বেশি শক্তিশালী হবে। ফলে মজুরি বাড়লে শ্রমিক শ্রমের জোগান কমিয়ে বেশি বিশ্রাম ভোগ করতে পারে। অর্থাৎ মজুরি বাড়লে শ্রমের জোগান কমবে। এক্ষেত্রে শ্রমের জোগান রেখাটি

আমাদের ৭.৫ নং চিত্রের ন্যায় পশ্চাৎমুখী হবে। এই চিত্রে আমরা ধরে নিয়েছি যে, মজুরির হার W_2 অপেক্ষা বেশি হলে মজুরি বৃদ্ধির আয় প্রভাব, পরিবর্ত প্রভাব অপেক্ষা বড়। ফলে মজুরি W_2 অপেক্ষা বেশি হলে মজুরি বাড়লে শ্রমের জোগান বাড়ে না, বরং তা কমে যায়। সুতরাং বিশ্রামকে শক্তিশালী স্বাভাবিক দ্রব্য ধরলে শ্রমের জোগান রেখা পশ্চাৎমুখী (backward bending) হতে পারে।

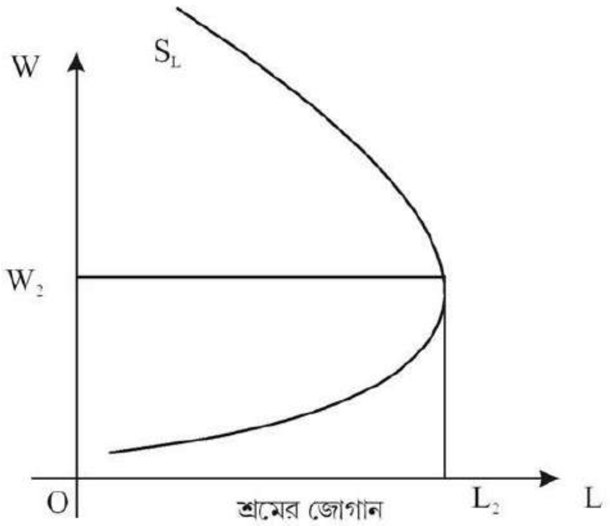

চিত্র ৭.৫

যদি বিশ্রামকে স্বাভাবিক দ্রব্য না ধরে নিকৃষ্ট দ্রব্য ধরা হয়, তাহলে মজুরি বাড়লে আয় প্রভাবের দরুন বিশ্রামের ভোগ কমবে এবং শ্রমের জোগান বাড়বে। আর পরিবর্ত প্রভাবের দরুনও বিশ্রামের চাহিদা কমবে কেননা বিশ্রামের আপেক্ষিক দাম বেড়ে গেছে। তাহলে পরিবর্ত প্রভাবের দরুনও শ্রমের জোগান বাড়বে। এক্ষেত্রে আয় প্রভাব ও পরিবর্ত প্রভাব একই দিকে কাজ করছে। ফলে মজুরি বাড়লে শ্রমের জোগান বাড়বে এবং শ্রমের জোগান রেখা এক্ষেত্রে অবশ্যই ঊর্ধ্বমুখী হবে।

তাহলে আমরা বলতে পারি যে, বিশ্রাম যদি নিকৃষ্ট দ্রব্য হয়, তাহলে শ্রমের জোগান রেখা সর্বদাই ঊর্ধ্বমুখী হবে। যদি বিশ্রাম 'দুর্বল' স্বাভাবিক দ্রব্য হয়, তাহলেও শ্রমের ব্যক্তিগত জোগান রেখা ঊর্ধ্বমুখী হবে। বিশ্রাম যদি শক্তিশালী স্বাভাবিক দ্রব্য হয়, কেবলমাত্র সেই ক্ষেত্রেই মজুরির একটা স্তরের পর শ্রমের ব্যক্তিগত জোগান রেখা পশ্চাৎমুখী হতে পারে। সাধারণভাবে শ্রমের ব্যক্তিগত জোগান রেখাকে ঊর্ধ্বমুখী বলেই ধরা হয়।

৭.৫ মজুরি নির্ধারণের আধুনিক তত্ত্ব

আধুনিক অর্থনীতিবিদগণের মতে, শ্রমের চাহিদা ও শ্রমের জোগানের দ্বারা মজুরির হার নির্ধারিত হয়। সুতরাং, মজুরি নির্ধারণের জন্য আমরা শ্রমের চাহিদা রেখা ও শ্রমের জোগান রেখা টানবো। যে

বিন্দুতে এই দুই রেখা পরস্পরকে ছেদ করবে, সেই বিন্দুতে ভারসাম্য মজুরির হার নির্ধারিত হবে। মজুরির হার নির্ধারণ করার জন্য আমরা অনুমান করে নিচ্ছি যে, শ্রমের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা আছে। এই বাজারে অসংখ্য ক্রেতা ও অসংখ্য বিক্রেতা আছে। শ্রমের প্রতিটি ইউনিট সমজাতীয় বলে ধরা হচ্ছে। শ্রমের বাজারে ফার্মগুলি শ্রমের ক্রেতা এবং শ্রমিকেরা শ্রমের বিক্রেতা। এখন যে-কোনো উপাদানের চাহিদার ন্যায় শ্রমের চাহিদাও উদ্ভূত চাহিদা, কেননা শ্রমের চাহিদা শ্রম দ্বারা উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদা থেকেই উদ্ভূত হয়। উৎপন্ন দ্রব্যটির চাহিদা বাড়লে শ্রমের চাহিদাও বাড়ে। এখন, আমরা যদি ধরে নিই যে, ফার্মগুলি তাদের মুনাফা সর্বাধিক করতে চায়, তাহলে তারা শ্রম সেই বিন্দু পর্যন্ত নিয়োগ করবে যেখানে শ্রমের প্রান্তিক রেভিনিউ উৎপাদন ও মজুরি পরস্পর সমান হয়। সেক্ষেত্রে শ্রমের প্রান্তিক রেভিনিউ উৎপাদন রেখাটিই হবে শ্রমের চাহিদা রেখা। উৎপাদনের ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়ম কাজ করছে ধরে নিলে শ্রমের এই প্রান্তিক রেভিনিউ উৎপাদন রেখাটি বাঁদিক থেকে ডানদিকে নিম্নমুখী হবে। এই রেখাটিই হল শ্রমের চাহিদা রেখা। বাজারে সমস্ত ফার্মের শ্রমের চাহিদা রেখাগুলি অনুভূমিকভাবে যোগ করে আমরা শ্রমের মোট বা বাজার চাহিদা রেখা পেতে পারি। এই রেখাটিও বাঁদিক থেকে ডানদিকে নিম্নমুখী হবে।

এবার, শ্রমের জোগান রেখাটি সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে। আমরা জানি যে, শ্রমের ব্যক্তিগত জোগান রেখা সাধারণত বাঁদিক থেকে ডানদিকে ঊর্ধ্বমুখী হয়। তবে একটা উচ্চহারে মজুরির পর রেখাটি পিছনের দিকে বেঁকে যায়। শ্রমের ব্যক্তিগত জোগান রেখাগুলি যোগ করে আমরা শ্রমের মোট বা বাজার জোগান রেখা পেতে পারি। এই রেখাটি প্রথমের দিকে ঊর্ধ্বমুখী এবং তারপর পশ্চাৎমুখী ধরা হয়। এর অর্থ হল, প্রথম দিকে মজুরির হার যত বাড়বে, শ্রমের জোগান তত বাড়বে। তবে একটা স্তরের পর মজুরির হার আরও বাড়লে শ্রমের জোগান কমে আসবে। শ্রমের চাহিদা রেখা ও জোগান রেখার ছেদ বিন্দুতে ভারসাম্য মজুরির হার নির্ধারিত হবে। বিষয়টি ৭.৬নং চিত্রের সাহায্যে দেখানো হয়েছে। এই চিত্রে অনুভূমিক অক্ষে শ্রমের চাহিদা ও জোগান এবং উল্লম্ব অক্ষে মজুরির হার পরিমাপ করা হয়েছে। D_L হল শ্রমের চাহিদা রেখা এবং S_L হল শ্রমের জোগান রেখা। এই দুই রেখা পরস্পরকে E বিন্দুতে ছেদ করেছে। সুতরাং ঐ বিন্দুতে শ্রমের চাহিদা = শ্রমের জোগান = OL_0। তখন মজুরির হার হল OW_0। এটিই হল ভারসাম্য মজুরির হার। অন্য কোনো মজুরির হারে শ্রমের চাহিদা ও জোগান পরস্পরের সমান হয় না। E বিন্দুটি হল ভারসাম্য বিন্দু।

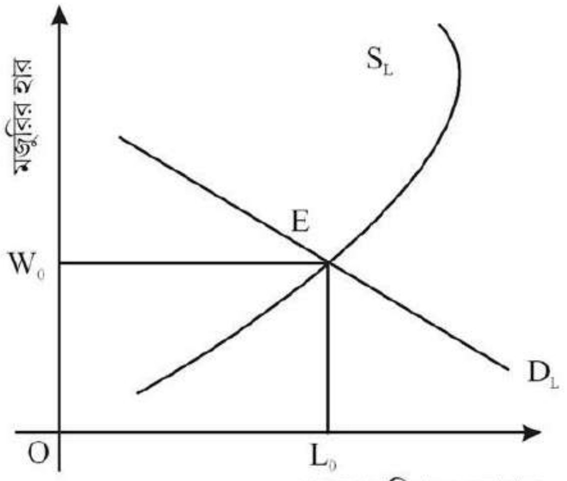

চিত্র ৭.৬

লক্ষণীয় যে, এই ভারসাম্যটি একটি স্থিতিশীল (stable) ভারসাম্য। যদি মজুরির হার OW_0 অপেক্ষা বেশি হয়, তাহলে শ্রমের জোগান, শ্রমের চাহিদা অপেক্ষা বেশি হবে। তখন শ্রমিকদের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে মজুরির হার কমতে থাকবে। অবশেষে তা W_0 স্তরে নেমে আসবে। আবার, মজুরির হার যদি W_0 অপেক্ষা কম হয়, তাহলে শ্রমের চাহিদা, শ্রমের জোগান অপেক্ষা বড় হবে। তখন শ্রমিক পাবার জন্য ফার্মগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতার দরুন মজুরি বাড়বে। অবশেষে মজুরির হার W_0-তে এসে পৌঁছাবে। মজুরির হার W_0 হলে শ্রমের চাহিদা ও জোগান পরস্পর সমান। তখন আর মজুরি বাড়বেও না, কমবেও না। এই মজুরির হারই হল ভারসাম্য মজুরির হার। এইভাবে শ্রমের চাহিদা ও শ্রমের জোগানের ঘাতপ্রতিঘাতের দ্বারা ভারসাম্য মজুরির হার নির্ধারিত হয়।

মজুরির হার নির্ধারণের উপরোক্ত আলোচনা অনেকখানিই তাত্ত্বিক (theoretical)। এখানে ধরে নেওয়া হয়েছে যে, শ্রমের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা আছে। বাস্তবে শ্রমের বাজারে নানা অপূর্ণাঙ্গতা (imperfections) আছে। শ্রমিকেরা নানাভাবে মালিকের দ্বারা শোষিত হয়। সেই শোষণ এড়াবার জন্য তারা শ্রমিক সংঘ গঠন করে। অন্যদিকে, মালিকেরাও মালিক সংঘ তৈরি করে। ফলে শ্রমের বাজারে একদিকে থাকে শ্রমের ক্রেতা হিসাবে মালিক সংঘ এবং অপরদিকে শ্রমের বিক্রেতা হিসাবে শ্রমিক সংঘ। ফলে শ্রমের বাজারটি দ্বিপাক্ষিক একচেটিয়া (bilateral monopoly) বাজারের রূপ গ্রহণ করে। এরূপ বাজারে শ্রমের দাম বা মজুরি নির্ধারিত হবে উভয়পক্ষের যৌথ দর কষাকষির আপেক্ষিক ক্ষমতার দ্বারা। সেক্ষেত্রে কোন্ স্তরে মজুরির হার নির্ধারিত হবে তা কেবলমাত্র অর্থনৈতিক বিষয়ের উপর নির্ভর করে না। ফলে তত্ত্বের দ্বারা মজুরির হার অনেকটাই অনিরূপণযোগ্য (indeterminate)। মজুরির হার বাস্তবে নানা সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিষয়ের উপর নির্ভর করে।

৭.৬ শ্রমিকের শোষণ

আমরা জানি যে, শ্রমের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকলে শ্রমের চাহিদা রেখা ও শ্রমের জোগান রেখার দ্বারা মজুরির হার নির্ধারিত হয়। সেক্ষেত্রে শ্রমিকেরা মজুরির হার স্থির আছে বলে ধরে নেয় এবং সেই মজুরির হারে সকলেই তাদের শ্রম দিতে রাজি থাকে। ফলে এই বাজারে গড় মজুরি = প্রান্তিক মজুরি হয়ে থাকে। কিন্তু বাস্তবে শ্রমের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা প্রায়শই থাকে না। সেক্ষেত্রে শ্রমের জোগান রেখা বা গড় মজুরি রেখা ঊর্ধ্বমুখী হয় এবং প্রান্তিক মজুরি রেখা (MW), গড় মজুরি রেখার (AW) উপরে অবস্থান করে। এর ফলে শ্রমিক তার প্রান্তিক রেভিনিউ উৎপাদন (MRP) পরিমাণ মজুরি পায় না। সে শোষিত হয়। শ্রমিকের প্রান্তিক রেভিনিউ উৎপাদন এবং মজুরির পার্থক্যই হল শ্রমিকের শোষণ।

বিষয়টিকে ৭.৭ নং রেখাচিত্রে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আমরা ধরে নিচ্ছি যে, দ্রব্যের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা আছে অর্থাৎ P = MR। ফলে VMP = MRP। ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়মের দরুন এই রেখা নিম্নমুখী। কিন্তু শ্রমের বাজারে অপূর্ণ প্রতিযোগিতা আছে। ফলে শ্রমের জোগান রেখা বা গড় মজুরি (AW) রেখা ঊর্ধ্বমুখী। আমরা জানি, গড় যখন বাড়ে, প্রান্তিক তখন গড় অপেক্ষা বেশি হয়। সুতরাং প্রান্তিক মজুরি রেখা (MW), গড় মজুরি রেখার (AW) উপরে অবস্থান করছে।

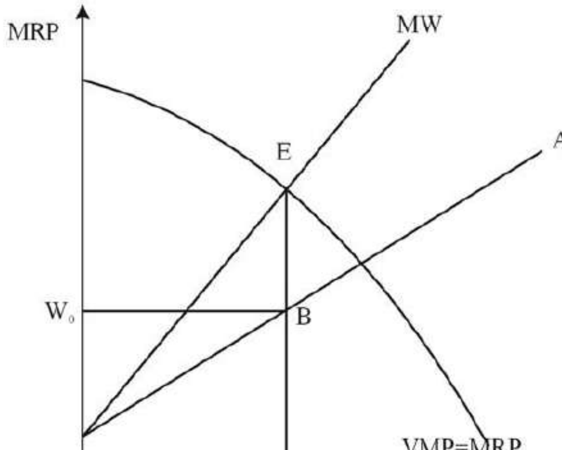

চিত্র ৭.৭

এখন, মুনাফা সর্বাধিক করার জন্য কোনো ফার্ম সেই পরিমাণ শ্রম নিয়োগ করবে যেখানে MRP = MW হয়। কেননা, যদি MRP > MW হয়, তাহলে আরো শ্রমিক নিয়োগ করলে লাভ বাড়বে। তেমনি MRP < MW হলে শ্রমিক নিয়োগ কমানো লাভজনক। সুতরাং ফার্ম সেই বিন্দুতে শ্রমিক নিয়োগ করবে যেখানে MRP = MW. এটি অবশ্য মুনাফা সর্বাধিক করার প্রয়োজনীয় শর্ত। পর্যাপ্ত শর্তটি হল, MRP রেখাকে নিম্নমুখী হতে হবে। ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়মের দরুন আমাদের MRP রেখা নিম্নমুখী।

সুতরাং, মুনাফা সর্বাধিককরণের উভয় শর্তই পূরণ হয়েছে E বিন্দুতে। ফার্মটি OL_0 পরিমাণ শ্রম নিয়োগ করবে। তখন শ্রমের জোগান রেখা বা AW রেখা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, মজুরির হার হবে OW_0 বা BL_0 যা MRP অপেক্ষা কম। E বিন্দুতে MRP = EL_0 কিন্তু মজুরির হার = BL_0। (MRP – মজুরি) অর্থাৎ (EL_0 – BL_0) বা EB হল শ্রমিকের শোষণের পরিমাণ।

আমরা যদি ধরি যে, দ্রব্যের বাজারেও অপূর্ণ প্রতিযোগিতা আছে তাহলে P > MR এবং VMP > MRP হবে এবং VMP রেখা, MRP রেখার উপরে অবস্থান করবে (চিত্র ৭.৮)। শ্রমের বাজারেও অপূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকায় AW রেখা ঊর্ধ্বমুখী এবং MW রেখা, AW রেখার উপরে অবস্থান করছে। এখন, মুনাফা সর্বাধিককরণের শর্ত হল, MRP = MW এবং এই শর্ত পূরণ হয়েছে E বিন্দুতে। সুতরাং ফার্মটি OL_0 পরিমাণ শ্রম নিয়োগ করবে। তখন শ্রমিকের মজুরি = OW_0 বা BL_0। কিন্তু OL_0 পরিমাণ শ্রমিক নিয়োগ করলে শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন মূল্য (VMP) হল CL_0। তাহলে শ্রমিক এখানে কম পাচ্ছে CL_0 – BL_0 বা BC পরিমাণ। এই BC অংশটি হল শ্রমিকের শোষণ। এই BC-কে দুটি অংশে ভাগ করা যায়। BC = BE + CE। শ্রমিক BE পরিমাণ কম মজুরি পায় শ্রমের বাজারে অপূর্ণতার জন্য। শ্রমের ক্রেতা হিসাবে শ্রমের বাজারে ফার্মের একচেটিয়া ক্ষমতা রয়েছে। সেই ক্ষমতার জোরে ফার্ম শ্রমিককে শোষণ করে। BE-কে তাই বলা একচেটিয়া ক্রেতার শোষণ (Monopsonistic Exploitation)। আর CE পরিমাণ শোষণের উদ্ভব হয়েছে দ্রব্যের বাজারে অপূর্ণতার জন্য। এখানে দ্রব্যের উৎপাদক বা বিক্রেতা হিসাবে ফার্ম একচেটিয়া ক্ষমতা ভোগ করে এবং সেজন্য সে দ্রব্যের বেশি দাম আদায় করতে পারে। CE-কে তাই বলা হয় একচেটিয়া বিক্রেতার শোষণ (Monopolistic exploitation)। শ্রমিক এখানে দ্বিগুণ বা দু-বার শোষণের (double exploitation) কবলে পড়ছে। একবার সে শোষিত হয় একচেটিয়া ক্রেতার কাছে শ্রম বিক্রির সময়। তখন সে কিছুটা কম মজুরি পায়। আর একবার সে শোষিত হয় একচেটিয়া বিক্রেতার নিকট দ্রব্য কেনার সময়। তখন তাকে বেশি দাম দিয়ে দ্রব্যটি কিনতে হয়।

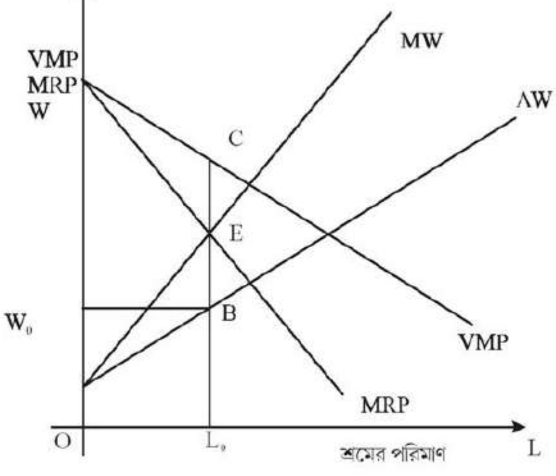

চিত্র ৭.৮

৭.৭ শ্রমিক সংঘ এবং এর কার্যাবলি

কোনো উৎপাদন প্রতিষ্ঠান বা ফার্মে নিযুক্ত শ্রমিকরা অথবা একই রকমের কাজে নিযুক্ত শ্রমিকরা নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য এবং নিজেদের কল্যাণসাধনের জন্য অনেক সময় ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটি স্থায়ী সংগঠন গড়ে তোলে। এই স্থায়ী ও স্বেচ্ছামূলক সংগঠনকে শ্রমিক সংঘ বলে। মালিকের কাছ থেকে নানা দাবিদাওয়া আদায় করতে হলে শ্রমিকদের দর কষাকষি (Bargaining) করতে হয় মালিক বা তার প্রতিনিধির সাথে। এখন, একক বা বিচ্ছিন্নভাবে কোনো শ্রমিকের এই দর কষাকষির ক্ষমতা খুবই কম বা নগণ্য। মূলত নিজেদের দর কষাকষির ক্ষমতা বাড়ানোর উদ্দেশ্যেই শ্রমিকরা স্বেচ্ছায় এবং নিজেদের উদ্যোগে একটি স্থায়ী সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে। এই স্থায়ী ও স্বেচ্ছামূলক সংগঠনই হল শ্রমিক সংঘ। সিডনি ওয়েব এবং বিয়াট্রিস ওয়েব শ্রমিক সংঘের একটি সুন্দর সংজ্ঞা দিয়েছেন। তাঁদের মতে, A trade union is a continuous association of wage earners for the purpose of maintaining or improving the conditions of their employment. অর্থাৎ শ্রমিকেরা তাদের কাজের বর্তমান অবস্থা বজায় রাখা বা উন্নত করার উদ্দেশ্যে যে স্থায়ী সংগঠন গড়ে তোলে তাকে শ্রমিক সংঘ বলে।

কোনো শ্রমিক সংঘ নানা কাজ সম্পন্ন করে। সেগুলিকে মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করা যায়। এক ধরনের কাজকে বলা যায় সংগ্রামমূলক বা আন্দোলনমূলক কাজকর্ম (Militant functions) এবং অপর ধরনের কাজকে বলা যায় ভ্রাতৃত্বমূলক কাজকর্ম (Fraternal functions) শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি, ভাতা ও বোনাস বৃদ্ধি ইত্যাদি নানা আর্থিক দাবিদাওয়া থাকে। এগুলি পূরণ করার জন্য শ্রমিকরা একসঙ্গে মালিকের সাথে যৌথ দর কষাকষি করে। শ্রমিক সংঘের সংগ্রামমূলক কাজকর্মের মধ্যে এই আর্থিক দাবিদাওয়া আদায়ের কাজকর্মই প্রধান। এছাড়া মালিকরা অনেক সময় শ্রমিকদের উপর নানা অন্যায়, অত্যাচার ও জুলুম করে থাকে। তারা অনেক সময় শ্রমিককে বিনা বা সামান্য দোষে কাজ থেকে বরখাস্ত করে। অনেক সময় মালিকরা বেআইনিভাবে কারখানা বন্ধ করে দেয়। এগুলির বিরুদ্ধে শ্রমিকরা তাদের শ্রমিক সংঘের মাধ্যমে আন্দোলন গড়ে তোলে। এই আন্দোলনের প্রধান কয়েকটি রূপ হল ধর্মঘট, পিকেটিং, মালিকপক্ষ বা তার প্রতিনিধিকে ঘেরাও প্রভৃতি। এগুলিও শ্রমিক সংঘের সংগ্রামমূলক কাজকর্মের অন্তর্ভুক্ত। সংগ্রামমূলক কাজকর্মের মধ্যে মজুরি ও ভাতা বৃদ্ধির আন্দোলনই শ্রমিক সংঘের প্রধান কাজ।

সংগ্রামমূলক কাজকর্ম ছাড়াও শ্রমিক সংঘ আরো কিছু কাজ করে থাকে। সেই কাজগুলি করা হয় মূলত শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য। শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মানের উন্নতি ঘটানো ও তাদের কল্যাণের জন্য শ্রমিক সংঘ যে সমস্ত কাজ করে থাকে তাদের ভ্রাতৃত্বমূলক কাজকর্ম বলে। এই সমস্ত কাজকর্মের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : অবসর সময়ে কাজ করে শ্রমিক যাতে কিছু উপার্জন করতে পারে তার জন্য কোনো ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করা, বয়স্ক শ্রমিকদের জন্য নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করা, শ্রমিক জীবনের একঘেয়েমি কাটাতে নানা বিনোদনের ব্যবস্থা করা, দুঃস্থ শ্রমিক পরিবারকে সাহায্য করা, শ্রমিক এবং তার পরিবারের

কেউ অসুস্থ হলে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, শ্রমিকদের শরীর চর্চার জন্য ব্যয়ামাগার স্থাপন করা, শ্রমিক আবাসনে খেলাধূলোর ব্যবস্থা করা এবং খেলার সাজসরঞ্জমাম সরবরাহ করা, শ্রমিক এবং তার পরিবারের সদস্যদের কিছুদিন অন্তর অন্তর স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। এই সমস্ত কাজকর্মের ফলে শ্রমিকদের দৈহিক ও মানসিক ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এর ফলে তাদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায়। কোনো কারণে হঠাৎ কোনো শ্রমিকের কর্মচ্যুতি ঘটলে তার বিকল্প কোনো কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা ও সুযোগ বৃদ্ধি পায়। এজন্যই শ্রমিক সংঘের এই সমস্ত কাজকর্মকে কল্যাণমূলক কাজ বা ভ্রাতৃত্বমূলক কাজ বলা হয়।

৭.৮ সুদের হারের তত্ত্ব

ধ্রুপদি বা প্রাচীন ধনবিজ্ঞানীদের মতে সুদ হল মূলধন সেবা ব্যবহারের দাম। অন্যভাবে বলতে গেলে, সুদ হল মূলধনি যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ভাড়া। আবার, কারো কারো মতে, সুদ হল বর্তমান ভোগ থেকে বিরত থাকার পুরস্কার অর্থাৎ পরের সঞ্চয় ব্যবহারের দাম। নয়া-প্রাচীন বা নয়া-ধ্রুপদি অর্থনীতিবিদ্‌দের মতে, সুদ হল ঋণযোগ্য তহবিল ব্যবহারের দাম। অর্থনীতিবিদ্ কেইন্‌স্-এর মতে, সুদ হল টাকার তারল্য ব্যবহারের দাম। সুদকে সাধারণত শতকরা বার্ষিক হারে প্রকাশ করা হয়। সেজন্য একে সুদের হার বলে অভিহিত করা হয়।

কোনো দেশে সুদের হার কীভাবে নির্ধারিত হয়, সে সম্পর্কে মূলত তিনটি তত্ত্ব আছে। সেগুলি হল : ধ্রুপদি বা প্রাচীন তত্ত্ব, নয়া-প্রাচীন বা ঋণযোগ্য ভাণ্ডার তত্ত্ব এবং তারল্য পছন্দ তত্ত্ব। আমরা এই তত্ত্বগুলি একে একে সংক্ষেপে আলোচনা করব।

৭.৮.১. সুদের হারের প্রাচীন তত্ত্ব

ধ্রুপদি বা প্রাচীন অর্থনীতিবিদ্‌দের মতে, সুদের হার নির্ধারিত হয় সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সমতার দ্বারা। সঞ্চয়ের পিছনে যে বিষয়গুলি কাজ করে সেগুলি হল : অপেক্ষা বা ভোগ থেকে বিরত থাকা, ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা সম্পর্কে চিন্তা, সময়-পছন্দ প্রভৃতি। এই তত্ত্বে ধরা হয় যে, সঞ্চয়ের সঙ্গে সুদের হারের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে। এখানে সুদ হল ভোগ থেকে বিরত থাকার পুরস্কার। এই পুরস্কার যত বেশি হবে, বর্তমান ভোগ থেকে বিরত থাকাও তত বেশি হবে। অর্থাৎ সুদ বেশি হলে সঞ্চয়ও বেশি হবে। সঞ্চয় রেখা সুদের হারের অপেক্ষক হিসাবে বাঁদিক থেকে ডানদিকে ঊর্ধ্বমুখী হবে। অন্যদিকে, বিনিয়োগের হার সুদের হারের উপর বিপরীতভাবে নির্ভর করে। সুদের হার বাড়লে মূলধনের ব্যয় বাড়ে কিংবা ঋণের ভার বা বোঝা বাড়ে এবং কোনো বিনিয়োগ পরিকল্পনার মুনাফাযোগ্যতা (Profitability) কমে। সুতরাং, সুদের হার বেশি হলে বিনিয়োগের পরিমাণ কম হবে এবং সুদের হার কম হলে বিনিয়োগের পরিমাণ বেশি হবে। সুতরাং, সুদের হারের অপেক্ষক হিসাবে বিনিয়োগ রেখা বাঁদিক থেকে ডানদিকে নিম্নমুখী হবে। এই দুই রেখার ছেদবিন্দুতে ভারসাম্য সুদের হার নির্ধারিত হবে।

৭.৯ নং চিত্রে আমরা এই ভারসাম্য দেখিয়েছি। উল্লম্ব অক্ষে সুদের হার (r) এবং অনুভূমিক অক্ষে সঞ্চয় (S) ও বিনিয়োগ (I) পরিমাপ করে আমরা S ও I রেখা অঙ্কন করেছি। এই দুই রেখা পরস্পরকে E বিন্দুতে ছেদ করেছে। তখন $S_0 = I_0$। সুতরাং E বিন্দু হল ভারসাম্য বিন্দু এবং ভারসাম্য সুদের হার হল Or_0। এভাবে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সমতার দ্বারা প্রাচীন তত্ত্বে ভারসাম্য সুদের হার নির্ধারিত হয়। আবার, কেউ কেউ সঞ্চয়কে মূলধনের জোগান, বিনিয়োগকে মূলধনের চাহিদা এবং সুদের হারকে মূলধনের দাম বলে অভিহিত করেছেন। সুতরাং, E বিন্দুতে মূলধনের চাহিদা ও মূলধনের জোগান সমান হয়েছে এবং ঐ বিন্দুতে মূলধনের দাম বা সুদের হার নির্ধারিত হয়েছে। এখানে মূলধনের ভারসাম্য দাম বা ভারসাম্য সুদের হার হল Or_0। যদি সুদের হার Or_0 অপেক্ষা বেশি (মনে করি, Or_1) হয়, তাহলে মূলধনের জোগান (S), মূলধনের চাহিদা অপেক্ষা বেশি হবে। ফলে মূলধনের দাম বা সুদের হার (r) কমবে। তেমনি যদি সুদের হার Or_2 হয়, তাহলে মূলধনের চাহিদা, মূলধনের জোগান অপেক্ষা বেশি হবে। ফলে মূলধনের দাম বা সুদের হার বাড়বে। সুতরাং, ভারসাম্যটি স্থায়ী বা স্থিতিশীল (Stable)। যদি সঞ্চয় বা বিনিয়োগ প্রবণতার পরিবর্তন ঘটে, তাহলে ঐ রেখাগুলি স্থান পরিবর্তন করবে। ফলে ভারসাম্য সুদের হারেও পরিবর্তন ঘটবে। সংক্ষেপে এটিই হল সুদের হারের ধ্রুপদি বা প্রাচীন তত্ত্ব।

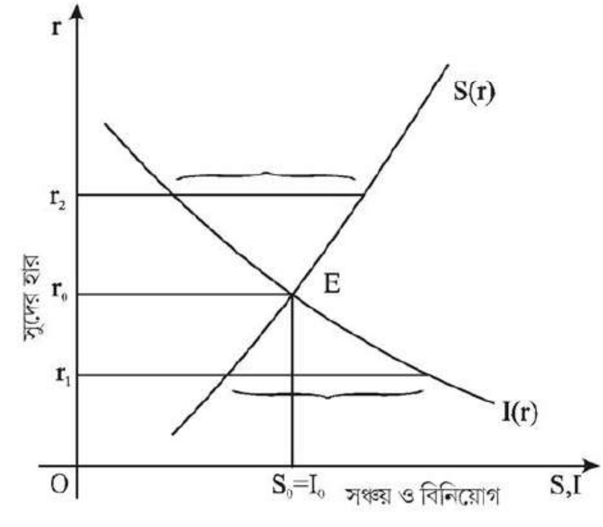

চিত্র ৭.৯

☐ সীমাবদ্ধতা (Limitations)

সুদের হার নির্ধারণ সম্পর্কে এই ধ্রুপদি বা প্রাচীন তত্ত্বের কয়েকটি সমালোচনা করা হয়। **প্রথমত,** এই তত্ত্বটি পূর্ণ নিয়োগ অবস্থার অনুমানের উপর নির্ভরশীল। পূর্ণ নিয়োগ অবস্থায় ভোগ কমিয়ে সঞ্চয় বাড়াতে হয়। তাই ভোগ থেকে বিরত থাকার জন্য ব্যক্তি সুদ পায়। কিন্তু অপূর্ণ নিয়োগ অবস্থায় আয় বাড়লে ভোগ ও সঞ্চয় উভয়ই বাড়তে পারে। আর অপূর্ণ নিয়োগ অবস্থা অধিকতর বাস্তবসম্মত। **দ্বিতীয়ত,** পূর্ণ নিয়োগ অবস্থা ধরে নিয়ে প্রাচীন ধনবিজ্ঞানীরা আয়ের পরিবর্তনকে উপেক্ষা করেছেন। অনেকে মনে করেন যে,

সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মধ্যে সমতা আসে আয়স্তরের পরিবর্তনের মাধ্যমে, সুদের হারের পরিবর্তনের মাধ্যমে নয়। **তৃতীয়ত,** এই তত্ত্বে ভোগ কমালে তবেই সঞ্চয় তথা বিনিয়োগ বাড়তে পারে। কিন্তু ভোগ কমলে দেশের মোট চাহিদা কমে যাবে এবং তার ফলে বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগ প্রবণতা কমে যাবে। এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, যুক্তির ফাঁক রয়েছে। **চতুর্থত,** অর্থনীতিবিদ্ কেইন্‌স্-এর মতে, প্রাচীন তত্ত্বে সুদের হার অনিরূপণযোগ্য (indeterminate)। কেননা আয়ের স্তর জানা না থাকলে আমরা সঞ্চয় রেখার অবস্থান জানতে পারি না। আর সঞ্চয় রেখার অবস্থান না জানা গেলে আমরা সুদের হার নির্ধারণ করতে পারি না। **পঞ্চমত,** কেইন্‌স্ মনে করেন যে, সুদের হার পুরোপুরি একটি আর্থিক বিষয়। অর্থের চাহিদা ও অর্থের জোগানের দ্বারা সুদের হার নির্ধারিত হয়। সুতরাং, প্রাচীন বা ধ্রুপদি ধনবিজ্ঞানীরা সুদের হার নির্ধারণে আর্থিক বিষয়গুলি উপেক্ষা করেছেন এবং সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ন্যায় বাস্তব বিষয়গুলি (real factors) শুধুমাত্র বিবেচনা করেছেন।

উপসংহারে আমরা বলতে পারি যে, সুদের হার নির্ধারণে আর্থিক ও বাস্তব উভয় প্রকার বিষয়েরই ভূমিকা আছে। নয়া-প্রাচীন তত্ত্বে ঋণযোগ্য তহবিল তত্ত্বে সুদের হার নির্ধারণ করতে এই উভয় প্রকার বিষয়েরই উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। নয়া-প্রাচীন তত্ত্বটিকে অনেকেই তাই সুদের হার নির্ধারণের প্রাচীন তত্ত্ব ও কেইন্‌স্-এর তত্ত্বের সংশ্লেষ (synthesis) বলে মনে করেন।

৭.৮.২. সুদের হার সম্পর্কে ঋণযোগ্য তহবিল তত্ত্ব বা নয়া-প্রাচীন তত্ত্ব

সুদের হার সম্পর্কে নয়া-প্রাচীন তত্ত্ব বা ঋণযোগ্য তহবিল তত্ত্বের মূলকথা হল, ঋণযোগ্য তহবিলের চাহিদা ও জোগানের দ্বারা সুদের হার নিধারিত হয়। ঋণযোগ্য তহবিলের জোগানের উৎসগুলি হল :

(i) সঞ্চয় (Savings), (ii) নির্মজুত (dishoarding), (iii) অ-বিনিয়োগ (disinvestment) এবং ব্যাঙ্ক-সৃষ্ট অর্থ (bank money)। অন্যদিকে, ঋণযোগ্য তহবিলের চাহিদার পিছনে উদ্দেশ্যগুলি হল : (i) ভোগ (consumption), (ii) বিনিয়োগ (investment) এবং (iii) মজুতকরণ (hoarding)। ঋণযোগ্য তহবিলের চাহিদা ও জোগানের উৎসগুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে দু'এক কথা বলা যেতে পারে। এই তহবিলের জোগানের প্রথম উৎস হল সঞ্চয়। সঞ্চয়ের সঙ্গে সুদের হারের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক বিদ্যমান। সুদের হার বাড়লে সঞ্চয় বাড়ে এবং সুদের হার কমলে সঞ্চয় কমে। নির্মজুত হল ঋণযোগ্য তহবিলের জোগানের আর একটি অংশ। লোকে যদি মজুত করা অর্থ কমায়, তাহলে সেই অলস অর্থ ঋণপ্রদানের জন্য ব্যবহৃত হতে পারে। সুদের হার যত বাড়বে, লোকে তত মজুত অর্থ বাইরে আনবে। সুতরাং, সুদের হারের সঙ্গে নির্মজুতের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে। অ-বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রয়োজ্য। সুদের হার বাড়লে ফার্মগুলি ভৌত মূলধনে বিনিয়োগ কমিয়ে সেই অর্থ অপরকে ঋণ হিসাবে ধার দেবে। ঋণযোগ্য তহবিলের চতুর্থ উৎসটি হল ব্যাঙ্ক-সৃষ্ট অর্থ। সুদের হার বাড়লে ব্যাঙ্ক সাধারণত বেশি ঋণ দিতে আগ্রহী হয়।

এখন, সঞ্চয় (S), নির্মজুত (D_H), অ-বিনিয়োগ (D_I) এবং ব্যাঙ্ক সৃষ্ট অর্থ (B_M)-কে অনুভূমিক ভাবে

যোগ করে আমরা ঋণযোগ্য তহবিলের মোট জোগান (S_L) রেখা পেতে পারি (চিত্র ৭.১০)। এই রেখা বাঁদিক থেকে ডানদিকে ঊর্ধ্বমুখী হবে অর্থাৎ বেশি বেশি সুদের হারে ঋণযোগ্য তহবিলের জোগান বেশি হবে।

এবার ঋণযোগ্য তহবিলের চাহিদার উৎসগুলি বিবেচনা করা যেতে পারে। এই চাহিদার প্রথম উৎস হল ভোগ। সুদের হার কম হলে লোকের ভোগের আকাঙ্ক্ষা বেশি হবে। কম সুদে লোকে বেশি ঋণ করে ভোগ করতে চাইবে। সুতরাং, ভোগের জন্য ঋণযোগ্য তহবিলের চাহিদার সঙ্গে সুদের হারের বিপরীত সম্পর্ক আছে। ঋণযোগ্য তহবিলের চাহিদার দ্বিতীয় উৎস হল বিনিয়োগ। এর সাথে সুদের হারের বিপরীত সম্পর্ক বিদ্যমান। সবশেষে, ঋণযোগ্য তহবিলের চাহিদার পিছনে আর একটি উৎস হল অর্থ মজুত রাখার চাহিদা। এটিও সুদের হারের সঙ্গে বিপরীত ভাবে সম্পর্কযুক্ত। এখন, ভোগ (C), বিনিয়োগ (I) এবং অর্থ মজুত রাখা (H)—এই তিনটিকে অনুভূমিকভাবে যোগ করে আমরা ঋণযোগ্য তহবিলের মোট চাহিদা রেখা (D_L) পেতে পারি। এই রেখাটি বাঁদিকে থেকে ডানদিকে নিম্নমুখী হবে (চিত্র ৭.১০)। চিত্রে D_L এবং S_L রেখা পরস্পরকে E বিন্দুতে ছেদ করেছে। তখন ভারসাম্য সুদের হার হল Or_0। এভাবে ঋণযোগ্য তহবিল তত্ত্বে ভারসাম্য সুদের হার নির্ধারিত হয় ঋণযোগ্য তহবিলের চাহিদা ও জোগানের দ্বারা।

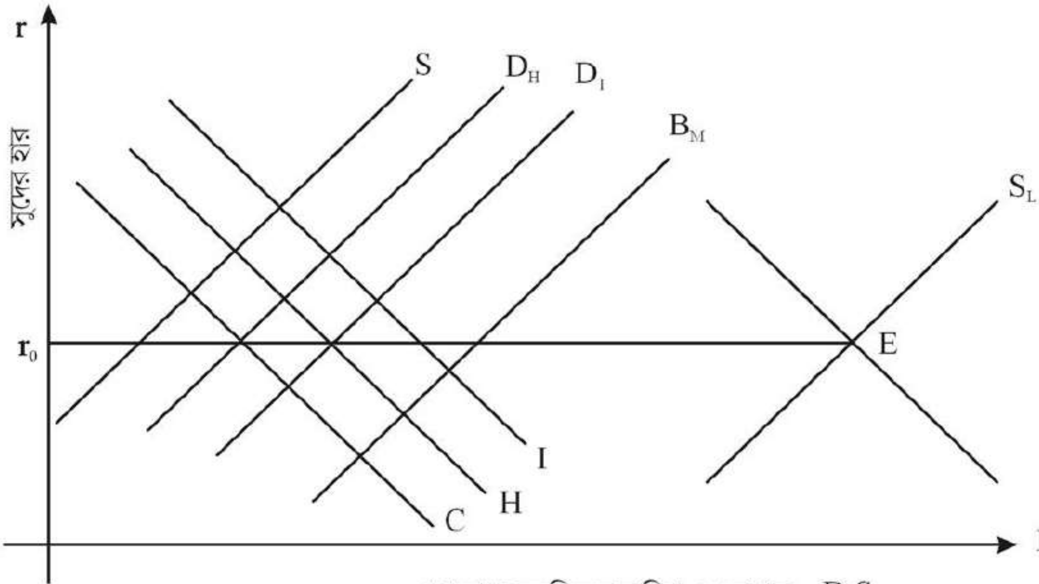

চিত্র ৭.১০

ঋণযোগ্য তহবিল তত্ত্ব সুদের হারের প্রাচীন তত্ত্ব অপেক্ষা উন্নততর। প্রাচীন তত্ত্বে সুদের হার নির্ধারিত হয় কেবলমাত্র সঞ্চয় ও বিনিয়োগের দ্বারা অর্থাৎ দুটি বাস্তব বিষয়ের দ্বারা। অন্যদিকে, কেইন্‌স্‌-এর তত্ত্বে সুদের হার নির্ধারিত হয় অর্থের চাহিদা ও অর্থের জোগানের দ্বারা অর্থাৎ কেবলমাত্র আর্থিক বিষয়ের দ্বারা। উভয় তত্ত্বই একপেশে বা চরম (extreme)। কিন্তু ঋণযোগ্য তহবিল তত্ত্বে সুদের হার নির্ধারণে প্রকৃত ও

বাস্তব উভয় প্রকার বিষয়ই বিবেচনা করা হয়েছে। সুতরাং এই তত্ত্ব প্রাচীন বা ধ্রুপদি তত্ত্ব এবং কেইন্‌স্‌-এর তারল্য পছন্দ তত্ত্ব এই দুই তত্ত্বের সংশ্লেষ (synthesis)।

৭.৮.৩. সুদের হারের তারল্য পছন্দ তত্ত্ব বা কেইন্‌স্‌-এর তত্ত্ব

কেইন্‌স্‌-এর মতে, সুদ হল পুরোপুরি একটি আর্থিক বিষয়। টাকার চাহিদা ও টাকার জোগানের দ্বারা ভারসাম্য সুদের হার নির্ধারিত হয়। কেইন্‌স্‌-এর যুক্তি হল, নগদ টাকা সবচেয়ে তরল সম্পত্তি। আর সুদ হল টাকার তারল্য ব্যবহারের দাম। সুতরাং টাকার দাম বা সুদ নির্ধারিত হবে টাকার চাহিদা ও টাকার জোগানের দ্বারা। কেইন্‌সের মতে, নগদ টাকার চাহিদার পিছনে তিনটি উদ্দেশ্য কাজ করে : লেনদেনের উদ্দেশ্য (Transactions motive), সতর্কতার উদ্দেশ্য (Precautionary motive) এবং ফাটকা কারবারের উদ্দেশ্য (Speculative motive)।

লেনদেন ও সতর্কতার উদ্দেশ্য : দ্রব্য ও সেবাকার্য লেনদেনের জন্য লোকে তাদের আয়ের একটা অংশ নগদ টাকায় রাখতে চায়। একে লেনদেনের উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায় বলে। এই উদ্দেশে রক্ষিত টাকার পরিমাণকে লেনদেন ব্যালান্স বলে। কেইন্‌স্‌-এর মতে, এই লেনদেন ব্যালান্স আয়স্তরের উপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভর করে। তেমনি, ভবিষ্যতের দৈব-দুর্বিপাক ও অনিশ্চয়তার জন্যও লোকে তাদের আয়ের একটা অংশ নগদ টাকায় হাতে রাখে। একে সতর্কতামূলক অভিপ্রায় বলে। এই উদ্দেশ্যে রক্ষিত টাকার পরিমাণকে সতর্কতামূলক ব্যালান্স বলে। ইহাও আয়ের স্তরের উপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভর করে। এই দুই ব্যালান্সকে একত্রে বলা হয় প্রত্যক্ষ বা সক্রিয় ব্যালান্স (L_1)। এটিও তাহলে আয়ের স্তরের (Y) উপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভর করবে অর্থাৎ $L_1 = L_1(Y)$। আয় বাড়লে L_1 বাড়ে এবং আয় কমলে L_1 কমে।

ফাটকা কারবারের অভিপ্রায় : মূলধনী লাভ ভোগ করা বা মূলধনী ক্ষতি এড়ানোর জন্য লোকে নগদ টাকা হাতে রাখতে চায়। একে ফাটকা কারবারের অভিপ্রায় বলে। ফাটকা কারবারে রক্ষিত টাকার পরিমাণ (L_2) সুদের হারের (r) উপর বিপরীতভাবে নির্ভর করে অর্থাৎ r বাড়লে L_2 কমে এবং r কমলে L_2 বাড়ে। এর পিছনে যুক্তিটি নিম্নরূপ। সুদের হার স্বাভাবিকের বেশি হলে লোকে প্রত্যাশা করে যে, সুদের হার কমবে অর্থাৎ বণ্ডের দাম বাড়বে। সুতরাং, বণ্ড কিনলে পরে মূলধন-লাভ হবে। ফলে তখন ফাটকা কারবারের জন্য নগদ টাকার চাহিদা (L_2) কম হবে। তেমনি, সুদের হার স্বাভাবিকের কম হলে লোকে প্রত্যাশা করবে যে, সুদের হার বাড়বে অর্থাৎ বণ্ডের দাম কমবে। সুতরাং, বন্ড কিনলে মূলধনী-ক্ষতি হবে। ফলে লোকে বণ্ড ছেড়ে নগদ টাকা ধরে রাখতে চাইবে। ফাটকা কারবারের জন্য নগদ টাকার চাহিদা (L_2) বেশি হবে। সুতরাং L_2 রেখাটি ৭.১১ নং চিত্রের ন্যায় নিম্নমুখী হবে। তবে সুদের হার খুব বেশি ($= r_1$) হলে সবাই বন্ড কিনতে চাইবে। তখন ফাটকা কারবারের জন্য নগদ টাকার চাহিদা শূন্য হবে। আবার,

সুদের হার খুব কম (= r_2) হলে ফাটকা কারবারের জন্য নগদ টাকার চাহিদা অসীম হবে। ফাটকা কারবারের জন্য অর্থের চাহিদাকে কেইন্‌স্‌ নিস্ক্রিয় অর্থের চাহিদা (demand for idle balance) বলে অভিহিত করেছেন।

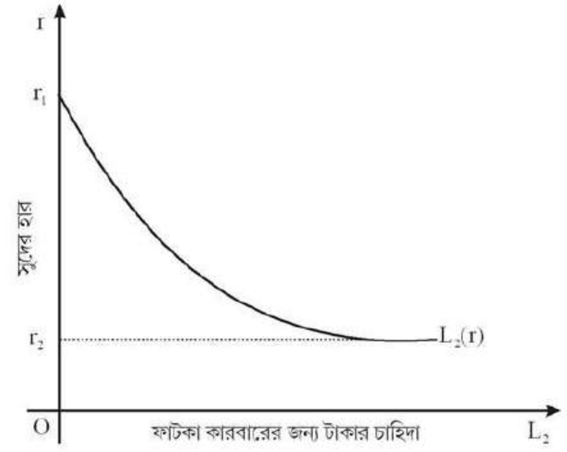

চিত্র ৭.১১

এখন, টাকার মোট চাহিদা = $M^d = L_1(Y) + L_2(r) = L(Y, r)$ অর্থাৎ টাকার মোট চাহিদা নির্ভর করে আয়স্তর (Y) ও সুদের হারের (r) উপর। কেইন্‌স্‌ একে বলেছেন তারল্য পছন্দ অপেক্ষক। আয়ের স্তরকে নির্দিষ্ট বলে ধরে নিলে L_1ও নির্দিষ্ট হয়ে যাবে। তখন টাকার চাহিদা রেখাটি (M^d) L_2 রেখার ন্যায় দেখতে হবে। শুধু এটি L_1 পরিমাণ ডানদিকে সরে যাবে (চিত্র ৭.১২)। এই M^d রেখা প্রথমে উল্লম্ব, তারপর নিম্নমুখী এবং সবশেষে সমান্তরাল হবে। এখন, মনে করি, টাকার জোগান নির্দিষ্ট। এটি সুদের হারের উপর নির্ভর করে না। সুতরাং টাকার জোগান রেখাটি ৭.১৩ নং চিত্রের ন্যায় উল্লম্ব সরলরেখা হবে ($M^s = M_0$)।

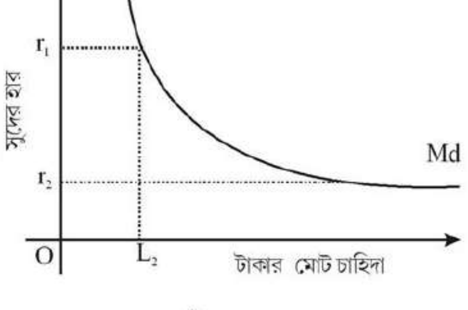

চিত্র ৭.১২

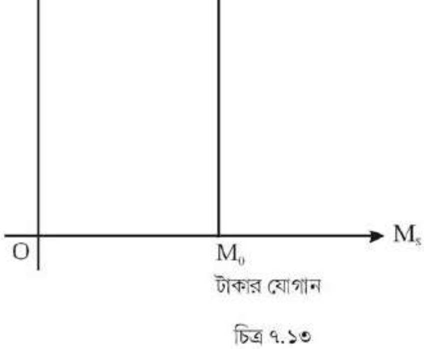

চিত্র ৭.১৩

এখন, ভারসাম্য সুদের হার নির্ধারণ করার জন্য আমরা টাকার চাহিদা রেখা (M^d) ও টাকার জোগান রেখাকে একই চিত্রে স্থাপন করলাম (চিত্র ৭.১৪)। এই দুই রেখা পরস্পরকে E বিন্দুতে ছেদ করেছে। ঐ বিন্দুতে $M^d = M^s$। সুতরাং E বিন্দু হল ভারসাম্য বিন্দু এবং Or_0 হল ভারসাম্য সুদের হার। এভাবে, তারল্য পছন্দ তত্ত্বে টাকার চাহিদা ও টাকার জোগানের সমতার দ্বারা ভারসাম্য সুদের হার নির্ধারিত হয়।

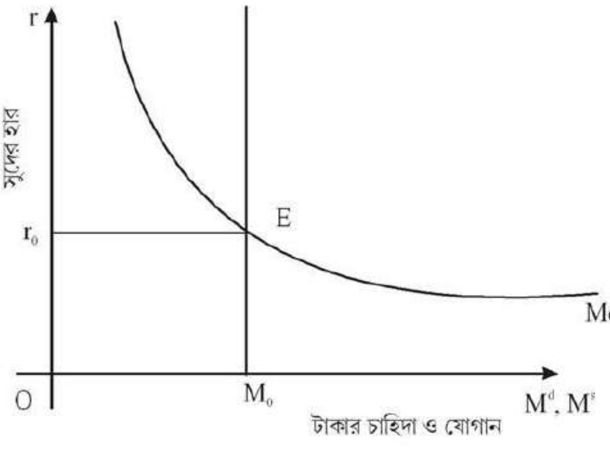

চিত্র ৭.১৪

সীমাবদ্ধতা : কেইন্স্-এর তারল্য পছন্দ তত্ত্বটির কয়েকটি সীমাবদ্ধতা আছে। (i) এই তত্ত্বে সুদের হার নির্ধারণ করার জন্য আয়স্তরকে স্থির বলে ধরতে হয়। আয়স্তর পরিবর্তিত হলে এই তত্ত্বে সুদের হার অনির্ণেয় (indeterminate) হয়ে পড়ে। (ii) এই তত্ত্ব অনেকখানি প্রত্যাশা ও সম্ভাবনার উপর নির্ভরশীল। (iii) সুদের হার নিছক আর্থিক বিষয় নয়। ইহা সঞ্চয় ও বিনিয়োগ প্রবণতার উপরও নির্ভর করে। কিন্তু এই তত্ত্বে সুদের হার নির্ধারণে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ভূমিকাকে উপেক্ষা করা হয়েছে। (iv) এই তত্ত্বে ধরা হয় যে, দ্রব্যসামগ্রীর লেনদেনের জন্য টাকার চাহিদা নির্ভর করে আয়ের স্তরের উপর। কিন্তু কোনো কোনো অর্থনীতিবিদ দেখিয়েছেন যে, লেনদেনের জন্য চাহিদা সুদের হারের উপরও বিপরীতভাবে নির্ভর করে। (v) এই তত্ত্বে কোনো ব্যক্তি হয় নগদ অর্থ অথবা বণ্ড হাতে রাখে। কিন্তু বাস্তবে লোকে বিভিন্ন রকমের আর্থিক পরিসম্পদ হাতে রাখে। (vi) এই তত্ত্বে অর্থের জোগানের দিকটি বিবেচনা করা হয়নি।

এ সমস্ত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও একথা উল্লেখযোগ্য যে, কেইন্স্-এর তারল্য পছন্দ তত্ত্ব অর্থনীতিতে এক বিশেষ স্থান দখল করে আছে। দেশের মন্দাবস্থা কাটাতে শুধুমাত্র আর্থিক নীতির উপর নির্ভর করলে হবে না, তা এই তত্ত্বে সুন্দর ভাবে দেখানো হয়েছে। কেইন্স্ মন্দা দূর করতে আর্থিক নীতি অপেক্ষা রাজস্ব নীতির উপর বেশি নির্ভর করতে সুপারিশ করেছেন। আর্থিক নীতির অকার্যকারিতা কেইন্স্-এর তারল্য পছন্দ তত্ত্ব সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছে।

৭.৮.৪. তারল্যের ফাঁদের ধারণা

যে অবস্থায় অর্থ কর্তৃপক্ষ টাকার জোগান বাড়িয়ে সুদের হারকে কমাতে পারে না সেই অবস্থাকে তারল্যের ফাঁদ বলে। ধারণাটিকে ৭.১৫ নং চিত্রে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। চিত্রে প্রাথমিক ভারসাম্য বিন্দু হল E এবং Or_0 হল ভারসাম্য সুদের হার। এখন, অর্থ কর্তৃপক্ষ টাকার জোগান বাড়িয়ে OM_2 করলে সুদের হার কমে Or_2 হয়। কিন্তু এরপর টাকার জোগান বাড়ালে সুদের হার আর কমে না। এই অবস্থাকে বলা হয় তারল্যের ফাঁদ। আসলে, এখানে সুদের হার এত কম যে, প্রত্যেক ফাটকা কারবারি ভাবছে, সুদের হার বাড়বে অর্থাৎ বণ্ডের দাম কমবে। সুতরাং, মূলধনী-ক্ষতি এড়াবার জন্য তারা বণ্ড ছেড়ে নগদ টাকা হাতে রাখতে চাইবে। ফলে নগদ টাকার চাহিদা অসীম হবে এবং টাকার চাহিদা রেখাটি অনুভূমিক হবে। ফলে টাকার জোগান বাড়লেও সুদের হার আর কমবে না। ফলে বিনিয়োগ ব্যয় বাড়বে না এবং দেশের মন্দাবস্থা কাটবে না। এখানে অর্থ কর্তৃপক্ষের আর্থিক নীতি মন্দা কাটাতে ব্যর্থ হচ্ছে। সুতরাং, তারল্যের ফাঁদের ধারণা সরকারের আর্থিক নীতির অকার্যকারিতাকে (ineffectiveness of monetary policy) প্রকাশ করছে।

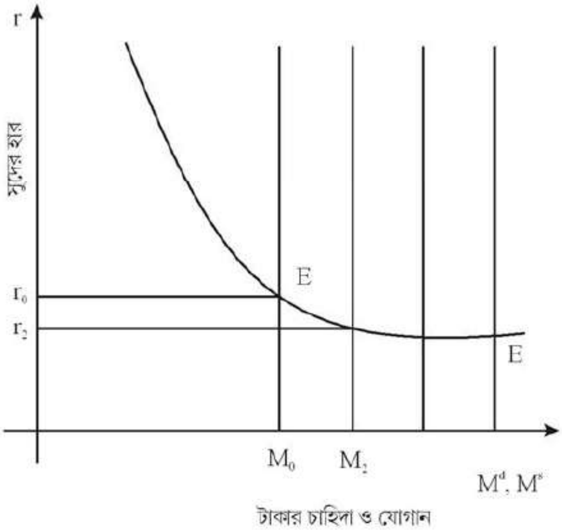

চিত্র ৭.১৫

৭.৯ মুনাফা ও তার উপাদানসমূহ

মুনাফা হল সংগঠন বা উদ্যোগশক্তির আয়। মোট রেভিনিউ এবং মোট ব্যয়ের পার্থক্যকেই মুনাফা বলে। ইহা ধনাত্মক, শূন্য অথবা ঋণাত্মক হতে পারে। মোট রেভিনিউ যদি মোট ব্যয় অপেক্ষা বড় হয় তাহলে মুনাফা ধনাত্মক। আর যদি মোট রেভিনিউ ও মোট ব্যয় সমান হয় তাহলে মুনাফার পরিমাণ শূন্য। অন্যদিকে, মোট রেভিনিউ যদি মোট ব্যয় অপেক্ষা কম হয়, তাহলে মুনাফার পরিমাণ ঋণাত্মক। আমরা জানি যে, উৎপাদনের চারটি উপাদান—জমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন। সংগঠন ছাড়া অন্যান্য উপাদানগুলিকে পাওনা মেটানোর পর বা অবশিষ্ট থাকে সেটিই মুনাফা। সুতরাং মুনাফা হল অবশিষ্ট আয়। উৎপাদনের

অন্যান্য উপাদানের আয় চুক্তির দ্বারা নির্দিষ্ট, কিন্তু মুনাফা চুক্তির দ্বারা নির্দিষ্ট নয়। এই প্রসঙ্গে মোট মুনাফা ও নিট মুনাফার মধ্যে পার্থক্য করা দরকার। মোট রেভিনিউ ও মোট ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য হল মোট বা স্থূল মুনাফা। এখন, অনেক সময় এমন ঘটে যে, উৎপাদনের কিছু উপাদানের মালিক উদ্যোক্তা নিজেই। এই নিজস্ব উপাদানগুলির দাম হিসাবে যা পাওনা হয় সেটি মোট বা স্থূল মুনাফা থেকে বাদ দিলে পাওয়া যায় নিট মুনাফা। তাহলে এক কথায় বলা যায়, মোট মুনাফা এবং মালিকের নিজস্ব সরবরাহ করা উপাদানের ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য হল নিট মুনাফা।

☐ মুনাফার উপাদানসমূহ (Elements of Profit) :

মুনাফা বলতে মোট মুনাফা অথবা নিট মুনাফা বোঝাতে পারে। এই মোট মুনাফা ও নিট মুনাফা উভয়েরই নানা উপাদান আছে। এজন্য অধ্যাপক টাউসিগ মুনাফাকে একটি মিশ্র ও বিতর্কিত আয় বলেছেন। মোট মুনাফার মধ্যে কতকগুলি উপাদান আছে। এর মধ্যে রয়েছে সংগঠকের নিট মুনাফা, সংগঠকের নিজস্ব জমির খাজনা, নিজস্ব শ্রমের মজুরি, নিজস্ব মূলধনের সুদ প্রভৃতি। নিট মুনাফার মধ্যেও কিছু বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে। আমরা জানি যে, মোট বা স্থূল মুনাফা থেকে সংগঠকের নিজস্ব উপকরণগুলির আরোপিত দাম বা অন্তর্নিহিত ব্যয় বাদ দিলে পড়ে থাকে নিট বা বিশুদ্ধ (Pure) মুনাফা। এই নিট মুনাফার উপাদানগুলি এখন সংক্ষেপে উল্লেখ করা যেতে পারে।

(i) নিট মুনাফার একটি উপাদান হল ঝুঁকি এবং অনিশ্চয়তা বহনের পুরস্কার। উৎপাদনের কাজে ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা থাকে। উদ্যোক্তাকে সেই ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা বহন করতে হয়। এই কাজের জন্য উদ্যোক্তার যা প্রাপ্য, তা নিট মুনাফার একটি উপাদান।

(ii) উদ্যোক্তা কোনো নতুন দ্রব্য, নতুন বাজার বা নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করতে পারে। এর ফলে উদ্যোক্তার বাড়তি মুনাফা হতে পারে। সেটি নিট মুনাফার অপর একটি উপাদান।

(iii) দ্রব্য বা উপাদানের বাজারে উদ্যোক্তার একচেটিয়া ক্ষমতা থাকলে সে বাড়তি কিছু উপার্জন করে। এই বাড়তি উপার্জন নিট মুনাফার একটি উপাদান।

(iv) দ্রব্য পৃথকীকরণের মাধ্যমেও উদ্যোক্তা তার মুনাফা বাড়াতে পারে। এই বাড়তি মুনাফাও নিট মুনাফার অন্তর্ভুক্ত।

(v) ব্যবসার জগতে নানা অস্বাভাবিক পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে। এর ফলেও উদ্যোক্তা কিছু বাড়তি আয় করতে সক্ষম হতে পারে। এই আকস্মিক আয়ও নিট মুনাফার একটি উপাদান।

৭.১০ মুনাফা সম্পর্কে বিভিন্ন তত্ত্ব

মুনাফার কেন উদ্ভব ঘটে, সে সম্পর্কে বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ নানা তত্ত্ব দিয়েছেন। সেগুলির মধ্যে

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য তত্ত্ব আমরা সংক্ষেপে এই বিভাগে আলোচনা করব।

৭.১০.১ ঝুঁকি বহন তত্ত্ব

মুনাফার ঝুঁকি বহন তত্ত্বটি দিয়েছেন অধ্যাপক হলি (Hawley)। এই তত্ত্বের প্রধান সমর্থক হলেন অধ্যাপক মার্শাল। উদ্যোক্তা বাজার থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করে, বিভিন্ন উপকরণ নির্দিষ্ট অনুপাতে ব্যবহার করে দ্রব্যটি উৎপাদন করে। এই উৎপন্ন দ্রব্য তারপর উদ্যোক্তা বাজারে বিক্রি করে যে বাজার তার কাছে প্রায় অজানা। ক্রেতার রুচি ও পছন্দের পরিবর্তন হতে পারে, বিকল্প দ্রব্যের উদ্ভাবন হতে পারে, বাজারে নতুন প্রতিযোগী বিক্রেতার আবির্ভাব হতে পারে ইত্যাদি। এক কথায়, উদ্যোক্তাকে নানা ঝুঁকি নিয়ে উৎপাদন ও বিক্রির কাজ করতে হয়। হলি-র মতে, মুনাফা হল এই ঝুঁকি বহনের পুরস্কার।

মুনাফা সম্পর্কে ঝুঁকি বহন তত্ত্বের কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। সংক্ষেপে সেগুলি নিম্নরূপ :

প্রথমত, অধ্যাপক নাইটের মতে, কিছু ঝুঁকি বিমার মাধ্যমে এড়ানো যায়। সুতরাং এই ধরনের ঝুঁকি মুনাফার কারণ হতে পারে না। যে সমস্ত ঝুঁকি আগে থেকে জানা যায় না এবং সেজন্য বিমা করা যায় না, সেগুলিকে নাইট অনিশ্চয়তা বলেছেন। নাইটের মতে, মুনাফা হল এই অনিশ্চয়তা বহনের পুরস্কার।

দ্বিতীয়ত, অধ্যাপক কার্ভার-এর মতে, মুনাফা ঝুঁকি বহনের পুরস্কার নয়, বরং ঝুঁকি কমানোর পুরস্কার। যে উদ্যোক্তা যত দক্ষভাবে ঝুঁকি কমাতে পারে, সেই উদ্যোক্তা তত বেশি মুনাফা ভোগ করে।

তৃতীয়ত, উদ্যোক্তার কর্মদক্ষতার জন্য বা নতুন কিছু উদ্ভাবনের জন্য অথবা বিশেষ কোনো একচেটিয়া ক্ষমতার জন্য মুনাফার উদ্ভব হতে পারে, মুনাফা শুধুমাত্র ঝুঁকি বহনের পুরস্কার নয়।

চতুর্থত, বিভিন্ন উদ্যোক্তার মধ্যে দক্ষতার পার্থক্য থাকে। দক্ষতর উদ্যোক্তা বেশি মুনাফা অর্জন করে। আর অপেক্ষাকৃত অদক্ষ উদ্যোক্তা কম মুনাফা অর্জন করে। সুতরাং, অনেকে মনে করেন যে, উদ্যোক্তার দক্ষতার তারতম্যের জন্যই মুনাফার উদ্ভব ঘটে।

মুনাফা ঝুঁকি বহনের তত্ত্বের এসমস্ত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বলা যায় যে, মুনাফার একটি অংশ অবশ্যই ঝুঁকি বহনের পুরস্কার। উদ্যোক্তা ঝুঁকি বহন করে বলেই সে মুনাফার প্রত্যাশা করে থাকে।

৭.১০.২. অনিশ্চয়তা বহন তত্ত্ব

মুনাফার উদ্ভব সম্পর্কে অনিশ্চয়তা বহন তত্ত্বটি প্রদান করেন অধ্যাপক নাইট (Knight)। এই তত্ত্বের মূলকথা হল, অনিশ্চয়তা বহনের পুরস্কারই হল মুনাফা। নাইট ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। যে ঝুঁকিকে বিমার মাধ্যমে এড়ানো যায় না তাকে তিনি অনিশ্চয়তা বলে অভিহিত করেছেন। নাইটের মতে, এই অনিশ্চয়তা বহন করার জন্যই উদ্যোক্তা মুনাফা পেয়ে থাকে। যে ঝুঁকিগুলিকে বিমার মাধ্যমে এড়ানো যায়, সেগুলি প্রকৃতপক্ষে কোনো ঝুঁকিই নয়। সুতরাং এই ঝুঁকিগুলি বহনের জন্য কোনো

বাড়তি পুরস্কার থাকতে পারে না। শুধু যে ঝুঁকিগুলি বিমা করে এড়ানো যায় না, সেগুলিই প্রকৃত ঝুঁকি বা নাইটের কথায় অনিশ্চিয়তা। এই অনিশ্চয়তা বা অনিশ্চিত অবস্থার সম্মুখীন হতে হয় বলেই সংগঠক বা উদ্যোক্তা মুনাফা প্রত্যাশা করে।

নাইটের অনিশ্চয়তা বহন তত্ত্বের কয়েকটি সীমাবদ্ধতা আছে। **প্রথমত,** মুনাফা কেবলমাত্র অনিশ্চয়তা বহনের পুরস্কার নয়। মুনাফার নানা উপাদান আছে। সেই উপাদানগুলি এই তত্ত্বে বিবেচিত হয়নি। সেদিক থেকে দেখতে গেলে এই তত্ত্ব একপেশে। **দ্বিতীয়ত,** উদ্যোক্তা শুধু অনিশ্চয়তা বহনই করে না। সে নতুন কোনো উৎপাদন পদ্ধতি বা নতুন কোনো যন্ত্র প্রবর্তন করে। এর ফলেও মুনাফার উদ্ভব ঘটে। এই উদ্ভাবনের বিষয়টি অনিশ্চয়তা বহন তত্ত্বে ধরা হয়নি। **তৃতীয়ত,** অনিশ্চয়তা একটি মানসিক ধারণা। একে পরিমাপ করা যায় না। কাজেই অনিশ্চয়তা বেশি হলে মুনাফা কম হবে, এরূপ বলা যায় না। **চতুর্থত,** অনেকে মনে করেন যে, অনিশ্চয়তা কম হলেই বরং বেশি মুনাফা পাওয়ার নিশ্চয়তা বেশি। অনিশ্চয়তা বেশি হলে মুনাফা পাবার সম্ভাবনা কম। **পঞ্চমত,** বাজারের অপূর্ণতা থেকেও মুনাফার একটা অংশ উদ্ভূত হয়। যেমন, বাজারের একচেটিয়া অবস্থার জন্যও বিক্রেতা বেশি মুনাফা পেতে পারে। এই বাড়তি মুনাফা অনিশ্চয়তা থেকে উদ্ভূত নয়।

এসব সমালোচনা সত্ত্বেও স্বীকার করতেই হয় যে, নাইটের তত্ত্বের কিছুটা সত্যতা আছে। দ্রব্য উৎপাদন ও তা বাজারে বিক্রি করার ক্ষেত্রে নানা ধরনের অনিশ্চয়তা থাকে। এই অনিশ্চয়তা উদ্যোক্তাই বহন করে। তার মুনাফার একটা অংশ অবশ্যই এই অনিশ্চয়তা বহনের পুরস্কার। তবে মুনাফার সবটাই অনিশ্চয়তা বহনের পুরস্কার নয়।

৭.১০.৩. মুনাফার উদ্ভাবন তত্ত্ব

মুনাফা সম্পর্কে উদ্ভাবন তত্ত্বের প্রবর্তক হলেন জোসেফ সুমপিটার (Joseph Schumpeter)। তাঁর মতে, মুনাফা হল নতুন কিছু উদ্ভাবনের পুরস্কার। উদ্যোক্তার একটি প্রধান কাজ হল নতুন কিছু উদ্ভাবন করা। সেটি নতুন দ্রব্য, নতুন উৎপাদন পদ্ধতি, নতুন বাজার অথবা নতুন উপাদান প্রভৃতি যা কিছু হতে পারে। এর ফলে ঐ উদ্যোক্তা অন্য উদ্যোক্তাদের চেয়ে বাড়তি কিছু উপার্জন করে। এই বাড়তি উপার্জনটিই উদ্বৃত্ত মুনাফা এবং তা উদ্ভাবনেরই পুরস্কার। অবশ্য এই বেশি মুনাফা অর্জন চিরকাল ধরে চলতে পারে না। প্রথম উদ্ভাবকের এই সাফল্য দেখে অন্যান্য উদ্যোক্তারা তাকে অনুকরণ করে। ফলে নতুন উদ্ভাবনটি আর নতুন থাকে না। ফলে বাড়তি মুনাফা একসময় অবলুপ্ত হয়। তখন আবার নতুন কিছু উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা শুরু হয়। আবার নতুন কিছুর উদ্ভাবন হয় এবং এভাবে নতুন নতুন উদ্ভাবনের মধ্য দিয়েই মুনাফা সৃষ্টি হয়।

সুমপিটারের উদ্ভাবন তত্ত্বেরও নানা সীমাবদ্ধতা আছে। **প্রথমত,** এই তত্ত্বে স্বাভাবিক মুনাফার উপরে বাড়তি মুনাফা উদ্যোক্তা পেয়ে থাকে, তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কিন্তু উদ্যোক্তা কেন স্বাভাবিক মুনাফা পেয়ে

থাকে, তার কোনো ব্যাখ্যা এই তত্ত্বে নেই। **দ্বিতীয়ত,** কোনো নতুন পদ্ধতি বা যন্ত্রের উদ্ভাবন হলে ফার্মের পুরনো যন্ত্র বা পদ্ধতি অকেজো হয়ে যেতে পারে। তার ফলে ফার্মের ক্ষতিও হতে পারে। উদ্ভাবনের এই প্রভাবটি এই তত্ত্বে বিচার করা হয়নি। **তৃতীয়ত,** নাইটের মতে, মুনাফা হল অনিশ্চয়তা বহনের পুরস্কার। **চতুর্থত,** হলি-র মতে, মুনাফা হল উদ্যোক্তা কর্তৃক ঝুঁকি বহনের পুরস্কার। মুনাফা উদ্ভবের পিছনে এই ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা বহনের ভূমিকাকে উদ্ভাবনতত্ত্বে বিচার করা হয়নি।

৭.১০.৪. মুনাফার গতিশীলতা তত্ত্ব

মুনাফার গতিশীলতা তত্ত্বের প্রবক্তা হলেন মার্কিন অর্থনীতিবিদ জে. বি. ক্লার্ক। এই তত্ত্বের মূলকথা হল যে, গতিশীল অর্থনীতিতেই মুনাফার উদ্ভাবন ঘটে। এরূপ অর্থনীতিতে নতুন দ্রব্য বা উৎপাদন পদ্ধতির উদ্ভাবন হয়, ক্রেতাদের রুচি ও পছন্দের পরিবর্তন ঘটে, জনসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে, জীবনযাত্রার ধরনে পরিবর্তন ঘটে, দেশীয় ও বৈদেশিক বাণিজ্যের গঠনে পরিবর্তন ঘটে থাকে ইত্যাদি। এককথায়, গতিশীল অর্থনীতিতে বিভিন্ন অর্থনৈতিক চলরাশির সদা পরিবর্তন ঘটে। অন্যদিকে, যে অর্থনীতিতে অর্থনৈতিক চলরাশিগুলির কোনো পরিবর্তন ঘটে না, সেই অর্থনীতিকে স্থিতিশীল অর্থনীতি (Static economy) বলা হয়। এই স্থিতিশীল অর্থনীতিতে কোনোরূপ মুনাফা দেখা যায় না। গতিশীল অর্থনীতিতে নানা পরিবর্তন ঘটে এবং তার ফলে এই অর্থনীতিতে নানা অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। এখানে উৎপাদনের কাজটি সংগঠিত করার মধ্যে কিছু ঝুঁকি থাকে। তাছাড়া, গতিশীল অর্থনীতিতে নতুন কিছু উদ্ভাবন ঘটে থাকে। এই সমস্ত কারণে গতিশীল অর্থনীতিতে মুনাফার উদ্ভব ঘটে থাকে। কিন্তু স্থিতিশীল সমাজ বা অর্থনীতিতে কোনো পরিবর্তন নেই বলে সেখানে সবকিছুই আগাম বোঝা যায়। ফলে সেখানে দাম ও গড় ব্যয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না। ফলে সেখানে কোনো মুনাফার উদ্ভব হয় না। কিন্তু গতিশীল অর্থনীতি সদা পরিবর্তনশীল। এই সমস্ত পরিবর্তনের ফলেই গড় ব্যয়ের তুলনায় দাম বেশি হয় এবং তার ফলে মুনাফার উদ্ভব ঘটে।

মুনাফার গতিশীলতা তত্ত্বটি দিয়েও সুমপিটারের উদ্ভাবন তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করা যায় কারণ উদ্ভাবনও গতিশীল অর্থনীতিরই একটি বৈশিষ্ট্য। সেদিক থেকে দেখলে, সুমপিটারের উদ্ভাবন তত্ত্বটি মুনাফার গতিশীলতা তত্ত্বের একটি বিশেষ রূপ বলে ভাবা যেতে পারে। তবে এই গতিশীলতা তত্ত্বেরও কয়েকটি সীমাবদ্ধতা আছে। **প্রথমত,** পরিবর্তন ঘটলেই যে মুনাফার উদ্ভব ঘটবে তার কোনো মানে নেই। পরিবর্তনের ফলে সমাজে লোকসান বা ক্ষতিও হতে পারে। **দ্বিতয়ত,** উদ্যোক্তার মুনাফার পরিমাণ তার দক্ষতার উপরও নির্ভর করে। সেই বিষয়টি গতিশীলতার তত্ত্বে বিবেচিত হয়নি। **তৃতীয়ত,** সমাজ সর্বদাই গতিশীল। সব সমাজেই কিছু না কিছু পরিবর্তন সর্বদাই ঘটছে। কিন্তু সর্বদাই মুনাফা অর্জিত হয় না।

৭.১১ দীর্ঘকালে কি মুনাফা থাকে?

আমরা মুনাফাকে দু'ভাগে ভাগ করতে পারি। সেই দুটি হল : স্বাভাবিক মুনাফা ও স্বাভাবিকের

অতিরিক্ত মুনাফা বা অস্বাভাবিক মুনাফা। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে কোনো ফার্ম স্বল্পকালে স্বাভাবিকের বেশি মুনাফা পেতে পারে, কেবলমাত্র স্বাভাবিক মুনাফা পেতে পারে অথবা স্বাভাবিকের কম মুনাফা পেতে পারে বা লোকসান হতে পারে। তবে সেই লোকসান যেন মোট স্থির ব্যয় অপেক্ষা বেশি না হয়। অবশ্য দীর্ঘকালে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে প্রতিটি ফার্ম কেবলমাত্র স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করে। সেক্ষেত্রে কোনো অস্বাভাবিকে মুনাফা থাকে না। তবে বাস্তবে পূর্ণ প্রতিযোগিতার অবস্থা বিশেষ দেখা যায় না। বাস্তবে বাজারে নানা অপূর্ণাঙ্গতা দেখা যায়। বাজারে এরূপ অপূর্ণতা থাকলে কোনো ফার্ম দীর্ঘকালেও স্বাভাবিকের উদ্বৃত্ত মুনাফা ভোগ করে। আর বাস্তবে সমাজ গতিশীল। এরূপ সমাজে নানা পরিবর্তন অনবরত ঘটে চলে। এর ফলেও দীর্ঘকালে বাড়তি মুনাফা থাকে।

৭.১২ সারাংশ

১. বণ্টন সম্পর্কে প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্ত্ব (Marginal Productivity Theory of Distribution) : বণ্টন সম্পর্কে প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্ত্বের প্রধান অনুমানগুলি হল : (i) উৎপন্ন ও উপাদানের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা আছে। (ii) উপাদানগুলি সম্পূর্ণরূপে বিভাজ্য। (iii) কোনো উপাদানের প্রতিটি একক সমদক্ষ। (iv) ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপন্নের বিধি কার্যকরী। (v) প্রতিটি ফার্ম মুনাফা সর্বাধিক করতে চায়। এই অনুমানগুলির ভিত্তিতে প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্বের মূলকথা হল, কোনো উপাদানের দাম নির্ধারিত ঐ উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদশীলতা অনুসারে। এই তত্ত্বটির অবশ্য কয়েকটি সীমাবদ্ধতা আছে। (i) এই তত্ত্বে কোনো উপাদানের চাহিদার দিক কেবলমাত্র বিবেচনা করা হয়েছে। (ii) তত্ত্বটিতে ধরা হয় যে, উৎপন্ন ও উপাদানের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা বর্তমান; উপাদানগুলি সম্পূর্ণরূপে বিভাজ্য; কোনো উপাদানের প্রতিটি এককই সমদক্ষ প্রভৃতি। এই অনুমানগুলি বাস্তবসম্মত নয়।

২. মজুরি নির্ধারণের আধুনিক তত্ত্ব (Modern Theory of Wage Determination) : মজুরি নির্ধারণের আধুনিক তত্ত্বের মূলকথা হল, শ্রমের চাহিদা ও শ্রমের জোগানের দ্বারা ভারসাম্য মজুরির হার নির্ধারিত হয়।

৩. শ্রমের জোগান রেখার আকৃতি (Shape of Labour Supply Curve) : শ্রমের ব্যক্তিগত জোগান রেখা প্রথমে ঊর্ধ্বমুখী ও পরে পশ্চাৎমুখী হয়। শ্রমের মোট জোগান রেখা সাধারণত বাঁদিক থেকে ডানদিকে ঊর্ধ্বমুখী হবে।

৪. শ্রমিকের শোষণ (Exploitation of Labour) : শ্রমিক যে পরিমাণ মূল্য সৃষ্টি করে তার চেয়ে কম পরিমাণ পারিশ্রমিক তাকে দেওয়া হলে তাকে শ্রমিকের শোষণ বলে। শ্রমিকের প্রান্তিক আয় উৎপাদনশীলতা ও শ্রমিকের প্রকৃত প্রাপ্ত মজুরির পার্থক্যই হল শ্রমিকের শোষণের মাত্রার পরিমাপ।

৫. শ্রমিক সংঘ এবং এর কার্যাবলি (Trade Union and its Functions) : শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষার

জন্য এবং শ্রমিকদের মঙ্গলসাধনের উদ্দেশ্যে গঠিত শ্রমিকদের একটি স্থায়ী ও স্বেচ্ছামূলক সংগঠন হল শ্রমিক সংঘ। শ্রমিক সংঘের কার্যাবলিকে দু'ভাগে ভাগ করা যায় : সংগ্রামমূলক কাজকর্ম ও ভ্রাতৃত্বমূলক কাজকর্ম। সংগ্রামমূলক কাজকর্মের মধ্যে রয়েছে মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে আন্দোলন, কাজের অবস্থা ও শর্তাবলির উন্নতির জন্য আন্দোলন, শ্রমিক ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন প্রভৃতি। ভ্রাতৃত্বমূলক কাজকর্মের মধ্যে দুঃস্থ শ্রমিক পরিবারকে সাহায্য দান, অসুস্থ শ্রমিকের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, শ্রমিকদের শিক্ষার জন্য নৈশ বিদ্যালয় পরিচালনা প্রভৃতি।

৬. সুদের হারের তত্ত্ব (Theory of Rate of Interest) : কেইন্‌স্-এর মতে, সুদ হল অর্থের তারল্য ব্যবহারের দাম। ধ্রুপদি অর্থনীতিবিদ্‌দের মতে, সুদ হল মূলধনের ব্যবহারের দাম। নয়া-ধ্রুপদি অর্থনীতিবিদ্‌দের মতে, সুদ হল ঋণযোগ্য তহবিলের ব্যবহারের দাম। প্রাচীন বা ধ্রুপদি অর্থনীতিবিদদের মতে, সুদের হার নির্ধারিত হয় মূলধনের চাহিদা ও মূলধনের জোগানের দ্বারা অর্থাৎ বিনিয়োগ ও সঞ্চয়ের সমতার দ্বারা। নয়া-প্রাচীন তত্ত্বে ভারসাম্য সুদের হার নির্ধারিত হয় ঋণযোগ্য তহবিলের চাহিদা ও জোগানের ঘাত-প্রতিঘাতের দ্বারা। আর কেইন্‌স্-এর তারল্য পছন্দ তত্ত্বে সুদের হার নির্ধারিত হয় টাকার চাহিদা ও টাকার জোগানের দ্বারা।

৭. মুনাফা ও তার উপাদানসমূহ (Profit and its Elements) : ফার্মের মোট বিক্রয়লব্ধ আয় ও মোট ব্যয়ের পার্থক্যকেই মুনাফা বলে। অন্যভাবে বলতে গেলে, মুনাফা হল সংগঠন নামক উপাদান সেবার দাম। মুনাফা একটি মিশ্র আয়। এর মধ্যে রয়েছে উদ্যোক্তার নিজস্ব শ্রমের মজুরি, নিজস্ব জমির খাজনা, নিজস্ব মূলধনের সুদ এবং উদ্যোগ শক্তির জন্য নিট মুনাফা।

৮. মুনাফা সম্পর্কে বিভিন্ন তত্ত্ব (Different Theories of Profit) : মুনাফার উদ্ভব সম্পর্কে অনেক তত্ত্ব আছে। তাদের মধ্যে প্রধান চারটি তত্ত্ব হল : (i) হলি-র ঝুঁকি বহন তত্ত্ব : এর মূল কথা হল, উদ্যোক্তাকে ঝুঁকি বহন করতে হয় এবং মুনাফা হল এই ঝুঁকি বহনের পুরস্কার। (ii) নাইট-এর অনিশ্চয়তা বহন তত্ত্ব : এই তত্ত্বের মতে, উদ্যোক্তার কিছু ঝুঁকি আছে যেগুলি বিমাযোগ্য নয়। এই শ্রেণির ঝুঁকিকে নাইট অনিশ্চয়তা বলেছেন। তাঁর মতে, মুনাফা হল উদ্যোক্তার অনিশ্চয়তা বহনের পুরস্কার। (iii) সুমপিটার-এর উদ্ভাবন তত্ত্ব : এই তত্ত্বের মূলকথা হল যে, উদ্যোক্তার প্রধান কাজ হল নতুন দ্রব্য, নতুন পদ্ধতি, নতুন বাজার প্রভৃতি উদ্ভাবন করা এবং মুনাফা হল উদ্যোক্তার এই উদ্ভাবন শক্তির পুরস্কার।

৭.১৩ অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্নাবলি : প্রতিটি ২ নম্বরের (Short Answer Type Questions : Each of 2 Marks)

১. VMP ও MRP-র মধ্যে সম্পর্ক কী?

২. প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার ধারণা কয়টি ও কী কী?

৩. প্রান্তিক রেভিনিউ উৎপাদনশীলতা (MRP) কাকে বলে?

৪. প্রান্তিক উৎপাদন মূল্য (VMP) কাকে বলে?

৫. প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্বে মুনাফা সর্বাধিককরণের শর্ত কী?

৬. প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্বের মূলকথা কী?

৭. শ্রমিক সংঘ কাকে বলে?

৮. শ্রমিক সংঘের কাজগুলি কয় প্রকারের ও কী কী?

৯. শ্রমিক সংঘের কয়েকটি সংগ্রামমূলক কাজকর্মের উদাহরণ দিন।

১০. শ্রমিক সংঘের কয়েকটি ভ্রাতৃত্বমূলক কাজের উল্লেখ করুন।

১১. শ্রমিকের শোষণ বলতে কী বোঝেন?

১২. সুদ ককে বলে?

১৩. প্রাচীন বা ধ্রুপদি তত্ত্বে সুদ কীভাবে নির্ধারিত হয়?

১৪. নয়া-প্রাচীন তত্ত্বে সুদ কীভাবে নির্ধারিত হয়?

১৫. তারল্য পছন্দ তত্ত্বের মূলকথা কী?

১৬. অর্থের চাহিদার পিছনে কয়টি উদ্দেশ্য কাজ করে ও কী কী?

১৭. ফাটকা কারবারের অভিপ্রায় বলতে কী বোঝেন?

১৮. তারল্যের ফাঁদ কাকে বলে?

১৯. মুনাফা কাকে বলে?

২০. মুনাফার কয়েকটি উপাদান উল্লেখ করুন।

২১. মুনাফার ঝুঁকি বহন তত্ত্বের প্রবক্তা কে?

২২. মুনাফার ঝুঁকি বহন তত্ত্বের মূলকথা কী?

২৩. মুনাফার অনিশ্চয়তা বহন তত্ত্ব কে প্রবর্তন করেন?

২৪. মুনাফার অশ্চিয়তা বহন তত্ত্বের মূলকথা কী?

২৫. অনিশ্চয়তা কাকে বলে?

২৬. মুনাফার উদ্ভাবন তত্ত্বের প্রবক্তা কে?

২৭. মুনাফার উদ্ভাবন তত্ত্বের মূলকথা কী?

২৮. মুনাফার গতিশীলতা তত্ত্ব কে প্রদান করেন?

২৯. মুনাফার গতিশীলতা তত্ত্বের মূল বক্তব্য কী?

৩০. তারল্য পছন্দ অপেক্ষক কাকে বলে?

৩১. ঋণযোগ্য তহবিলের চাহিদার পিছনে কী কী উদ্দেশ্য কাজ করে?

৩২. ঋণযোগ্য তহবিলের জোগানের পিছনে প্রধান উৎসগুলির নাম বলুন।

মাঝারি দৈর্ঘ্যের উত্তরের প্রশ্নাবলি : প্রতিটি ৫ নম্বরের (Medium Answer Type Questions : Each of 5 Marks)

১. VMP ও MRP-র সংজ্ঞা দাও এবং তাদের মধ্যে সম্পর্ক বুঝিয়ে বলুন।

২. প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্বের অনুমানগুলি উল্লেখ করুন।

৩. প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্বের সীমাবদ্ধতাগুলি বর্ণনা করুন।

৪. মজুরি নির্ধারণের আধুনিক তত্ত্বটি বর্ণনা করুন।

৫. শ্রমিকের শোষণের ধারণাটি ব্যাখ্যা করুন।

৬. তারল্যের ফাঁদের ধারণাটি বুঝিয়ে বলুন।

৭. মুনাফা কাকে বলে? মুনাফার উপাদানগুলি উল্লেখ করুন।

৮. দীর্ঘকালে কি মুনাফা থাকতে পারে?

৯. মুনাফার উদ্ভব সম্পর্কে কয়েকটি প্রধান তত্ত্বের নাম ও তাদের প্রবক্তাদের নাম বলুন।

১০. সুদের হার নির্ধারণের প্রধান কয়েকটি তত্ত্বের নাম উল্লেখ করুন।

১১. শ্রমিক সংঘের কার্যাবলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।

১২. সুদ বলতে কী বোঝেন?

দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্নাবলি: প্রতিটি ১০ নম্বরের (Long Answer Type Questions : Each of 10 Marks)

১. বণ্টন সম্পর্কে প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করুন।

২. শ্রমের ব্যক্তিগত জোগান রেখার আকৃতি ব্যাখ্যা করুন।

৩. সুদের হার নির্ধারণের প্রাচীন তত্ত্বটি বর্ণনা করুন।

৪. সুদের হার সম্পর্কে নয়া-প্রাচীন তত্ত্বটি আলোচনা করুন।

৫. সুদের হার নির্ধারণের নগদ পছন্দ তত্ত্বটি বর্ণনা করুন।

৬. কেইন্‌স্-এর তারল্য পছন্দ তত্ত্বটি সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৭. মুনাফা সম্পর্কে ঝুঁকি বহন তত্ত্বটি সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৮. ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করুন। মুনাফার উদ্ভব সম্পর্কে অনিশ্চয়তা বহন তত্ত্বটি আলোচনা করুন।

৯. সুদ সম্পর্কে ঋণযোগ্য ভাণ্ডার তত্ত্বটি সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

১০. মুনাফার উদ্ভব সম্পর্কে উদ্ভাবন তত্ত্বটি বিশ্লেষণ করুন।

১১. মুনাফার উদ্ভব সম্পর্কে গতিশীলতার তত্ত্বটি কতটা সন্তোষজনক তা বিচার করুন।

১২. 'টাকার চাহিদা ও টাকার জোগানের দ্বারা ভারসাম্য সুদের হার নির্ধারিত হয়"—যুক্তিটি প্রতিষ্ঠিত করুন।

৭.১৪ নির্বাচিত গ্রন্থাবলি

১. সরখেল, জয়দেব ও সেখ সেলিম (২০১৯) : ব্যষ্টিগত অর্থনীতি ও ভারতের অর্থনীতি, বুক সিণ্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড।

২. Sarkhel, Jaydeb & Seikh Salim (2010) : Economic Principles and Indian Economic Problems, Book Syndicate Private Ltd.

৩. Samuelson, P. A. & W. D. Nordhaus (1986) : Economics, McGraw Hill

৪. Lipsey, R. (1983): An Introduction to Positive Economics, ELBS

৫. Ahuja, H. L. (1979) : Advanced Economic Theory, S.Chand & Co.

৬. Stonier, A.W. & D.C. Hague (1957) : A Text Book of Economic Theory, Orient Longman.

একক ৮ ❑ সমষ্টিগত অর্থনীতির উপাদানসমূহ

গঠন

৮.১ উদ্দেশ্য

৮.২ প্রস্তাবনা

৮.৩ জাতীয় আয়ের সংজ্ঞা

৮.৪ জাতীয় আয়ের বিভিন্ন ধারণা

৮.৫ জাতীয় আয়ের পরিমাপ

  ৮.৫.১ মূল্য সংযোজিত পদ্ধতি

  ৮.৫.২ আয়ের বৃত্তাকার প্রবাহ

৮.৬ জাতীয় আয় পরিমাপের সমস্যাবলি

৮.৭ ভোগ অপেক্ষক ও সঞ্চয় অপেক্ষক

৮.৮ ভোগ ব্যয় নির্ধারণকারী বিষয়সমূহ

৮.৯ স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ ও উদ্ভূত বিনিয়োগ

৮.১০ ভোগ ও বিনিয়োগ ব্যয় দ্বারা ভারসাম্য আয় নির্ধারণ

  ৮.১০.১ সঞ্চয় ও বিনিয়োগ ব্যয় দ্বারা ভারসাম্য আয় নির্ধারণ

৮.১১ বিনিয়োগ গুণক বা ভারসাম্য আয়ের উপর বিনিয়োগ বৃদ্ধির প্রভাব

  ৮.১১.১ প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা ও বিনিয়োগ গুণকের সম্পর্ক

  ৮.১১.২. বিনিয়োগ গুণক তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা

৮.১২ অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব

  ৮.১২.১. ফিশার-এর বিনিময় সমীকরণ

  ৮.১২.২. কেম্ব্রিজ সমীকরণ বা নগদ ব্যালান্স সমীকরণ

  ৮.১২.৩. অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা

৮.১৩ মুদ্রাস্ফীতি : সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ

৮.১৩.১. চাহিদা বৃদ্ধিজনিত ও ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি

৮.১৩.২. মুদ্রাস্ফীতির ফাঁক

৮.১৩.৩. মুদ্রাস্ফীতির কারণ ও ফলাফল

৮.১৩.৪. মুদ্রাস্ফীতির নিয়ন্ত্রণ

৮.১৪ ত্বরণ তত্ত্ব এবং এর সীমাবদ্ধতা

৮.১৫ বাণিজ্য চক্র এবং এর বিভিন্ন স্তর

৮.১৬ সারাংশ

৮.১৭ অনুশীলনী

৮.১৮ নির্বাচিত গ্রন্থতালিকা

৮.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন—

- জাতীয় আয় ও তার পরিমাপ
- দেশের ভোগ ও বিনিয়োগ ব্যয় দ্বারা ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ধারণ
- অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব বা অর্থের জোগান ও দামস্তরের সম্পর্ক
- মুদ্রাস্ফীতির কারণ ও ফলাফল
- দেশের বিনিয়োগের উপর আয়স্তর বা চাহিদার ত্বরণ প্রভাব
- বাণিজ্য চক্র ও তার নিয়ন্ত্রণ

৮.২ প্রস্তাবনা

আগের এককগুলিতে ব্যষ্টিগত অর্থনীতিতে দাম ও চাহিদার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছি। কিন্তু এই আলোচনায় আমরা সমষ্টিগত অর্থনীতির কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করিনি। বর্তমান অধ্যায়ে আমরা সমষ্টিগত অর্থনীতির মৌল কতকগুলি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। যে-কোনো দেশের সমষ্টিগত অর্থনীতিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক বিষয় হল জাতীয় আয়। বর্তমান এককে আমরা জাতীয় আয়ের বিভিন্ন দিক, যেমন, জাতীয় আয়ের সংজ্ঞা ও পরিমাপ, জাতীয় আয় পরিমাপের অসুবিধা, ভারসাম্য জাতীয় আয়ু নির্ধারণ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। সমষ্টিগত অর্থনীতিতে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল

দামস্তর। এই দামস্তর নির্ধারণ, দামস্তরের বৃদ্ধি অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতি ও তার নিয়ন্ত্রণ কীভাবে করা যেতে পারে তা নিয়েও আলোকপাত করা হবে। এছাড়া, কোনো দেশের সমষ্টিগত অর্থনীতিতে ভোগ ব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যয়ের গুরুত্ব, বিনিয়োগ ব্যয় পরিবর্তনের প্রভাব এবং সর্বোপরি দেশের আয় ও নিয়োগ স্তরে বাণিজ্য চক্রজনিত ওঠানামা নিয়েও বর্তমান এককে বিশ্লেষণ করা হবে।

৮.৩ জাতীয় আয়ের সংজ্ঞা

কোনো দেশের জনসাধারণের উৎপাদনী কাজকর্ম করার ফলে ঐদেশে একটি নির্দিষ্ট আর্থিক বছরে যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকার্য উৎপন্ন হয় তার অর্থমূল্যের সমষ্টিকে জাতীয় আয় বলে। জাতীয় আয়কে তিন দিক থেকে দেখা যেতে পারে। (ক) জাতীয় আয়কে উৎপাদনের সমষ্টি বা জাতীয় উৎপাদন হিসাবে দেখা যেতে পারে। (খ) জাতীয় আয়কে সমস্ত দেশবাসীর আয়ের সমষ্টি হিসাবে ভাবা যেতে পারে। (গ) জাতীয় আয়কে দেশের জাতীয় উৎপাদনের উপর ব্যয়ের সমষ্টি হিসাবেও বিবেচনা করা যেতে পারে। জাতীয় উৎপাদন, জাতীয় আয় এবং জাতীয় ব্যয় এই তিনটি ধারণার মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই। এদের যে-কোনো একটি ধারণার দ্বারা কোনো দেশের জাতীয় আয় পরিমাপ করা যেতে পারে।

৮.৪ জাতীয় আয়ের বিভিন্ন ধারণা

১. স্থূল জাতীয় উৎপাদন ও নিট জাতীয় উৎপাদন (Gross National Product (GNP) and Net National Product or NNP) : কোনো দেশে একটি নির্দিষ্ট আর্থিক বছরে যে পরিমাণ দ্রব্য ও সেবাকার্য উৎপন্ন হয় তার মূল্যকেই বলে স্থূল জাতীয় উৎপাদন (GNP)। এর থেকে মূলধনের ক্ষয়ক্ষতি বা অবচয় (D বা depreciation) বাদ দিলে পাওয়া যায় নিট জাতীয় উৎপাদন (NNP) অর্থাৎ $NNP \equiv GNP - D$।

২. স্থূল জাতীয় আয় ও নিট জাতীয় আয় (Gross National Income or GNI and Net National Income or NNI) : কোনো দেশে উৎপাদনের কাজে অংশগ্রহণ করে সমস্ত ইউনিটগুলি এক বছরের মধ্যে যা আয় করে সেই আয়গুলির সমষ্টি হল স্থূল জাতীয় আয় (GNI)। এর থেকে মূলধনের ক্ষয়ক্ষতি বা অবচয় (D) বাদ দিলে পাই নিট জাতীয় আয় (NNI) অর্থাৎ $NNI \equiv GNI–D$। কোনো দেশের নিট জাতীয় আয় এবং নিট জাতীয় উৎপাদন সর্বদাই সমান অর্থাৎ $NNI \equiv NNP$।

৩. আর্থিক জাতীয় আয় ও প্রকৃত জাতীয় আয় (Money National Income and Real National Income) : কোনো বছরের উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীকে সেই বছরের দামস্তর দিয়ে গুণ করে যোগ করলে পাওয়া যায় বর্তমান মূল্যে জাতীয় আয় বা আর্থিক জাতীয় আয়। আর, কোনো বছরের

আর্থিক জাতীয় আয়কে সেই বছরের দামস্তর দিয়ে ভাগ করলে পাওয়া যায় ঐ বছরের প্রকৃত জাতীয় আয়।

৪. স্থূল অন্তর্দেশীয় উৎপাদন ও নিট অন্তর্দেশীয় উৎপাদন (Gross Domestic Product বা GDP এবং Net Domestic Product বা NDP) : কোনো নির্দিষ্ট আর্থিক বছরে কোনো দেশের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে যে সমস্ত শেষ (final) উৎপন্ন দ্রব্য ও সেবাকার্য উৎপন্ন হয় তাদের অর্থমূল্যের সমষ্টিকে বলে স্থূল অন্তর্দেশীয় উৎপাদন (GDP)। এর থেকে মূলধনের ক্ষয়ক্ষতি বা অবচয় (D) বাদ দিলে পাওয়া যায় নিট অন্তর্দেশীয় উৎপাদন (NDP) অর্থাৎ NDP ≡ GDP – D।

৫. স্থূল অন্তর্দেশীয় উৎপাদন ও স্থূল জাতীয় উৎপাদন (Gross Domestic Product or GDP and Gross National Product or GNP) : কোনো দেশের স্থূল অন্তর্দেশীয় উৎপাদনের (GDP) সঙ্গে বিদেশ থেকে প্রাপ্ত নিট আয় যোগ করলে পাওয়া যায় স্থূল জাতীয় উৎপাদন (GNP) অর্থাৎ, GNP ≡ GDP + বিদেশে থেকে প্রাপ্ত নিট আয়।

৬. মাথাপিছু আয় (Per Capita Income) : কোনো দেশের জাতীয় আয়ের অঙ্ককে সেই দেশের জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে পাওয়া যায় মাথাপিছু আয়। অর্থাৎ মাথাপিছু আয় = জাতীয় আয় / বছরের মধ্যবিন্দুতে জনসংখ্যা।

৮.৫ জাতীয় আয়ের পরিমাপ

জাতীয় আয় পরিমাপ করার তিনটি পদ্ধতি আছে। সেগুলি হল, (ক) উৎপাদন সুমারি পদ্ধতি, (খ) আয় শুমারি পদ্ধতি এবং (গ) ব্যয় শুমারি পদ্ধতি। আমরা এই তিনটি পদ্ধতি সংক্ষেপে আলোচনা করব।

(ক) উৎপাদন শুমারি পদ্ধতি (Census of Production Method) : এই পদ্ধতিতে কোনো নির্দিষ্ট বছরে উৎপাদিত শেষ উৎপন্ন দ্রব্য ও সেবাকার্যের অর্থমূল্য যোগ করা হয়। তাই একে শেষ উৎপন্ন সমষ্টি বা শেষ উৎপন্ন পদ্ধতি (Final Products Total বা Final Product Method) বলা হয়। এভাবে পাওয়া যায় স্থূল জাতীয় উৎপাদন। এর থেকে মূলধনের ক্ষয়ক্ষতি বা অবচয় বাদ দিলে পাওয়া যায় নিট জাতীয় উৎপাদন। এখন, এই নিট জাতীয় উৎপাদন পেতে আমাদের শেষ উৎপন্নের পরিমাণগুলিকে বাজার দাম দিয়ে গুণ করতে হয়। আমরা জানি, বাজার দাম = উৎপাদন ব্যয় + পরোক্ষ কর – ভরতুকি। সুতরাং, নিট জাতীয় উৎপাদন থেকে পরোক্ষ কর বাদ দিলে এবং ভরতুকি যোগ করলে পাওয়া যাবে উপাদান ব্যয়ে জাতীয় আয় (National income at factor cost)। প্রকৃত পক্ষে, এটিই হল জাতীয় আয়ের পরিমাপ।

উৎপাদন পদ্ধতিতে জাতীয় আয় পরিমাপ করতে হলে কয়েকটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে। (i) কেবলমাত্র শেষ (final) উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্যই জাতীয় অয়ের হিসাবে ধরতে হবে। (ii) মূলধনের ক্ষয়ক্ষতি বা অবচয় বাদ দিতে হবে। (iii) প্রতিরক্ষার জন্য প্রস্তুত দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন ব্যয় যোগ করতে হবে। (iv) আন্তর্জাতিক বাণিজ্য থেকে নিট আয় যোগ করতে হবে।

(খ) আয় শুমারি পদ্ধতি (Census of Income Method) : এই পদ্ধতিতে কোনো নির্দিষ্ট বছরে দেশের সমস্ত উপার্জনকারী ইউনিটের আয় যোগ করে পাওয়া যায় স্থূল জাতীয় আয়। এখন, কোনো উপার্জনকারীর আয়ের মধ্যে থাকে খাজনা, মজুরি, সুদ অথবা মুনাফা। সুতরাং, স্থূল জাতীয় আয় = মোট খাজনা + মোট মজুরি + মোট সুদ + মোট মুনাফা = উপাদানের পাওয়া সমষ্টি। এর থেকে মূলধনের ক্ষয়ক্ষতি বা অবচয় বাদ দিলে পাওয়া যায় নিট জাতীয় আয়।

আয় শুমারি পদ্ধতিতে জাতীয় আয় পরিমাপ করতে হলে কয়েকটি বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। (i) হস্তান্তর প্রদান (transfer payments) যেমন, পেনশন, বেকার ভাতা, কাউকে অনুদান বা সাহায্য ইত্যাদি হিসাব থেকে বাদ যাবে। (ii) মূলধনী লাভ জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে না। (iii) উৎপাদকের নিজস্ব যে সমস্ত উপাদান উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে সেগুলির বাজার দামে পাওনা যোগ করতে হবে। (iv) যে সমস্ত কাজের বাজার মূল্য নির্ধারণ করা যায় না (যেমন, মায়ের সন্তানপালন) সেগুলি জাতীয় আয়ের হিসাবে ধরা হবে না। (v) বেআইনি কাজকর্ম থেকে আয় জাতীয় আয়ের অংশ বলে গণ্য হবে না। (vi) কোনো পরিসম্পদ বিক্রির অর্থমূল্য জাতীয় আয়ের হিসাবে ধরা হবে না। (vii) যৌথ মূলধনি প্রতিষ্ঠানের অবণ্টিত মুনাফা জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে।

(গ) ব্যয় শুমারি পদ্ধতি (Census of Expenditure Method) : জাতীয় আয়কে দেশের জাতীয় উৎপাদনের উপর ব্যয় হিসাবে দেখা যেতে পারে। সুতরাং, জাতীয় আয় ≡ জাতীয় ব্যয়। যদি দেশে শুধু ভোগকারী ও বিনিয়োগকারী (ফার্ম) থাকে, তাহলে স্থূল জাতীয় ব্যয় ≡ স্থূল জাতীয় আয় ≡ মোট ভোগ ব্যয় (C) + মোট বিনিয়োগ ব্যয় (I) $\equiv C + I$। যদি দেশে সরকারি ব্যয় (G) থাকে, তাহলে স্থূল জাতীয় ব্যয় = স্থূল জাতীয় আয় $\equiv C + I + G$। উন্মুক্ত অর্থনীতির ক্ষেত্রে রপ্তানির মূল্য (×) যোগ করতে হবে এবং আমদানি বাদ দিতে হবে। সেক্ষেত্রে স্থূল জাতীয় আয় $\equiv C + I + G + X - M$। সব ক্ষেত্রেই মূলধনের ক্ষয়ক্ষতি বা অবচয় বাদ দিলে নিট জাতীয় আয় পাওয়া যাবে।

৮.৫.১. মূল্য সংযোজিত পদ্ধতি

উৎপাদন শুমারি পদ্ধতিতে জাতীয় আয় পরিমাপ করার সময় আমাদের একটি নির্দিষ্ট বছরে শেষ উৎপন্নগুলিকে (Final Products) যোগ করতে হয়। এক্ষেত্রে অন্তর্বর্তী দ্রব্যগুলিকে (intermediate products) ধরলে একই দ্রব্যের একাধিকবার গণনার সমস্যা তৈরি হবে। যেমন, তুলোর মূল্য ধরার পর

সেই তুলো থেকে তৈরি সুতোর মূল্য ধরলে তুলোর মূল্য দু'বার ধরা হয়ে যাবে। আবার, সুতো থেকে তৈরি কাপড়ের মূল্য ধরলে তুলোর মূল্য তিনবার বা সুতোর মূল্য দু'বার ধরা হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে শেষ উৎপন্ন হিসাবে কাপড়ের মূল্যই কেবলমাত্র ধরতে হবে। তবেই একাধিকবার গণনা এড়ানো যাবে। একাধিকবার গণনার সমস্যা এড়াবার আর একটি পদ্ধতি আছে। তাকে বলা হয় মূল্য সংযোজিত পদ্ধতি। **যে পদ্ধতিতে প্রাথমিক কাঁচামাল যখন উৎপাদনের বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে পার হয়, তখন প্রতিটি স্তরে সংযোজিত মূল্য প্রাথমিক মূল্যের সঙ্গে যোগ করে শেষ উৎপন্ন মূল্য নির্ণয় করা হয়, তাকে মূল্য সংযোজিত পদ্ধতি (Value Added Method) বলে।** একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

মনে করি, 5,000 টাকার তুলো সুতোয় পরিণত হলে এর মূল্য দাঁড়ায় 7,000 টাকা। ঐ সুতোর সবটা দিয়ে কাপড় তৈরি করলে তার মূল্য দাঁড়ায় 13,000 টাকা। শেষ উৎপন্ন পদ্ধতিতে আমরা কেবল এই কাপড়ের মূল্য হিসাবের মধ্যে ধরবো। সুতরাং, স্থূল জাতীয় উৎপাদন হল 13,000 টাকা। বিকল্পভাবে, মূল্য সংযোজিত পদ্ধতিতে দেখলে, তুলোর প্রাথমিক মূল্য 5,000 টাকা। সুতো উৎপাদনে মূল্য সংযোজিত হয়েছে 2,000 টাকা। কাপড় উৎপাদনে মূল্য সংযোজিত হয়েছে 6,000 টাকা। তাহলে মোট মূল্য = প্রাথমিক মূল্য + সংযোজিত মূল্য = 5000 টাকা + (2,000 + 6,000) টাকা = (5,000 + 8,000) টাকা = 13,000 টাকা। এটি শেষ উৎপন্ন দ্রব্য বা কাপড়ের মূল্যের সমান। তাহলে শেষ উৎপন্ন পদ্ধতি এবং মূল্য সংযোজিত পদ্ধতিতে একই ফল পাওয়া যাচ্ছে। এই বিকল্প পদ্ধতিটির কথা বলেছেন অধ্যাপক স্যামুয়েলসন।

৮.৫.২. আয়ের বৃত্তাকার প্রবাহ

যে-কোনো অর্থনীতিতে সর্বদা একদিকে দ্রব্যের প্রবাহ এবং তার বিপরীত দিকে অর্থের প্রবাহ চলে। একেই আয়ের বৃত্তস্রোত বা আয়ের বৃত্তাকার প্রবাহ বলে। এই আয়ের বৃত্তস্রোতের দ্বারা জাতীয় আয়ের ধারণা দেখানো যেতে পারে। মনে করি, কোনো দেশে দুটি শ্রেণি রয়েছে : পরিবার ও ফার্ম। পরিবারগুলি ফার্মকে উপাদান সেবা জোগান দিচ্ছে। আমাদের ৮.১ নং চিত্রে এটি ১নং প্রবাহ। এগুলির সাহায্যে ফার্ম উৎপাদন করছে। সেগুলিই আবার পরিবারগুলির কাছে ফিরে আসছে। এটি উৎপন্ন সামগ্রীর প্রবাহ (২নং প্রবাহ)। এদের যে-কোনো একটিকে প্রকৃত জাতীয় আয় বলে গণ্য করা যেতে পারে কেননা এগুলি দ্রব্য বা সেবাকার্যের প্রবাহ।

আবার, পরিবারগুলি তাদের উপাদান সেবার বিনিময়ে খাজনা, মজুরি, সুদ ও মুনাফা পাচ্ছে। এটা উপাদান আয়ের প্রবাহ (৩নং প্রবাহ)। পরিবারগুলি এই আয়ের দ্বারাই ফার্মের কাছ থেকে দ্রব্য ও সেবাকার্য কেনে (৪ নং প্রবাহ)। এই দুটিকেই আমরা জাতীয় আয় বলে গণ্য করে থাকি কেননা জাতীয় আয়কে দ্রব্যের অঙ্কে প্রকাশ না করে সাধারণত টাকার অঙ্কেই প্রকাশ করা হয়।

চিত্র ৮.১

৮.৬ জাতীয় আয় পরিমাপের সমস্যাবলি

জাতীয় আয় পরিমাপের নানা সমস্যা আছে। প্রধান কয়েকটি সমস্যা নিম্নরূপ :

(i) ধারণাগত অসুবিধা (Conceptual difficulties) : জাতীয় আয় পরিমাপ করতে হলে কোন্ কোন্ দ্রব্যকে শেষ উৎপন্ন বলে ধরা হবে, আর কোন্ কোন্ দ্রব্যকে অন্তর্বর্তী দ্রব্য বলে ধরা হবে, তার কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। এসব ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশে নিজ নিজ প্রথা (Convention) অনুসরণ করা হয়।

(ii) বাজার-বহির্ভূত দ্রব্যের সমস্যা (Problem of non-marketed goods) : প্রতিরক্ষার সাজসরঞ্জাম, সরকারি প্রশাসন, সরকার প্রদত্ত বিনামূল্যে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিসেবা, উৎপাদকের নিজের ভোগের জন্য রেখে দেওয়া উৎপাদনের অংশ ইত্যাদির মূল্যায়নের নানা সমস্যা আছে। এগুলির কোনো সাধারণ বাজার নেই। তাই এদের মূল্য জানা যায় না। তাছাড়া, এগুলি জাতীয় আয়ের হিসাবের মধ্যে ধরা হবে কি না সে সম্পর্কে মতভেদ আছে।

(iii) একাধিকবার গণনার সমস্যা (Problem of multiple counting) : জাতীয় আয় পরিমাপের সময় কোনো দ্রব্যের মূল্য যাতে একাধিকবার ধরা না হয় তার জন্য শেষ উৎপন্ন পদ্ধতি অথবা মূল্য সংযোজিত পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়। বাস্তবে এই সমস্যা এড়ানো বেশ জটিল ব্যাপার।

(iv) হস্তান্তর পাওনার সমস্যা (Problem of transfer payment) : জাতীয় আয়ের হিসাবের সময় হস্তান্তর পাওনা বাদ দিতে হয়। অনেক সময় এই পাওনার সবটাই হস্তান্তর পাওনা কিনা তা স্পষ্ট নয়।

(v) আয় তথ্য (Income data) : আয় কর এড়ানোর জন্য অনেকে আয়ের সঠিক তথ্য দেয় না। ফলে জাতীয় আয়ের সঠিক হিসাব পাওয়া যায় না।

(vi) পরিসংখ্যানের ত্রুটি (Defects in statistics) : সঠিক ও নির্ভরযোগ্য তথ্যের অভাবে জাতীয় আয়ের সঠিক হিসাব অনেক সময়ই পাওয়া যায় না।

৮.৭ ভোগ অপেক্ষক ও সঞ্চয় অপেক্ষক

ভোগ অপেক্ষক : ভোগ ব্যয় ও ভোগ ব্যয় নির্ধারণকারী বিষয়সমূহের মধ্যে গাণিতিক সম্পর্ককে ভোগ অপেক্ষক বলে। কেইনস্-এর মতে, কোনো দেশের ভোগ ব্যয় সেই দেশের আয়ের স্তরের উপর নির্ভর করে। কেইন্সীয় ভোগ অপেক্ষকের চারটি বৈশিষ্ট্য আছে :

(i) কোনো দেশের মোট ভোগ ব্যয় (C) সেই দেশের আয়ের স্তরের (Y) উপর নির্ভর করে অর্থাৎ $C = C(Y)$ অর্থাৎ C হল Y-এর অপেক্ষক।

(ii) প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা (Marginal Propensity to Consume বা MPC) হল বর্ধিত ভোগ ব্যয় (ΔC) এবং বর্ধিত আয়ের (ΔY) অনুপাত, অর্থাৎ $MPC = \frac{\Delta C}{\Delta Y}$। কেইনস্-এর মতে, প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা ধনাত্মক কিন্তু এক অপেক্ষা কম অর্থাৎ $0 < \frac{\Delta C}{\Delta Y} < 1$। এর অর্থ হল, আয় (Y) বাড়লে ভোগ ব্যয় (C) বাড়ে কিন্তু আয় যতটা বাড়ে, ভোগ ব্যয় ততটা বাড়ে না। একে কেইনস্ বলেছেন মৌলিক মনস্তাত্ত্বিক নিয়ম (Fundamental Psychological Law)।

(iii) গড় ভোগ প্রবণতা (Average Propensity to Consume বা APC) হল মোট ভোগ ব্যয় (C) এবং মোট আয়ের (Y) অনুপাত। অর্থাৎ $APC = \frac{C}{Y}$। কেইনস্-এর মতে, আয় বাড়লে $\frac{C}{Y}$ কমবে এবং আয় কমলে $\frac{C}{Y}$ বাড়বে।

(iv) আয় বাড়লে MPC স্থির থাকে অথবা কমে।

এই বৈশিষ্ট্যগুলির ভিত্তিতে আমরা ভোগ অপেক্ষক আঁকতে পারি। যদি $MPC\left(=\frac{\Delta C}{\Delta Y}\right)$ বা ভোগ ব্যয় রেখার ঢাল স্থির থাকে বলে ধরা হয়, তাহলে ভোগ অপেক্ষকটি আমাদের ৮.২ নং চিত্রের ন্যায় হবে। অর্থাৎ এটি উর্ধ্বমুখী সরলরেখা হবে কিন্তু 45° রেখা অপেক্ষা চেটালো হবে। এর একটি ধনাত্মক উল্লম্ব ছেদাংশ থাকবে। চিত্রে দেখা যাচ্ছে $C = C(Y)$ রেখার ঢাল ধনাত্মক কিন্তু 45° রেখার ঢাল অপেক্ষা কম অর্থাৎ $0 < \frac{\Delta C}{\Delta Y} < 1$। আবার, আয় বাড়লে $\frac{C}{Y}$ কমছে এবং যে-কোনো আয়ের স্তরে $\frac{C}{Y} > \frac{\Delta C}{\Delta Y}$ অর্থাৎ $APC > MPC$ বা $MPC < APC$।

সঞ্চয় অপেক্ষক (Saving function)

মোট সঞ্চয় = মোট আয়—মোট ভোগ ব্যয় অর্থাৎ $S \equiv Y - C$। এখন, C যদি Y এর উপর নির্ভর করে, তাহলে S ও Y-এর উপর নির্ভর করবে। সঞ্চয় অপেক্ষকের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে—

(i) কেইন্‌স্‌-এর মতে, কোনো দেশের সঞ্চয় (S) আয়ের স্তরের উপর নির্ভর করে অর্থাৎ $S = S(Y)$। এটিই হল কেইন্‌সীয় সঞ্চয় অপেক্ষক।

(ii) প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতা (Marginal Propensity to Save বা MPS) হল বর্ধিত সঞ্চয় ও বর্ধিত আয়ের অনুপাত অর্থাৎ $MPS = \frac{\Delta S}{\Delta Y}$ ।

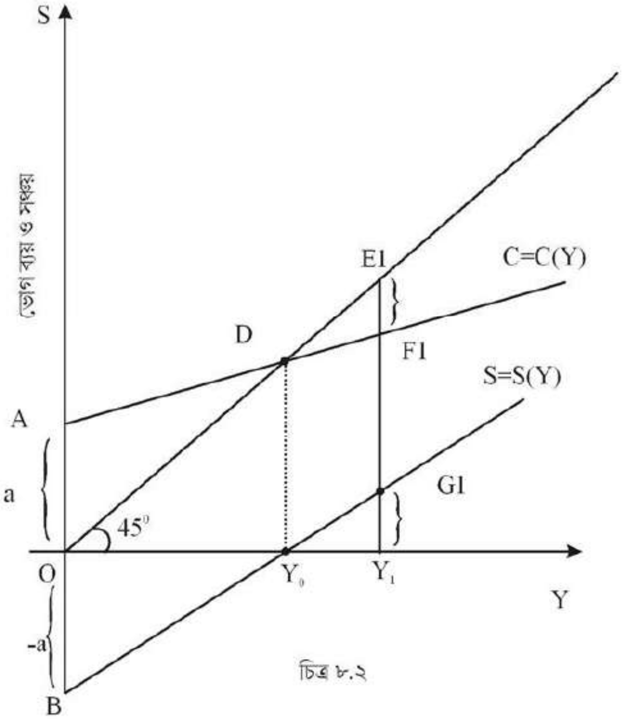

চিত্র ৮.২

(iii) গড় সঞ্চয় প্রবণতা (Average Propensity to Save বা APS) হল মোট সঞ্চয় ও মোট আয়ের অনুপাত। অর্থাৎ $APS = \frac{S}{Y}$ । কেইন্‌স্‌-এর মতে, আয় (Y) বাড়লে APS বা $\frac{S}{Y}$ বাড়ে এবং আয় কমলে APS কমে।

(iii) আয় বাড়লে $MPS\left(=\frac{\Delta S}{\Delta Y}\right)$ একই থাকে অথবা বাড়ে। আমরা ধরে নিচ্ছি যে, MPS স্থির থাকে।

এখন, $S \equiv Y - C$। অতএব, C অপেক্ষক দেওয়া থাকলে S-এর এই সংজ্ঞা থেকে আমরা S অপেক্ষক আঁকতে পারি। আমরা ৮.২ নং চিত্রে একটি সরলরৈখিক ভোগ অপেক্ষক $C = C(Y)$ এঁকেছি। যখন আয় শূন্য, তখন $C = a$। $S = Y - C = -a$। মনে করি চিত্রে $OB = -a$। আবার, যখন আয় $(Y) = OY_0$, তখন $C = DY_0 = OY_0$. $\therefore S = DY_0 - OY_0 = 0$। যখন আয় $= OY_1$, $C = F_1Y_1$ $\therefore S = OY_1 - F_1Y_1 = E_1Y_1 - F_1Y_1 = E_1F_1$। মনে করি, $G_1Y_1 = E_1F_1$। সুতরাং, B, Y_0, G_1 প্রভৃতি বিন্দুগুলি যোগ করে আমরা সঞ্চয় অপেক্ষক $S = S(Y)$ পাই। ভোগ (C) অপেক্ষক সরলরৈখিক হলে S অপেক্ষকও সরলরৈখিক হবে। C অপেক্ষকের যে পরিমাণ উল্লম্ব ধনাত্মক ছেদাংশ থাকবে, S অপেক্ষকের সম পরিমাণ ঋণাত্মক উল্লম্ব ছেদাংশ থাকবে।

আমরা ভোগ প্রবণতা ও সঞ্চয় প্রবণতার মধ্যে দুটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক পেতে পারি। (ক) আমরা জানি, $C + S \equiv Y \;\therefore \frac{C}{Y} + \frac{S}{Y} = 1$ বা, APC + APS ≡ 1 অর্থাৎ গড় ভোগ প্রবণতা + গড় সঞ্চয় প্রবণতা ≡ 1

$\therefore$ APC ≡ 1 – APS এবং APS ≡ 1 – APC, (খ) আবার, $C + S \equiv Y$

$\therefore \Delta C + \Delta S = \Delta Y$ বা, $\frac{\Delta C}{\Delta Y} + \frac{\Delta S}{\Delta Y} \equiv 1$ বা, MPC + MPS ≡ 1 অর্থাৎ প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা + প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতা = 1।

$\therefore$ MPC ≡ 1 – MPS এবং MPS ≡ 1 – MPC। সুতরাং, একটি গড় প্রবণতার মান জানা থাকলে আমরা অপর গড় প্রবণতার মান জানতে পারি। তেমনি, একটি প্রান্তিক প্রবণতার মান জানা থাকলে আমরা অপর প্রান্তিক প্রবণতার মান জানতে পারি।

৮.৮ ভোগ ব্যয় নির্ধারণকারী বিষয়সমূহ

কেইনস্-এর মতে, কোনো দেশের ভোগ ব্যয় প্রধানত সেই দেশের আয়ের স্তরের উপর নির্ভর করে। তবে আয় ছাড়া অন্যান্য কতকগুলি বিষয়ের দ্বারাও ভোগ ব্যয় প্রভাবিত হয়। এই বিষয়গুলিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় : (ক) বস্তুগত বিষয়, (খ) মনোগত বিষয় ও (গ) কাঠামোগত বিষয়।

বস্তুগত বিষয় (Objective factors) : যে সমস্ত বিষয় পরিমাপ করা যায় এবং সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করা যায়, তাদের বস্তুগত বিষয় বলে। নিম্নলিখিত বস্তুগত বিষয়গুলি ভোগ ব্যয়কে প্রভাবিত করে।

(i) তরল সম্পত্তি : অধ্যাপক পিগু-র মতে, কোনো দেশের ভোগ ব্যয় ঐ দেশের তরল সম্পত্তির পরিমাণের উপর নির্ভর করে। তরল সম্পত্তি যত বেশি হবে, ভোগ ব্যয়ও তত বেশি হবে। একে বলা হয় পিগু প্রভাব বা সম্পদ প্রভাব (Wealth effect)।

(ii) সুদের হার : প্রাচীন ধনবিজ্ঞানীদের মতে, সুদের হার বাড়লে সঞ্চয় বাড়বে ও ভোগ ব্যয় কমবে। তেমনি, সুদের হার কমলে ভোগ ব্যয় বাড়বে।

(iii) ঋণের শর্তাবলি : ভোগ দ্রব্য ক্রয়ের জন্য গৃহীত ঋণের শর্তাবলির উপরেও ভোগ ব্যয় নির্ভর করে। ঋণের শর্ত যত সহজ হবে, ভোগ ব্যয় তত বেশি হবে। বিপরীত ক্ষেত্রে, ঋণের শর্ত যত কঠোর হবে, ভোগ ব্যয় তত কম হবে।

(iv) বিজ্ঞাপন ব্যয় : বিজ্ঞাপন ব্যয়ের উপরও ভোগ ব্যয় নির্ভর করে। বিভিন্ন কোম্পানির ভোগ্য দ্রব্যের উপর বিজ্ঞাপন ব্যয় যত বেশি হবে, ভোগ ব্যয় তত বেশি হবে।

(খ) মনোগত বিষয় (Subjective factors) : যে সমস্ত বিষয় মানুষের পছন্দ, ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদির উপর নির্ভর করে এবং যেগুলি সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ বা পরিমাপ করা যায় না তাকে মনোগত বিষয় বলে। নিম্নলিখিত মনোগত বিষয়গুলি কোনো দেশের ভোগ ব্যয়কে প্রভাবিত করে।

(i) জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি : লোকে যদি ভবিষ্যতে উচ্চ জীবনযাত্রার মান বজায় রাখতে চায় তাহলে বর্তমান ভোগ ব্যয় কম হবে এবং সঞ্চয় বেশি হবে। বিপরীত ক্ষেত্রে, ভোগ ব্যয় বেশি এবং সঞ্চয় কম হবে।

(ii) আয় বা দাম সম্পর্কে প্রত্যাশা : ভবিষ্যতে আয় বাড়বে এরূপ প্রত্যাশা বা দাম বাড়বে এরূপ আশঙ্কা থাকলে বর্তমান ভোগ ব্যয় বেশি হবে এবং সঞ্চয় কম হবে। বিপরীত ক্ষেত্রে, বর্তমান ভোগ ব্যয় কম ও সঞ্চয় বেশি হবে।

(iii) প্রদর্শন প্রভাব : ডুয়েসেনবেরি-র মতে, কোনো ব্যক্তির ভোগ ব্যয় তার প্রতিবেশীর ভোগের মান ও ধরনের উপর নির্ভর করে। প্রতিবেশীর ভোগ ব্যয় বাড়লে ঐ বিশেষ ব্যক্তিটির ভোগ ব্যয় বাড়বে।

(গ) কাঠামোগত বিষয় : যে সমস্ত বিষয় দেশের সামগ্রিক কোনো বিষয়ের সঙ্গে জড়িত, তাদের কাঠামোগত বিষয় বলে। নিম্নলিখিত কাঠামোগত বিষয়গুলি কোনো দেশের ভোগ ব্যয়কে প্রভাবিত করে।

(i) আয়ের বণ্টন : আয়ের বণ্টন যত সুষম হবে, ভোগ ব্যয়ও তত বেশি হবে, কারণ গরীবের ভোগ প্রবণতা ধনীর ভোগ প্রবণতা অপেক্ষা বেশি।

(ii) জনসংখ্যা : জনসংখ্যা বাড়লে ভোগ ব্যয় বাড়বে এবং জনসংখ্যা কমলে ভোগ ব্যয় কমবে।

(iii) জনসংখ্যার বয়সের বণ্টন : জনসংখ্যার বয়সের বণ্টনের উপরও ভোগ ব্যয় নির্ভর করে। যেমন, শিশুদের সংখ্যা তুলনায় বেশি হলে বেবিফুডের চাহিদা বাড়বে। তেমনি, বৃদ্ধদের সংখ্যা তুলনায় বেশি হলে ছাতা ও লাঠির চাহিদা এবং বিশেষ ধরনের কিছু ওষুধের চাহিদা বেশি হবে।

(iv) যৌথ মূলধনি প্রতিষ্ঠানের আর্থিক নীতি : যদি যৌথ মূলধনি প্রতিষ্ঠানগুলি লাভের বড় অংশ

শেয়ার হোল্ডারদের মধ্যে বণ্টন করে, তাহলে ভোগ ব্যয় বাড়বে। বিপরীত ক্ষেত্রে, ভোগ ব্যয় কমবে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, কোনো দেশের ভোগ ব্যয় আয় স্তর ছাড়াও অনেক বিষয়ের উপর নির্ভর করে। স্বল্পকালে আয় ছাড়া অন্যান্য বিষয়গুলিকে অপরিবর্তিত ধরলে আমরা বলতে পারি যে, কোনো দেশের ভোগ ব্যয় মূলত সেই দেশের আয়ের স্তরের উপর নির্ভর করে। দীর্ঘকালে এই অন্যান্য বিষয়গুলি পরিবর্তিত হতে পারে। সেক্ষেত্রে সমগ্র ভোগ ব্যয় রেখা উপরের দিকে বা নীচের দিকে সরে যাবে।

৮.৯ স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ ও উদ্ভূত বিনিয়োগ

মোট উৎপাদনের যে অংশ ভোগ কার্যে ব্যয়িত না হয়ে পুনরায় উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয়, তাকে বিনিয়োগ বলে। বিনিয়োগের ফলে দেশের মূলধনের পরিমাণ বাড়ে। সেজন্য বিনিয়োগকে দেশের মূলধন ভাণ্ডারের সঙ্গে নিট সংযোজন বলা হয়। বিনিয়োগ কোন্ বিষয়ের উপর নির্ভর করে, সেই অনুযায়ী বিনিয়োগকে দু'ভাগে ভাগ করা হয় : স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ ও উদ্ভূত বিনিয়োগ। স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ হল সেই বিনিয়োগ যা বাইরের কতকগুলি বিষয়ের দ্বারা নির্ধারিত হয়। ইহা দেশের আয়স্তরের উপর নির্ভর করে না। সুতরাং আয়স্তরের বিপরীতে স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ রেখা একটি অনুভূমিক সরলরেখা হবে (চিত্র ৮.৩)। এক্ষেত্রে আয়স্তর যা-ই হোক না কেন, বিনিয়োগের মান I_0 স্তরে স্থির থাকছে। অন্যদিকে, যে বিনিয়োগ আয়স্তরের উপর নির্ভর করে তাকে উদ্ভূত বিনিয়োগ বলে। আয় বাড়লে বিনিয়োগের স্তর বাড়ে। সুতরাং এক্ষেত্রে বিনিয়োগ রেখা ৮.৪ নং চিত্রের ন্যায় ঊর্ধ্বমুখী হবে। চিত্রে দেখা যাচ্ছে যে, আয়স্তর Y_0 থেকে বেড়ে Y_1 হলে বিনিয়োগের স্তরও I_0 থেকে বেড়ে I_1 হয়।

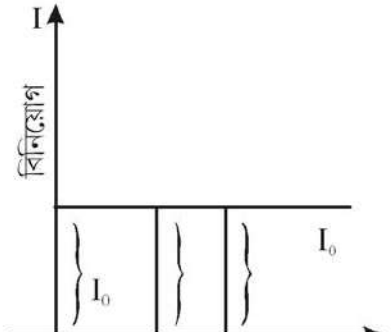

(উদ্ভূত বিনিয়োগ)

চিত্র ৮.৩

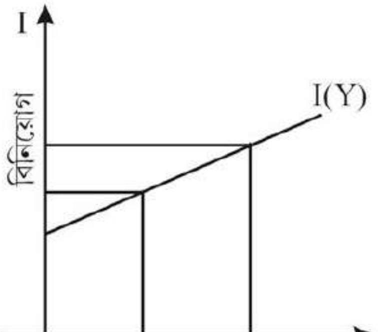

(উদ্ভূত বিনিয়োগ)

চিত্র ৮.৪

৮.১০ ভোগ ও বিনিয়োগ ব্যয় দ্বারা ভারসাম্য আয় নির্ধারণ

আমরা কেইন্‌স্-এর সরল মডেলে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ধারণ করব। এই মডেলে আমরা কয়েকটি অনুমান করে নিচ্ছি।

(i) অর্থনীতিটি একটি উন্নত ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি। এটিতে মন্দা চলছে, তাই প্রচুর অব্যবহৃত উৎপাদন ক্ষমতা রয়েছে। এখানে দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বাড়লে জোগান বাড়বে।

(ii) অর্থনীতিতে দুটি শ্রেণি আছে : পরিবার ও ফার্ম।

(iii) পরিবারের ভোগব্যয় (C) আয়ের স্তরের (Y) উপর নির্ভর করে, অর্থাৎ C = C(Y) যেখানে $0 < \frac{\Delta C}{\Delta Y} < 1$.

(iv) ফার্মের বিনিয়োগ ব্যয় স্বয়ম্ভূত অর্থাৎ $I = I_0$ = ধ্রুবক।

(v) অর্থনীতিটি বদ্ধ অর্থনীতি অর্থাৎ কোনো বৈদেশিক লেনদেন নেই।

(vi) সরকারের কোনো অর্থনৈতিক কার্যকলাপ নেই।

(vii) দামস্তর, সুদের হার, মজুরির হার প্রভৃতি অপরিবর্তিত রয়েছে।

এখন, ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ধারিত হবে যেখানে দেশের মোট চাহিদা ও মোট জোগান পরস্পর সমান হবে। আমাদের মডেলে মোট চাহিদা = ভোগ ব্যয় + বিনিয়োগ ব্যয় = C + I, এবং মোট জোগান = জাতীয় আয় = Y তাহলে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ধারণের শর্ত হল : Y = C + I। একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। মনে করি, আমাদের সরলরৈখিক ভোগ অপেক্ষকের সমীকরণ হল : $C = 600 + \frac{4}{5}Y$ এবং স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ ব্যয়, I = 400. তাহলে ভারসাম্যের শর্ত থেকে লিখতে পারি, Y = C + I, বা, $Y = 600 + \frac{4}{5}Y + 400$ বা, $Y\left(1-\frac{4}{5}\right) = 600 + 400$ $\therefore Y = \frac{600+400}{1-4/5} = \frac{1,000}{1/5} = 5 \times 1,000 =$ 5,000. অতএব, ভারসাম্য জাতীয় আয় = 5,000. উদাহরণটিকে সাধারণ আকারেও লেখা যেতে পারে। মনে করি, C = a + bY যেখানে a ও b ধ্রুবক এবং 0 < b < 1. মনে করি, I = A। সুতরাং Y = C + I এই শর্তে বসিয়ে পাই, $Y = a + bY + A \therefore Y(1 - b) = a + A$ বা, $Y = \frac{a+A}{1-b}$. এটিই হল আমাদের ভারসাম্য আয়স্তর।

আমরা রেখাচিত্রের সাহায্যেও ভারসাম্য আয়স্তর নির্ধারণ করতে পারি। ৮.৫ নং চিত্রে অনুভূমিক অক্ষে আয়স্তর (Y) এবং উল্লম্ব অক্ষে ভোগ ব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যয় পরিমাপ করছি। আমাদের চিত্রে C(Y) রেখাটি ভোগ ব্যয় রেখা এবং I_0 রেখাটি বিনিয়োগ ব্যয় রেখা। বিনিয়োগ স্বয়ম্ভূত বলে I_0 রেখাটি অনুভূমিক সরলরেখা। C + I কে উল্লম্বভাবে যোগ করে C + I রেখা পেয়েছি। এখন, কোন্ বিন্দুতে Y = C + I এই ভারসাম্য শর্ত পূরণ হচ্ছে তা দেখার জন্য আমরা একটি 45° লাইন টেনেছি। আমাদের C

+ I রেখা এই 45° রেখাকে E বিন্দুতে ছেদ করেছে। তখন $Y = OY_0$ এবং $C + I = EY_0$। কিন্তু E যেহেতু 45° রেখার উপর একটি বিন্দু, ঐ বিন্দুতে $OY_0 = EY_0$ অর্থাৎ $Y = C + I$ বা মোট জোগান = মোট চাহিদা। সুতরাং, E বিন্দু হল ভারসাম্য বিন্দু এবং OY_0 হল ভারসাম্য আয়স্তর। এভাবে C + I রেখা ও 45° রেখার ছেদবিন্দুতে ভারসাম্য আয়স্তর নির্ধারিত হয়। E বিন্দুকে বলা হয় কেইন্‌সীয় ছেদ বিন্দু (Keynesian cross)। এই ভারসাম্যটি স্থায়ী বা স্থিতিশীল (stable) হবে যদি C + I রেখা 45° রেখাকে উপর থেকে ছেদ করে অর্থাৎ C + I রেখা যেন 45° রেখা অপেক্ষা চেটালো হয়। আমাদের চিত্রে এই শর্তটা পূরণ হয়েছে। সুতরাং ভারসাম্য বিন্দু E হল স্থায়ী বা স্থিতিশীল ভারসাম্য অবস্থা। এর অর্থ হল, কোনো কারণে ভারসাম্য থেকে বিচ্যুতি ঘটলে অর্থনৈতিক শক্তি আমাদের পুনরায় ভারসাম্য অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে আসবে।

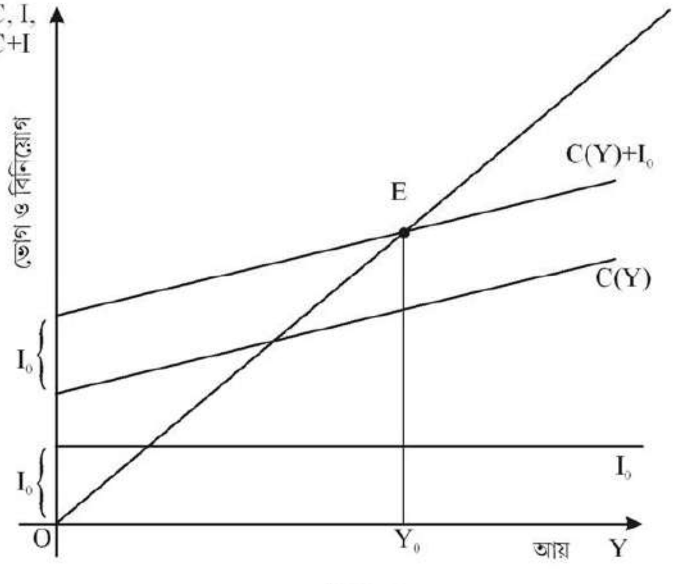

চিত্র ৮.৫

৮.১০.১. সঞ্চয় ও বিনিয়োগ ব্যয় দ্বারা ভারসাম্য আয় নির্ধারণ

কেইন্‌স্‌-এর সরল মডেলে আমরা সঞ্চয় ও বিনিয়োগ রেখার দ্বারাও ভারসাম্য আয়স্তর নির্ধারণ করতে পারি। আমরা জানি, যে বিন্দুতে মোট জোগান ও মোট চাহিদা পরস্পর সমান হয়, সেই বিন্দুতে ভারসাম্য আয়স্তর নির্ধারিত হয়। আমাদের মডেলে মোট জোগান = মোট আয় = Y এবং মোট চাহিদা = মোট ভোগ ব্যয় + মোট বিনিয়োগ ব্যয় = C + I. সুতরাং, ভারসাম্য বিন্দুতে, $Y = C + I$। এই শর্ত থেকে পাই, $Y - C = I$, বা, $S = I$. সুতরাং, যে বিন্দুতে পরিবারগুলির পরিকল্পিত সঞ্চয় (S) ও ফার্মগুলির পরিকল্পিত বিনিয়োগ (I) পরস্পর সমান হবে সেই বিন্দুতে ভারসাম্য আয়স্তর নির্ধারিত হবে। আমরা ৮.৬ নং চিত্রে এই ভারসাম্য দেখিয়েছি।

আমরা অনুভূমিক অক্ষে আয় (Y) এবং উল্লম্ব অক্ষে সঞ্চয় (S) ও বিনিয়োগ (I) পরিমাপ করছি। চিত্রে S(Y) হল সঞ্চয় রেখা এবং I_0 হল বিনিয়োগ রেখা। আমাদের S রেখাটি ঊর্ধ্বমুখী। এর একটি ঋণাত্মক উল্লম্ব ছেদাংশ থাকে। I রেখাটি অনুভূমিক সরলরেখা কারণ এখানে I-কে স্বয়ম্ভূত ধরা হয়েছে। S ও I রেখা পরস্পরকে E বিন্দুতে ছেদ করেছে। ঐ বিন্দুতে $S = I = EY_0$। সুতরাং E বিন্দু হল ভারসাম্য বিন্দু এবং OY_0 হল ভারসাম্য আয়স্তর। এভাবে পরিকল্পিত সঞ্চয় ও পরিকল্পিত বিনিয়োগের সমতার দ্বারা ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ধারিত হয়। ভারসাম্যটি স্থায়ী হবে যদি S রেখা নীচের দিক থেকে I রেখাকে ছেদ করে। আমাদের চিত্রে সেই শর্ত পূরণ হয়েছে। সুতরাং, E বিন্দুর ভারসাম্যটি একটি স্থায়ী বা স্থিতিশীল (stable) ভারসাম্য।

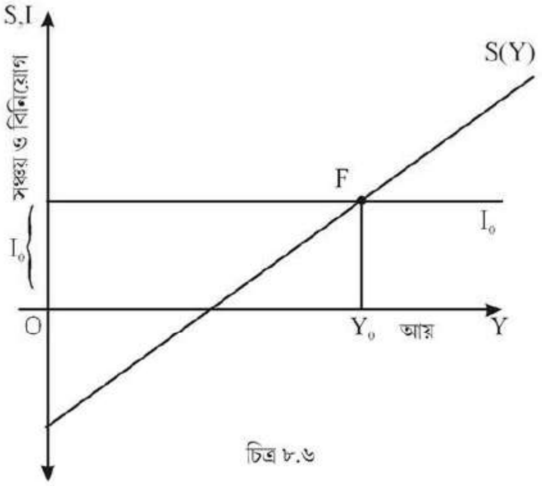

চিত্র ৮.৬

আমাদের আগের সাংখ্য উদাহরণটি দিয়েও ভারসাম্য আয় নির্ধারণ করতে পারি। আমাদের ভোগ ব্যয়ের সমীকরণ হল : $C = 600 + 4/5Y$. সুতরাং, S রেখার সমীকরণ হ'ল : $S = Y - C = Y - 600 - 4/5Y = 1/5Y - 600$.

আমাদের I-এর মান ছিল : $I = 400$. সুতরাং ভারসম্যর শর্ত $S = I$ থেকে পাই, $1/5Y - 600 = 400$, বা, $1/5Y = 400 + 600$

বা, $Y = \dfrac{600+400}{1/5} = 1{,}000 \times 5 = 5000$. অতএব, ভারসাম্য আয়স্তর = 5,000.

আমাদের উদাহরণটিকে সাধারণ আকারেও দেখাতে পারি। আমাদের ভোগ ব্যয় রেখার সমীকরণ = $C = a + bY$.

$\therefore S = Y - C = Y - a - bY = (1 - b)Y - a$। আর বিনিয়োগ ব্যয় = $I = A$। এখন, $S = I$ বসিয়ে পাই, $(1 - b)Y - a = A$

বা, $(1 - b)Y = a + A \quad \therefore Y = \frac{a+A}{1-b} = \frac{a+A}{s}$ যেখানে $(1 - b) = s$.

আমরা আগের পদ্ধতিতেও ভারসাম্য আয়ের একই মান পেয়েছি।

৮.১১ বিনিয়োগ গুণক বা ভারসাম্য আয়ের উপর বিনিয়োগ বৃদ্ধির প্রভাব

কেইন্‌স্‌-এর সরল আয় ও নিয়োগ তত্ত্বে স্বয়ভূত বিনিয়োগ ব্যয় বাড়লে ভারসাম্য আয়স্তর বাড়ে। স্বয়ম্ভুত বিনিয়োগ ব্যয় এক একক বাড়লে আয়স্তর যত একক বাড়ে তাকেই বিনিয়োগ গুণক বলে। মনে করি, স্বয়ম্ভুত বিনিয়োগ ব্যয় ΔI একক বাড়লে আয়স্তর ΔY একক বাড়ে। তাহলে বিনিয়োগ গুণক, ধরি, $k = \frac{\Delta Y}{\Delta I}$. দেখানো যায় যে, এই বিনিয়োগ গুণকের মান $= \frac{1}{1-MPC} = \frac{1}{MPS}$. অর্থাৎ বিনিয়োগ গুণকের মান হল প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতা বা MPS-এর অন্যোন্যক। আমরা রেখা চিত্রের সাহায্যে সহজেই বিনিয়োগ গুণকের মান বের করতে পারি। ৮.৭ নং চিত্রে আমরা অনূভূমিক অক্ষে আয়স্তর এবং উল্লম্ব অক্ষে মোট চাহিদা (C + I) পরিমাপ করেছি। আয়স্তর নির্ধারণ করার জন্য আমরা (C + I) রেখা ও 45° লাইন টানলাম। এই দুই রেখা P বিন্দুতে পরস্পরকে ছেদ করেছে। সুতরাং P বিন্দু হল প্রাথমিক ভারসাম্য বিন্দু বা কেইন্‌সীয় ছেদবিন্দু। তখন ভারসাম্য আয়স্তর হল OY_0। এখন, মনে করি, বিনিয়োগ ব্যয় ΔI পরিমাণ বাড়ল। ফলে (C + I) রেখা ΔI পরিমাণ উল্লম্বভাবে উপরের দিকে উঠে গেল। এই রেখা 45° লাইনকে Q বিন্দুতে ছেদ করেছে। সুতরাং Q বিন্দু হল নতুন ভারসাম্য বিন্দু। নতুন ভারসাম্য আয়স্তর $= OY_1$। এতএব, $\Delta Y = Y_0Y_1 = PR$। আমাদের দেখাতে হবে এই ΔY, ΔI বা QT-এর কতগুণ অর্থাৎ আমাদের $\frac{\Delta Y}{\Delta I}$-এর মান নির্ণয় করতে হবে। চিত্র থেকে আমরা লিখতে পারি, $\frac{\Delta I}{\Delta Y} = \frac{QT}{PR} = \frac{QR-TR}{PR} = \frac{QR}{PR} - \frac{TR}{PR} = 1 - \frac{TR}{PR}$ যেহেতু $\frac{QR}{PR} = PQ$ লাইনের ঢাল = 45° লাইনের ঢাল = 1. আবার, $\frac{TR}{PR} = PT$ লাইনের ঢাল = (C + I) রেখার ঢাল = C রেখার ঢাল = MPC. তাহলে, $\frac{\Delta I}{\Delta Y} = 1 - MPC$. অতএব,

$\frac{\Delta Y}{\Delta I} = \frac{1}{1-MPC} = \frac{1}{MPS}$. এটিই হল বিনিয়োগ গুণকের মান।

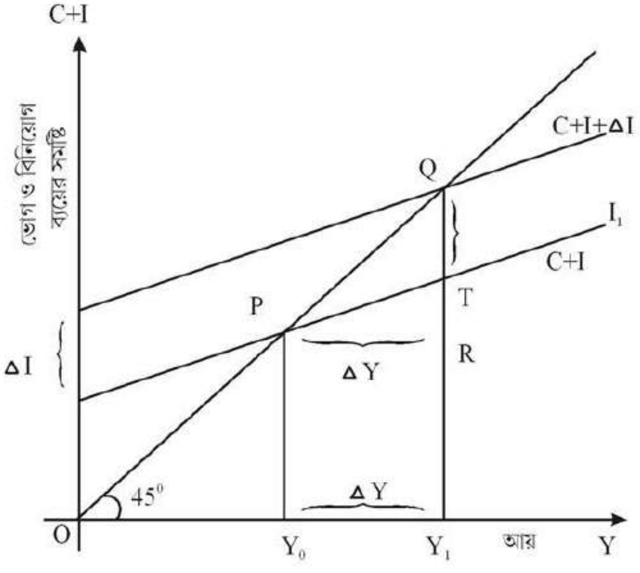

চিত্র ৮.৭

আমরা গাণিতিক ভাবেও বিনিয়োগ গুণকের মান সহজেই বের করতে পারি। আমাদের ভারসাম্যর শর্ত হল, $Y = C + I$ বা, $\Delta Y = \Delta C + \Delta I$ বা, $\frac{\Delta Y}{\Delta I} = \frac{\Delta C}{\Delta Y} \cdot \frac{\Delta Y}{\Delta I} + 1$

$$\therefore \frac{\Delta Y}{\Delta I} = \left(1 - \frac{\Delta C}{\Delta Y}\right) = 1 \quad \text{বা, } \frac{\Delta Y}{\Delta I} = \frac{1}{1 - \frac{\Delta C}{\Delta Y}} = \frac{1}{1 - MPC} = \text{বিনিয়োগ গুণক।}$$

আমরা সঞ্চয়-বিনিয়োগ রেখাচিত্রের সাহায্যেও বিনিয়োগ গুণকের মান নির্ণয় করতে পারি। আমাদের ৮.৮ নং চিত্রে প্রাথমিক ভারসাম্য বিন্দু হল A যেখানে S ও I রেখা পরস্পর ছেদ করেছে। তখন ভারসাম্য আয়স্তর হল OY_0। এখন, মনে করি, স্বয়ম্ভুত বিনিয়োগ ΔI পরিমাণ বাড়ল। ফলে বিনিয়োগ রেখা I_0 থেকে $I_0 + \Delta I$-তে সরে গেল। নতুন ভারসাম্য বিন্দু হল B এবং নতুন ভারসাম্য আয় হল OY_1। ভারসাম্য আয়স্তর Y_0Y_1 বা AD পরিমাণ বাড়ল। $\therefore \Delta Y = AD$. চিত্রে $\Delta I = BD$। আমাদের $\frac{\Delta Y}{\Delta I}$-এর মান নির্ণয় করতে হবে। চিত্র থেকে পাই, $\therefore \frac{\Delta Y}{\Delta I} = \frac{1}{MPS}$. এটিই হল আমাদের বিনিয়োগ গুণকের মান।

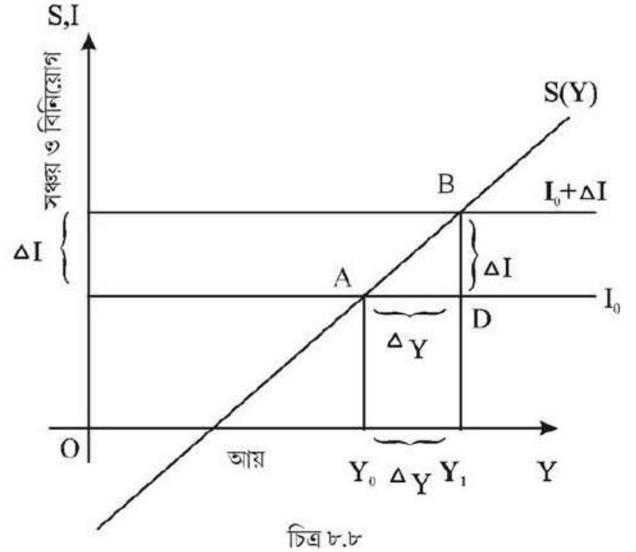

চিত্র ৮.৮

আমরা গাণিতিক ভাবেও খুব সহজেই বিনিয়োগ গুণকের মান বের করতে পারি। আমাদের এক্ষেত্রে ভারসাম্য শর্ত হল, $S = I$ বা, $\Delta S = \Delta I$

$\therefore \frac{\Delta S}{\Delta Y} \cdot \frac{\Delta Y}{\Delta I} = 1$ বা, $\frac{\Delta Y}{\Delta I} = \frac{1}{\Delta S/\Delta Y}$ অর্থাৎ বিনিয়োগ গুণক = $\frac{1}{MPS}$.

আমাদের বিনিয়োগ গুণকের মান = $\frac{\Delta Y}{\Delta I} = \frac{1}{1-MPC} = \frac{1}{MPS}$. এখন, $0 < MPC < 1$ এবং $0 < MPS < 1$. তাহলে বিনিয়োগ গুণকের মান ধনাত্মক। এর অর্থ হল, স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ ব্যয় বাড়লে ভারসাম্য আয়স্তর বাড়বে। আবার, যেহেতু MPC বা MPS < 1, বিনিয়োগ গুণক > 1. এর অর্থ হল, বিনিয়োগ ব্যয় বাড়লে আয়স্তর শুধু বাড়বে তাই-ই নয়, বিনিয়োগ ব্যয় অপেক্ষা আয়স্তর বেশি বাড়বে। উদাহরণস্বরূপ, মনে করি, MPC = 3/4 এবং সেক্ষেত্রে MPS = 1 – MPC = $1-\frac{3}{4}=\frac{1}{4}$. এক্ষেত্রে গুণকের মান = $\frac{1}{1-\frac{3}{4}} = \frac{1}{1/4} = 4$. এর অর্থ হল, স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ ব্যয় 100 টাকা বাড়লে এক্ষেত্রে ভারসাম্য আয়স্তর 400 টাকা বাড়বে।

৮.১১.১. প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা ও বিনিয়োগ গুণকের সম্পর্ক

আমরা জানি বিনিয়োগ গুণক = $\frac{1}{1-\text{প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা}}$ = $\frac{1}{\text{প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতা}}$। প্রতীকের সাহায্যে, বিনিয়োগ গুণক = $\frac{1}{1-MPC}=\frac{1}{MPS}$. দেখা যাচ্ছে, MPC-র মান যত বড় হবে বা MPS-এর মান যত ছোট হবে, বিনিয়োগ গুণকের মান তত বড় হবে। বিপরীতক্ষেত্রে, MPC-র মান যত ছোট হবে বা MPS-এর মান যত বড় হবে, বিনিয়োগ গুণকের মান তত ছোট হবে। যেমন,

MPC = $\frac{1}{2}$ বা MPS = $\frac{1}{2}$ হলে গুণকের মান = 2

MPC = $\frac{3}{4}$ বা MPS = $\frac{1}{4}$ হলে গুণকের মান = 4

MPC = 4/5 বা MPS = $\frac{1}{5}$ হলে গুণকের মান = 5

MPC = 9/10 বা MPS = $\frac{1}{10}$ হলে গুণকের মান = 10

MPC = $\frac{19}{20}$ বা MPS = $\frac{1}{20}$ হলে গুণকের মান = 20 ইত্যাদি।

কেন MPC বড় হলে (বা MPS ছোট হলে) বিনিয়োগ গুণকের মান বড় হয় তা বুঝতে পেলে আমাদের গুণক প্রক্রিয়াটি জানা দরকার। মনে করি, $\Delta I = 100$ এবং MPC = 4/5। তাহলে 100 টাকার বিনিয়োগ ব্যয় বাড়লে তাৎক্ষণিক বা প্রাথমিক চাহিদা বাড়ল 100 টাকার। ফলে জাতীয় আয়ও 100 টাকার বাড়ল। এর ফলে পরবর্তী সময়কালে ভোগ ব্যয় বাড়ল 100 × 4/5 বা 80 টাকার। ঐ চাহিদা মেটাতে জাতীয় আয় আবার 80 টাকার বাড়ল। ফলে পুনরায় ভোগ ব্যয় বাড়বে 80 × 4/5 বা 64 টাকার, ইত্যাদি। ফলে আয়ের মোট বৃদ্ধি,

$\Delta Y = 100 + 80 + 64 + \ldots \infty$ পদ পর্যন্ত

$= 100 + 100 \times 4/5 + 100 \times (4/5)^2 + \ldots$ অসীম পদ পর্যন্ত

$$= 100 \cdot \frac{1}{1-4/5} = \frac{1}{1/5} \cdot 100 = 5 \times 100 = 500.$$

এক্ষেত্রে গুণকের মান = 5 = $\frac{1}{1-4/5}$ বা $\frac{1}{1/5}$ অর্থাৎ $\frac{1}{1-MPC}$ বা $\frac{1}{MPS}$.

তাহলে, দেখা যাচ্ছে, বিনিয়োগ ব্যয় বাড়লে প্রাথমিক প্রভাবে সম-পরিমাণ আয়স্তর বাড়ে। কিন্তু প্রক্রিয়াটা সেখানেই থেমে যায় না। এরপর ভোগ ব্যয়ের মাধ্যমে চাহিদার উপর মাধ্যমিক প্রভাব পড়ে থাকে। এই মাধ্যমিক প্রভাবগুলির জন্যই গুণকের মান একের চেয়ে বড় হয়। এই মাধ্যমিক প্রভাবগুলি যত বড় হবে, গুণকের মানও তত বড় হবে। আর এই মাধ্যমিক প্রভাবগুলির আয়তন নির্ভর করে MPC-র মানের উপর। MPC যত বড় হবে (বা MPS যত ছোট হবে) গুণকের মান তত বড় হবে। যেমন, আমাদের উদাহরণে MPC-র মান যদি 4/5-এর বদলে 9/10 ধরি (9/10 > 4/5), তাহলে আয় বৃদ্ধির মানগুলি হবে : $\Delta Y = 100 + 90 + 81 + \ldots$। এক্ষেত্রে গুণকের মান হবে = $\frac{1}{1-9/10} = \frac{1}{1/10} = 10$. অর্থাৎ গুণকের মান বাড়ছে কেননা ভোগ ব্যয়ের উপর মাধ্যমিক প্রভাবগুলি আগের চেয়ে বেশি হবে।

৮.১১.২. বিনিয়োগ গুণক তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা (Limitations of Investment Multiplier Theory)

গুণক তত্ত্বের কয়েকটি সীমাবদ্ধতা আছে। সংক্ষেপে সেগুলি হল :

(i) দেশে উদ্বৃত্ত উৎপাদন ক্ষমতা না থাকলে গুণক তত্ত্ব কাজ করবে না। সেজন্য স্বল্পোন্নত দেশে মূলধনের অভাবের দরুন গুণক প্রক্রিয়া কার্যকর হয় না।

(ii) এই তত্ত্বে সময়কে আলাদা চলরাশি হিসাবে ধরা হয়নি। ফলে নির্দিষ্ট সময়কালের পর জাতীয় আয় কতটা বাড়বে তা এই স্থিতিশীল তত্ত্ব (Static Theory) থেকে জানা যায় না। তার জন্য আমাদের গতিশীল তত্ত্ব (dynamic theory) বিবেচনা করতে হবে।

(iii) গুণক তত্ত্বে সকল ব্যক্তির প্রান্তিক ভোগ প্রবণতার একই মান ধরা হয়। এটি অবাস্তব।

(iv) মুক্ত অর্থনীতিতে আমদানি থাকার দরুন গুণকের মান কম হবে। একে গুণকের আমদানি ছিদ্র (import leakage) বলে।

(v) সরকার লোকের আয়ের উপর কর বসালে লোকের ভোগ ব্যয় কম বাড়বে এবং তার ফলে গুণকের মান কম হবে। একে গুণকের কর ছিদ্র (tax leakage) বলে।

(vi) MPC = 1 হলে গুণকের মান অসীম হবে অর্থাৎ বিনিয়োগ যৎসামান্য বাড়লেও জাতীয় আয় অসীম পরিমাণ বাড়বে। আবার, MPC > 1 হলে গুণকের মান ঋণাত্মক হবে। এর অর্থ হল, বিনিয়োগ বাড়লে জাতীয় আয় কমবে। দুটি ফলাফলই আজগুবি ধরনের (absurd)। এগুলি বিশ্লেষণ করতে হলে

আমাদের গতিশীল গুণকের (dynamic multiplier) ধারণা ব্যবহার করতে হবে।

মন্তব্য : Haberler গুণককে পুনরুক্তি (tautology) বলেছেন, কিংবা Hart গুণককে গাড়ির অপ্রয়োজনীয় পঞ্চম চাকা (useless fifth wheel) বলে অভিহিত করেছেন। স্বয়ম্ভূত ব্যয় বাড়লে মোট কার্যকরী চাহিদা কতগুণ বাড়বে এবং কীভাবে বাড়বে তা এই তত্ত্ব থেকে জানা যায়। উন্নত ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে মন্দা দূর করতে গুণক তত্ত্বের তাৎপর্য অপরিসীম।

৮.১২ অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব

যে তত্ত্বে অর্থের পরিমাণের সঙ্গে দামস্তরের সম্পর্ক দেখানো হয়, সেই তত্ত্বকে অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব বলে। প্রাচীন এবং নয়া-প্রাচীন ধনবিজ্ঞানীদের মতে, দামস্তর পরিবর্তনের কারণ অর্থের পরিমাণে পরিবর্তন। অর্থের পরিমাণ বাড়লে দামস্তরের পরিমাণ বাড়ে এবং অর্থের পরিমাণ কমলে দামস্তরের পরিমাণ কমে। এটিই অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের মূলকথা। এখন, অর্থের মূল্য $= \frac{1}{\text{দামস্তর}}$। তাহলে অর্থের পরিমাণ বা জোগান বাড়ার দরুন দামস্তর বাড়লে অর্থের মূল্য কমবে এবং অর্থের জোগান কমলে দামস্তর কমার দরুন অর্থের মূল্য বাড়বে। অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের প্রবক্তরা অর্থের পরিমাণের সঙ্গে দামস্তরের এই প্রত্যক্ষ সম্পর্ককে নিম্নলিখিতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁদের মতে, লোকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ ক্রয়ক্ষমতা হাতে রাখতে চায়। এখন, যদি অর্থের জোগান বাড়ে, তাহলে লোকের হাতে বেশি অর্থ আসবে। তারা এই বাড়তি অর্থ ছাড়তে চাইবে। এখন, পরিমাণ তত্ত্বে ধরা হয় যে, অর্থ শুধু বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হয়। তাহলে অর্থ ছাড়া যাবে বেশি দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করে। ফলে জিনিসপত্রের চাহিদা বাড়বে। প্রাচীন এবং নয়া-প্রাচীন তত্ত্বে ধরা হয় যে, দ্রব্যসামগ্রীর জোগান পূর্ণ নিয়োগ স্তরে স্থির আছে। তাহলে, দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বাড়লে দামস্তর বাড়বে এবং অর্থের মূল্য কমবে।

অর্থের পরিমাণ তত্ত্বকে দুটি সমীকরণের সাহায্যে প্রকাশ করা হয়। একটি হল ফিশারের বিনিময় সমীকরণ এবং অপরটি হল কেম্ব্রিজ সমীকরণ বা নগদ ব্যালান্স সমীকরণ। আমরা এই দুটি সমীকরণ নিয়ে সংক্ষেপে একে একে আলোচনা করব।

৮.১২.১ ফিশার-এর বিনিময় সমীকরণ

অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের মূলকথা হল, অর্থের জোগান বাড়লে দামস্তরও একই অনুপাতে বাড়বে। মার্কিন অর্থনীতিবিদ আরভিং ফিশার একটি সমীকরণের সাহায্যে এই পরিমাণ তত্ত্বটিকে ব্যাখ্যা করেছেন। সেই সমীকরণটিকে বলা হয় ফিশারের পরিমাণ সমীকরণ (Quantity Equation) বা বিনিময় সমীকরণ (Equation of Exchange)। ফিশারের সমীকরণটি হল : $MV = PT$ যেখানে M = অর্থের জোগান, V = অর্থের প্রচলন বেগ, P = দামস্তর এবং T = দেশের মোট বাস্তব লেনদেনের পরিমাণ অর্থাৎ দেশের

দ্রব্যসামগ্রীর মোট জোগান। এখন, ফিশারের তত্ত্বে ধরা হয় যে, (i) দেশে পূর্ণ কর্মসংস্থান রয়েছে। সুতরাং T স্থির। (ii) অর্থের প্রচলন বেগ স্থির অর্থাৎ V স্থির থাকে। (iii) অর্থ শুধু বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবেই ব্যবহৃত হয়। (iv) অর্থ কর্তৃপক্ষ অর্থের জোগান স্বাধীনভাবে পরিবর্তন করতে পারে। এখন, আমাদের বিনিময় সমীকরণটিকে লেখা যায় : $P=\frac{MV}{T}$ । ফিশারের অনুমান অনুযায়ী, V ও T স্থির থাকে। তাহলে M বা টাকার জোগান যে হারে বাড়বে, P বা দামস্তর সেই হারে বাড়বে। অর্থাৎ দেশের অর্থের পরিমাণ ও দামস্তরের মধ্যে একটি প্রত্যক্ষ আনুপাতিক সম্পর্ক আছে। এটিই ফিশারের সমীকরণের মূলকথা।

আজকাল ব্যাঙ্কে রক্ষিত চাহিদা আমানতকে অর্থের জোগানের একটা অংশ বলে ধরা হয়। যদি এই ধরনের অর্থের পরিমাণ M_1 হয় এবং এর প্রচলন বেগ যদি V_1 ধরা হয়, তাহলে ফিশারের সমীকরণটি দাঁড়ায় : $PT = MV + M_1V_1$, $P=\frac{MV+M_1V_1}{T}$. এখন মনে করি, T, V এবং V_1 স্থির আছে এবং জনসাধারণের হাতে নগদ অর্থ (M) এবং ব্যাঙ্ক আমানতের (M_1) মধ্যে একটা নির্দিষ্ট অনুপাত বজায় রয়েছে। তাহলে M ও M_1 যে হারে বাড়বে, Pও সেই হারে বাড়বে অর্থাৎ অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব কাজ করবে।

সমালোচনা (Criticisms) : ফিশারের পরিমাণ তত্ত্বের বিরুদ্ধে কয়েকটি সমালোচনা করা হয়। (i) এখানে পূর্ণ কর্মসংস্থান ধরা হয়েছে। ফলে T স্থির থাকছে। T স্থির না থাকলে পরিমাণ তত্ত্ব কাজ করবে না। (ii) মন্দার সময় V কমে যায়। ফলে M বাড়লেও P বাড়ে না। ফলে এই তত্ত্ব দামের বাণিজ্যচক্রজনিত ওঠানামাকে ব্যাখ্যা করতে পারে না। (iii) অর্থকে এখানে শুধু বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ভাবা হয়েছে। কিন্তু অর্থ মূল্যের ভাণ্ডার হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। (iv) অর্থের পরিমাণ বাড়লে দামস্তর কীভাবে বাড়বে বা অর্থের মূল্য কীভাবে কমবে তা এই তত্ত্বে ব্যাখ্যা করা হয়নি। (v) ফিশারের সমীকরণে P হল সাধারণ দামস্তর। টাকার জোগান বাড়লে কোন্ কোন্ দ্রব্যের দাম বাড়বে তা এই তত্ত্ব থেকে জানা যায় না। ফিশারের সমীকরণের এই দামস্তরকে হ্যানসেন তাই 'জগাখিচুড়ি দাম' (hotch-potch price) বলে অভিহিত করেছেন। (ii) অর্থের প্রচলন বেগ বা V-এর সংজ্ঞায় লিখতে পারি, $V \equiv \frac{\text{লেনদেনের অর্থমূল্য}}{\text{ব্যবহৃত অর্থের পরিমাণ}} \equiv \frac{PT}{M}$

$\therefore MV \equiv PT$ । সুতরাং, ফিশারের সমীকরণটি একটি অভেদ মাত্র। V-এর সংজ্ঞা থেকেই আমরা এই অভেদ পাই। P ও M-এর সমস্ত মানের জন্যই এটা সত্য হবে। তাহলে এই সমীকরণে দামস্তর বা P নির্ণয় করা যায় না।

এসব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ফিশারের পরিমাণ তত্ত্বকে একেবারে অস্বীকার করা যায় না। বাস্তবে দেখা যায় যে, অর্থের জোগান বাড়লে দামস্তর বাড়ে বা অর্থের মূল্য কমে। অর্থের পরিমাণের সঙ্গে দামস্তরের

তাই একটা সম্পর্ক অবশ্যই আছে। তবে এই সম্পর্ক সমানুপাতিক নাও হতে পারে।

৮.১২.২. কেম্ব্রিজ সমীকরণ বা নগদ ব্যালান্স সমীকরণ

মার্শাল, পিগু, রবার্টসন প্রভৃতি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ একটি সমীকরণের সাহায্যে অর্থের পরিমাণ তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করেছেন। এই সমীকরণটিকে কেম্ব্রিজ সমীকরণ বা নগদ ব্যালান্স সমীকরণ বলা হয়। এই সমীকরণটি হল : $M = KPY$ যেখানে M = অর্থের জোগান, P = দামস্তর, Y = প্রকৃত জাতীয় আয় এবং K = ধ্রুবক। কেম্ব্রিজ অর্থনীতিবিদগণের মতে, জনসাধারণ তাদের আয়ের একটা অংশ নগদ অর্থের আকারে রাখতে চায়। সেই অংশটি হল K। যদি K ও Y স্থির থাকে, তাহলে M যে হারে বাড়বে, Pও সেই হারে বাড়বে অর্থাৎ অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব কাজ করবে।

কেম্ব্রিজ সমীকরণে তিনটি বিষয়ে ধরে নেওয়া হয়। (i) দেশে পূর্ণ কর্মসংস্থান রয়েছে। ফলে প্রকৃত জাতীয় আয় (Y) স্থির। (ii) জনসাধারণ তাদের আর্থিক আয়ের একটা নির্দিষ্ট অনুপাত (K) নগদ অর্থের আকারে রাখতে চায়। (iii) অর্থ কর্তৃপক্ষ স্বাধীন ভাবে অর্থের জোগান নির্ধারণ করে। দামস্তর বা আয়স্তরের উপর অর্থের জোগান (M) নির্ভর করে না। এই তিনটি অনুমান খাটলে অর্থের জোগান (M) যে হারে বাড়বে, দামস্তরও (P) সেই হারে বাড়বে বা অর্থের মূল্য সেই হারে কমবে। এভাবে কেম্ব্রিজ সমীকরণের দ্বারা অর্থের পরিমাণ তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করা হয়।

তবে কেম্ব্রিজ সমীকরণের কয়েকটি সীমাবদ্ধতা আছে। (i) এই সমীকরণে ধরা হয় যে, দেশে পূর্ণ কর্মসংস্থান রয়েছে। ফলে Y স্থির থাকছে। দেশে অপূর্ণ নিয়োগ অবস্থা থাকলে টাকার জোগান বাড়লে আয়স্তর (Y) বাড়বে। ফলে তখন পরিমাণ তত্ত্ব কাজ করবে না। (ii) কেম্ব্রিজ সমীকরণে ধরা হয়, K ধ্রুবক অর্থাৎ লোকে তাদের আয়ের একটা নির্দিষ্ট অংশ নগদ টাকায় রাখতে চায়। এটিও বাস্তবসম্মত নয়। (iii) অর্থের চাহিদা শুধুমাত্র আয়স্তরের উপরেই নির্ভর করে না, এটির সুদের হারের উপরও নির্ভর করে। কিন্তু এই বিষয়টি এই তত্ত্বে বিচার করা হয়নি।

তবে কেম্ব্রিজ সমীকরণটি ($M = KPY$) ফিশারের বিনিময় সমীকরণ অপেক্ষা উন্নততর। বিনিময় সমীকরণে T হল মোট লেনদেনের পরিমাণ। আর কেম্ব্রিজ সমীকরণে Y হলে দেশের মোট আয়। জাতীয় আয় সংক্রান্ত তথ্য অপেক্ষাকৃত সহজে পাওয়া যায়। দ্বিতীয়ত, বিনিময় সমীকরণে V হল প্রাতিষ্ঠানিক ধ্রুবক। কিন্তু কেম্ব্রিজ সমীকরণে লোকে আয়ের কত অংশ (= K) নগদ অর্থে ধরে রাখবে তা নগদ অর্থে ধরে রাখার ব্যয়ের উপর নির্ভর করে। এর অর্থ হল, নগদ অর্থের চাহিদা সুদের হারের উপরেও নির্ভর করে। সর্বোপরি, $M = KPY$ সমীকরণে M-কে অর্থের জোগান এবং KPY-কে অর্থের চাহিদা হিসাবে দেখা যেতে পরে। সেক্ষেত্রে এই সমীকরণটিকে মার্শালের চাহিদা-জোগানের কাঠামোর দ্বারা প্রকাশ করা যায়।

এসমস্ত কারণে অনেকে কেম্ব্রিজ সমীকরণকে ফিশারের বিনিময় সমীকরণ অপেক্ষা উন্নততর বলে মনে করেন।

৮.১২.৩. অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা

আমরা জানি, অর্থের পরিমাণ তত্ত্বকে দুটি বিকল্প সমীকরণের দ্বারা প্রকাশ করা যায় : (ক) ফিশারের বিনিময় সমীকরণ : $MV = PT$ এবং (খ) কেম্ব্রিজ সমীকরণ বা নগদ ব্যালান্স সমীকরণ : $M = KPY$। উভয় সমীকরণ কিছু অনুমানের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত প্রকাশ করে যে, অর্থের জোগানের সঙ্গে দামস্তরের প্রত্যক্ষ আনুপাতিক সম্পর্ক আছে। এটিই অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের মূল কথা। এই তত্ত্বের কয়েকটি সীমাবদ্ধতা আছে। সংক্ষেপে সেগুলি নিম্নরূপ :

(i) পরিমাণ তত্ত্বের সিদ্ধান্ত পূর্ণ নিয়োগ অবস্থাতেই প্রযোজ্য হবে। দেশে অপূর্ণ নিয়োগ অবস্থা থাকলে এই তত্ত্ব খাটবে না।

(ii) ফিশারের পরিমাণ তত্ত্বে অর্থের প্রচলন বেগ (V) স্থির বলে ধরা হয়। তেমনি, কেম্ব্রিজ সমীকরণে জনসাধারণের হাতে নগদ টাকা ও আয়ের অনুপাত (K) স্থির থাকে বলে ধরা হয়। এগুলিও অবাস্তব অনুমান।

(iii) পরিমাণ তত্ত্বে অর্থকে কেবল বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ধরা হয়েছে কিন্তু অর্থ কেবল বিনিময়ের মাধ্যমই নয়, মূল্যের ভাণ্ডার হিসাবেও কাজ করে। লোকে যদি ফাটকা কারবারের অভিপ্রায়ে অর্থ হাতে রাখে, তাহলে পরিমাণ তত্ত্বের সিদ্ধান্ত খাটবে না।

(iv) অর্থের পরিমাণ তত্ত্বে ধরা হয় যে, অর্থ কর্তৃপক্ষ স্বাধীনভাবে অর্থের জোগান পরিবর্তন করতে পারে। এর অর্থ হল, অর্থের জোগান বাড়লেও আয়ের স্তরে কোনো পরিবর্তন হয় না। এটা অবাস্তব অনুমান।

(v) অর্থের জোগান বাড়লে দামস্তর কীভাবে বাড়বে তা অর্থের পরিমাণ তত্ত্বে ব্যাখ্যা করা হয়নি।

(vi) পরিমাণ তত্ত্বের মতে, অর্থ কর্তৃপক্ষ দামস্তরের স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে পারে। অর্থের জোগান বাড়লে দামস্তর বাড়ে; অর্থের জোগান কমলে দামস্তর কমে। কিন্তু দামস্তরের পিছনে অর্থের জোগান ছাড়াও আরো অনেক বিষয় কাজ করে।

উপসংহারে আমরা বলতে পারি, অর্থের জোগান ও দামস্তরের মধ্যে কিছু সম্পর্ক অবশ্যই আছে। অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব সেই সত্যের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে। তবে সেই সম্পর্ক বাস্তবে এতটা প্রত্যক্ষ বা সমানুপাতিক নয় যতটা পরিমাণ তত্ত্বে বলা হয়।

৮.১৩ মুদ্রাস্ফীতি : সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ

সাধারণভাবে বলতে গেলে, মুদ্রাস্ফীতি হল একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোনো দেশের দামস্তর ক্রমাগত বেড়ে চলে। এটি একটি ভারসাম্যহীন অবস্থা। লক্ষ করার বিষয় যে, মুদ্রাস্ফীতি বলতে নিছক উচ্চ দামস্তরকে বোঝায় না। দামস্তর যদি খুব বেশি হয় এবং সেই দাম যদি স্থির থাকে তাহলে তাকে আমরা মুদ্রাস্ফীতি বলব না। মুদ্রাস্ফীতির সময় দামস্তরের ক্রমাগত বৃদ্ধি ঘটা চাই।

মুদ্রাস্ফীতির প্রকারভেদ (Types of Inflation) : বিভিন্ন মানদণ্ড অনুযায়ী মুদ্রাস্ফীতি নানা ভাগে ভাগ করা হয়। সংক্ষেপে সেগুলি নিম্নরূপ :

(ক) কর্মসংস্থানের পরিস্থিতি অনুযায়ী মুদ্রাস্ফীতির ভাগ : দেশে কর্মসংস্থানের পরিস্থিতি অনুযায়ী মুদ্রাস্ফীতিকে **পূর্ণ মুদ্রাস্ফীতি** ও **আধা-মুদ্রাস্ফীতি** এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। দেশে পূর্ণ কর্মসংস্থানের অবস্থা বজায় থাকলে দ্রব্যসামগ্রীর জোগান স্থির থাকে এবং সেই অবস্থায় দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বাড়লে দামস্তরের বৃদ্ধি ঘটে। একে পূর্ণ মুদ্রাস্ফীতি বলে। সাধারণত মুদ্রাস্ফীতি বলতে এই পূর্ণ মুদ্রাস্ফীতিকেই বোঝানো হয়। অন্যদিকে, যখন দেশে পূর্ণ কর্মসংস্থান নেই কিন্তু অন্য কোনো উপাদানের জোগানের অস্থিতিস্থাপকতার দরুন দ্রব্যসামগ্রীর জোগান বাড়ানো যাচ্ছে না এবং চাহিদা বাড়ার ফলে সাধারণ দামস্তর বাড়ছে, এরূপ অবস্থাকে **আধা-মুদ্রাস্ফীতি** বলে।

(খ) নিয়ন্ত্রণের ধরন অনুসারে মুদ্রাস্ফীতির ভাগ

মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের মাত্রা বা ধরন অনুসারে মুদ্রাস্ফীতিকে মুক্ত ও দমিত মুদ্রাস্ফীতি এই দু'ভাগে ভাগ করা হয়। যদি কোনো দেশে দামস্তর অবাধে বাড়তে পারে এবং দামস্তর বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ বা রোধ করার জন্য সরকার কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করে না, তাহলে সেই অবস্থাকে **অবাধ বা মুক্ত মুদ্রাস্ফীতি** বলে। অন্যদিকে, যদি দেশের সরকার নানা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে দামস্তরের ঊর্ধ্বগতি নিয়ন্ত্রণের জন্য নানা ব্যবস্থা অবলম্বন করে, তাহলে সেই অবস্থাকে দমিত মুদ্রাস্ফীতি বলে।

(গ) দামস্তরের বৃদ্ধির গতি অনুসারে মুদ্রাস্ফীতির ভাগ

দামস্তর বৃদ্ধির গতি অনুসারে মুদ্রাস্ফীতিকে মৃদুগতিসম্পন্ন বা লতানো মুদ্রাস্ফীতি (Mild or Creeping or Crawling inflation). চলমান (Walking) মুদ্রাস্ফীতি এবং ধাবমান (Run away) বা দ্রুতগতিসম্পন্ন মুদ্রাস্ফীতি (hyper-inflation) এই তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়। যখন দামস্তর খুব ধীরে অথচ নিয়মিতভাবে বাড়তে থাকে, সেই অবস্থাকে মৃদু মুদ্রাস্ফীতি বলে। আর যদি দামস্তর মোটামুটি একটা মাঝারি হারে নিয়মিত বাড়তে থাকে তাহলে তাকে চলমান মুদ্রাস্ফীতি বলে। অন্যদিকে, দামস্তর খুব দ্রুতহারে নিয়মিতভাবে বাড়তে থাকলে তাকে দ্রুতগতিসম্পন্ন বা ধাবমান (galloping) মুদ্রাস্ফীতি বলে। অবশ্য দামস্তর বৃদ্ধির হার কত কম হলে তাকে মৃদু মুদ্রাস্ফীতি বলা হবে, আর দামস্তর বৃদ্ধির হার কত বেশি হলে তাকে দ্রুতগতির

মুদ্রাস্ফীতি বলা হবে সে সম্পর্কে কোনো নির্দিষ্ট মানদণ্ড নেই। সাধারণভাবে, দামস্তর বৃদ্ধির হার 10%-এর কম হলে তাকে মৃদুগতির মুদ্রাস্ফীতি বলা হয় এবং দামস্তর বৃদ্ধির হার 10% বা তার বেশি হলে তাকে দ্রুতগতির মুদ্রাস্ফীতি বলা যেতে পারে।

(ঘ) কারণ অনুসারে মুদ্রাস্ফীতির ভাগ

কারণ অনুসারে মুদ্রাস্ফীতিতে প্রধানত চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি ও ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি এই দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়। যখন দেশে পূর্ণ নিয়োগ অবস্থার দরুন জোগান স্থির থাকে এবং দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বাড়ার জন্য দামস্তর বাড়তে থাকে, তাকে চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি বলে। অন্যদিকে, যখন উৎপাদনের উপাদানগুলির দাম বাড়ার ফলে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পায় এবং তার ফলে দামস্তরে যে নিয়মিত বৃদ্ধি ঘটে তাকে ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি বলে। আবার, দেশে টাকাকড়ির জোগান বাড়লে দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং তার ফলে দামস্তরের যে বৃদ্ধি ঘটে তাকে কারেন্সি মুদ্রাস্ফীতি বা মুদ্রাবৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি বলে। এটি আসলে চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতিরই একটা রূপ। আবার, যখন শ্রমিক সংঘ কেবলমাত্র যৌথ দর কষাকষির মাধ্যমে মজুরি বাড়াতে সমর্থ হয় এবং তার ফলে উৎপাদন ব্যয় বাড়ার দরুন দামস্তর বাড়ে, তখন তাকে মজুরি বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি (wage inflation) বলে। এটি আসলে ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতিরই একটা বিশেষ রূপ। আবার, উৎপাদকদের মুনাফা বৃদ্ধির ফলে যদি তাদের বিনিয়োগ প্রবণতা বাড়ে এবং তার ফলে দেশে কার্যকরী চাহিদা বাড়ার দরুন দামস্তর বাড়ে, তাহলে তাকে মুনাফা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি (Profit inflation) বলে। এটি আসলে চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতিরই প্রকারভেদ মাত্র।

এছাড়া স্বল্পোন্নত দেশে এক প্রকার মুদ্রাস্ফীতি দেখা যায়। এরূপ দেশে শ্রমের বাজারে পূর্ণ নিয়োগ অবস্থা থাকে না। কিন্তু দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বাড়লেও মূলধনের অভাবের দরুন জোগান বাড়ে না। ফলে সাধারণ দামস্তর বাড়তে থাকে। অনেকে একে স্থিতাবস্থায় মুদ্রাস্ফীতি (stagflation) বলে অভিহিত করেছেন। মোট জোগান বা উৎপাদনের স্থিতাবস্থা (stagnation) এবং দামস্তরের বৃদ্ধি বা মুদ্রাস্ফীতি (inflation) এই দুটির সহাবস্থান বোঝাতে এই অবস্থাকে stagflation বা স্থিতাবস্থাকালীন মুদ্রাস্ফীতি বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এটি আসলে আধা-মুদ্রাস্ফীতিরই (semi-inflation) একটি রূপ।

৮.১৩.১ চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি ও ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি

আমরা জানি, কারণ অনুসারে মুদ্রাস্ফীতিকে মূলত দু'ভাগে ভাগ করা হয় : চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি এবং ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি। এই দুই প্রকার মুদ্রাস্ফীতি এখন আমরা রেখাচিত্রের সাহায্যে সংক্ষেপে বর্ণনা করব।

চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি (Demand pull inflation or Demand inflation) :

যখন কোনো দেশে পূর্ণ নিয়োগ অবস্থা থাকার দরুন দ্রব্যসামগ্রীর জোগান স্থির থাকে বা সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক হয়, তখন দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বাড়লে দামস্তরের যে নিয়মিত বৃদ্ধি ঘটে তাকে চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি বা সংক্ষেপে চাহিদা মুদ্রাস্ফীতি বলে। ৮.৯ নং চিত্রে আমরা চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি বর্ণনা করেছি। এই চিত্রে AS হল মোট জোগান রেখা। OY_f হল পূর্ণ নিয়োগস্তরের জোগান। ঐ জোগানের স্তরে AS রেখা উল্লম্ব সরলরেখা বা সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক। এখন, মনে করি, প্রাথমিক মোট চাহিদা রেখা হল AD_1 এবং তখন E_1 হল ভারসাম্য বিন্দু। তখন দামস্তর হল OP_1। এখন, মনে করি, দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বাড়ল এবং মোট চাহিদা রেখা AD_2তে সরে গেল। ফলে নতুন ভারসাম্য বিন্দু হল E_2 এবং নতুন দামস্তর হল OP_2। চাহিদা আরও বাড়লে মোট চাহিদা রেখা আরো ডানদিকে সরে যাবে এবং দামস্তর বেড়ে OP_3 হবে। এক্ষেত্রে দ্রব্যসামগ্রীর জোগান স্থির আছে এবং চাহিদা বাড়ার জন্যই দামস্তর বাড়ছে। সুতরাং এটি হল চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি।

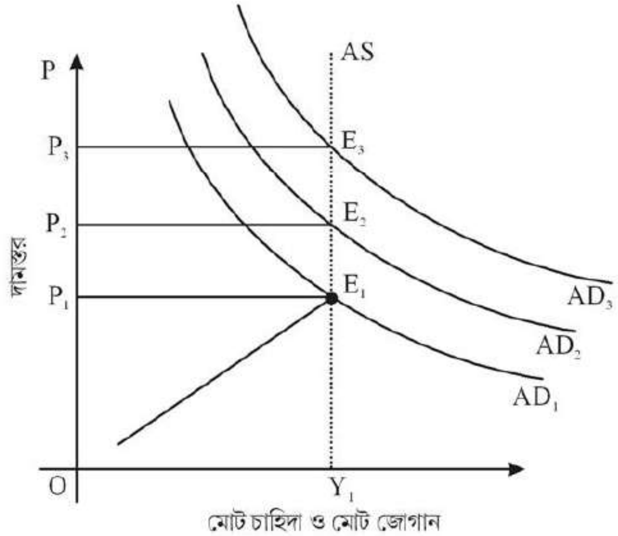

চিত্র ৮.৯

অন্যদিকে, যখন উৎপাদনের উপাদানের দামবৃদ্ধির (বিশেষত শ্রমের মজুরি) ফলে উৎপাদন ব্যয়ের বৃদ্ধি ঘটে এবং তার ফলে দামস্তরের যে নিয়মিত বৃদ্ধি ঘটে তাকে ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি বা, সহজ কথায়, ব্যয় মুদ্রাস্ফীতি (Cost inflation) বলে। ৮.১০ নং চিত্রে আমরা ব্যয় (বৃদ্ধিজনিত) মুদ্রাস্ফীতি বর্ণনা করেছি। আমাদের দ্রব্যসামগ্রীর মোট চাহিদা রেখা ও মোট জোগান রেখা পরস্পরকে E বিন্দুতে ছেদ করেছে। তখন ভারসাম্য দামস্তর হল OP_0। এখন, মনে করি, শ্রম অথবা অন্যান্য উপকরণের দাম বাড়ল। ফলে উৎপাদন ব্যয় বাড়বে এবং মোট জোগান রেখা (AS) উপরের দিকে উঠে যাবে। মনে করি, এর নতুন অবস্থান হল S_1। তখন ভারসাম্যের নতুন বিন্দু হল E_1 এবং দামস্তর বেড়ে হল OP_1। উপাদানগুলির

দাম বা ব্যয় আরো বাড়লে জোগান রেখা S_2-তে সরে যাবে। ফলে দামস্তর বেড়ে হবে OP_2। এক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যয়ের বৃদ্ধির জন্যই দামস্তর বাড়ছে। সুতরাং এটি হল ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি বা ব্যয় মুদ্রাস্ফীতি।

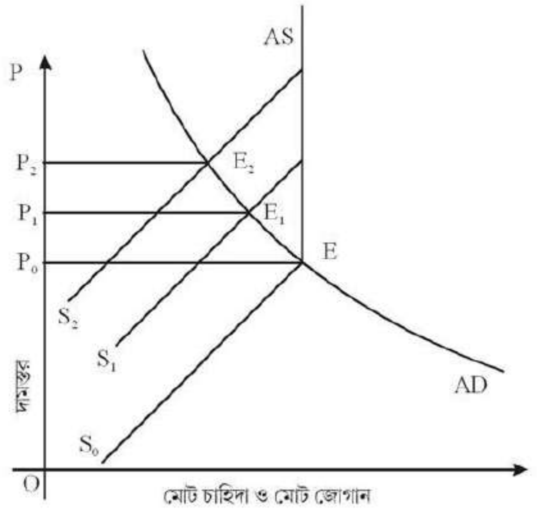

চিত্র ৮.১০

এক কথায়, চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতিতে দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধির জন্য দামস্তর বাড়ে। অন্যদিকে, ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতিতে উৎপাদন ব্যয় বা মজুরি বাড়ার জন্য দামস্তর বড়ে। তবে এই দুই প্রকার মুদ্রাস্ফীতির যা তফাৎ, তা নিছকই তত্ত্বগত। বাস্তবে এই দুই প্রকার মুদ্রাস্ফীতির মধ্যে পার্থক্য করা বা তাদের আলাদা আলাদা চিহ্নিত করা খুবই দুঃসাধ্য। স্যামুয়েলসন বলেছেন যে, বাস্তবে মুদ্রাস্ফীতির সময়ে মজুরি বৃদ্ধি ও দাম বৃদ্ধির একটি চক্র (wage-price spiral) তৈরি হয়। তখন কোথায় এই চক্রের শুরু অর্থাৎ আগে মজুরি বেড়েছে, না আগে দামস্তর বেড়েছে, তা বলা সম্ভব নয়। বাস্তবে যে-কোনো মুদ্রাস্ফীতি হল চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি ও ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির মিশ্র রূপ। আমরা শুধু তত্ত্বগতভাবে (theoretically) এই দু'প্রকার মুদ্রাস্ফীতির মধ্যে পার্থক্য টানতে পারি।

৮.১৩.২ মুদ্রাস্ফীতির ফাঁক

'মুদ্রাস্ফীতির ফাঁক' ধারণাটি কেইন্‌স্ 'How to Pay for the War?' নামক পুস্তিকায় আলোচনা করেন। কেইন্‌স্-এর মতে, মুদ্রাস্ফীতির ফাঁক বা ব্যবধান হল পূর্ণ নিয়োগ অবস্থায় দ্রব্যসামগ্রীর মোট চাহিদা ও মোট জোগানের ব্যবধান। পূর্ণনিয়োগ অবস্থায় দ্রব্যসামগ্রীর মোট চাহিদা যদি মোট জোগানের তুলনায় বেশি হয়, তাহলে দামস্তর বাড়বে বা মুদ্রাস্ফীতি ঘটবে। এজন্যই পূর্ণ নিয়োগ অবস্থায় মোট চাহিদা ও মোট জোগানের ব্যবধানকে মুদ্রাস্ফীতির ব্যবধান বা মুদ্রাস্ফীতির ফাঁক বলা হয়।

ধারণাটিকে আমরা ৮.১১নং চিত্রে ব্যাখ্যা করেছি। আমরা ধরে নিচ্ছি যে, দেশে তিনটি শ্রেণি আছে :

পরিবার, ফার্ম ও সরকার। সুতরাং, দেশের মোট কার্যকরী চাহিদা = ভোগ ব্যয় + বিনিয়োগ ব্যয় + সরকারি ব্যয় = C + I + G। আমরা ধরে নিচ্ছি যে, বিনিয়োগ ব্যয় এবং সরকারি ব্যয় স্বয়ম্ভূত অর্থাৎ তারা আয়ের স্তরের উপর নির্ভর করে না। শুধুমাত্র ভোগ ব্যয় আয়ের স্তরের উপর নির্ভর করে। সুতরাং, সামগ্রিক চাহিদা বা C + I + G নির্ভর করে আয়ের স্তরের উপর। চিত্রে অনুভূমিক অক্ষে আয় (Y) পরিমাপ করে আমরা (C + I + G) রেখা টেনেছি। এই রেখা 45° রেখাকে A বিন্দুতে ছেদ করেছে। ঐ বিন্দুতে মোট চাহিদা = মোট জোগান = $AY_f = OY_f = C + I + G$। সুতরাং, A বিন্দু হল ভারসাম্য বিন্দু এবং OY_f হল ভারসাম্য আয়স্তর বা ভারসাম্য জোগান। মনে করি, OY_f হল পূর্ণ নিয়োগাবস্থার জোগান অর্থাৎ দ্রব্যসামগ্রীর জোগান OY_f-এর বেশি হবে না। এখন, মনে করি, এক বা একাধিক স্বয়ম্ভূত চাহিদা বাড়ল। ফলে (C + I + G) রেখা উপরের দিকে $(C + I + G)_1$-এ সরে গেল। এখন, পূর্ণ নিয়োগ অবস্থায় মোট চাহিদা = BY_f কিন্তু মোট জোগান = $OY_f = AY_f$। সুতরাং, বাড়তি চাহিদা = $BY_f - AY_f = AB$. এই বাড়তি চাহিদা থাকার জন্য দামস্তর বাড়বে বা মুদ্রাস্ফীতি ঘটবে। তাই AB-কে কেইন্‌স্ মুদ্রাস্ফীতির ফাঁক বা মুদ্রাস্ফীতির ব্যবধান বলে অভিহিত করেছেন। চাহিদা বৃদ্ধির ফলে কীভাবে মুদ্রাস্ফীতি ঘটতে পারে তা এই ধারণার সাহায্যে খুব সুন্দরভাবে দেখানো হয়েছে। কেইন্‌স্-এর মুদ্রাস্ফীতির ফাঁক ধারণাটি চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির তত্ত্বকে প্রকাশ করেছে।

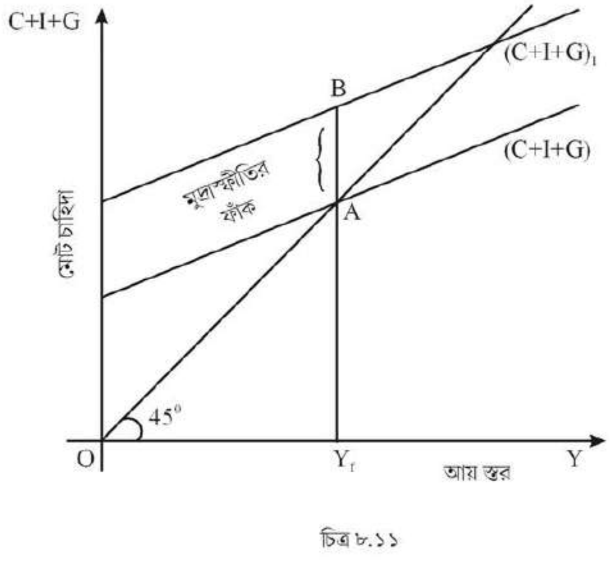

চিত্র ৮.১১

৮.১৩.৩ মুদ্রাস্ফীতির কারণ ও ফলাফল

□ মুদ্রাস্ফীতির কারণসমূহ (Causes of inflation) :

কোনো দেশে মুদ্রাস্ফীতি ঘটার পিছনে নানা কারণ কাজ করে। সেগুলিকে মোটামুটিভাবে দু'ভাগে ভাগ করা যায় : (ক) চাহিদার দিকের কারণ ও (খ) জোগানের দিকের কারণ।

(ক) চাহিদার দিকের কারণ : মুদ্রাস্ফীতির কারণ হিসাবে চাহিদার দিকের কারণগুলি চাহিদার বৃদ্ধির

বিষয়গুলি নির্দেশ করে। সেই বিষয়গুলি হল :

(i) জনসংখ্যা বৃদ্ধি : জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বাড়ে। ফলে দামস্তর বৃদ্ধির প্রবণতা দেখা যায়।

(ii) সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি : দেশের মোট কার্যকরী চাহিদা হল (C + I + G)। এখন, সরকারি ব্যয় বা G বাড়লে কার্যকরী চাহিদা বাড়ে। ফলে দামস্তর বাড়ে। এই সরকারি ব্যয় যদি অনুৎপাদনশীল কাজকর্মে ব্যয়িত হয়, তাহলে দামস্তর বৃদ্ধির প্রবণতা খুব বেশি হয়।

(iii) ভোগ প্রবণতা বৃদ্ধি : জনসাধারণের ভোগ প্রবণতা বৃদ্ধি পেলে মোট ভোগ ব্যয় (C) বাড়বে। ফলে দেশের কার্যকরী চাহিদা (C + I + G) বাড়বে এবং তা মুদ্রাস্ফীতির চাপ সৃষ্টি করবে।

(iv) ঘাটতি অর্থ সংস্থান : সরকারের বাজেট ঘাটতি যদি নতুন নোট ছাপিয়ে পূরণ করা হয়, তাহলে তাতে ঘাটতি অর্থ সংস্থান বাড়ে। এর ফলে দেশে জিনিসপত্রের চাহিদা বাড়ে এবং মুদ্রাস্ফীতি ঘটার সম্ভাবনা তৈরি হয়। প্রাচীন ধনবিজ্ঞানীদের মতে, দেশে টাকাকড়ির জোগান বাড়লে দামস্তর বাড়ে।

(v) কালো টাকা : দেশে কর-বহির্ভূত টাকা বা কালো টাকার পরিমাণ বেশি হলে দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বাড়ে। এটিও দেশে মুদ্রাস্ফীতি ঘটার অন্যতম কারণ।

(vi) ব্যাঙ্ক ঋণের প্রসার : ব্যাঙ্ক ঋণের অস্বাভাবিক প্রসার ঘটলে দেশে জিনিসপত্রের চাহিদা বাড়ে এবং মুদ্রাস্ফীতিতে ইন্ধন জোগায়।

(খ) জোগানের দিকের কারণ : জোগানের দিকের কিছু বিষয়ও মুদ্রাস্ফীতির পিছনে কাজ করে। সংক্ষেপে সেই বিষয়গুলি নিম্নরূপ :

(i) কৃষি উৎপাদনে অস্থিরতা : কোনো দেশের কৃষির উৎপাদন অনেকটাই অনিশ্চয়তায় ভরা। অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টির ফলে অনেক সময় শস্যহানি ঘটে। এটিও দামস্তর বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

(ii) মজুতদারি : অত্যাবশকীয় পণ্যে, বিশেষত খাদ্যদ্রব্যের, মজুতদারির ফলে দামস্তর বাড়ে।

(iii) উপাদানের দাম বৃদ্ধি : উৎপাদনের উপাদানগুলির, বিশেষত শ্রমের, দাম বাড়লে উৎপাদন ব্যয় বাড়ে। বিশেষত শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা না বেড়ে যদি শুধু যৌথ দর কষাকষির ফলে মজুরি বাড়ে, তাহলে তার ফলে দামস্তর বৃদ্ধি পায়।

(iv) প্রশাসনিক দাম বৃদ্ধি : সরকারের তরফে প্রশাসনিক দাম বাড়ালে এবং বিভিন্ন দ্রব্যের উপর পরোক্ষ কর বসালে সাধারণ দামস্তর বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতি ঘটে।

□ মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব বা ফলাফল (Effects of Inflation) :

মুদ্রাস্ফীতির ফলাফল বা প্রভাব অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে এবং বিভিন্ন শ্রেণির লোকের উপর বিভিন্ন হবে। আমরা সংক্ষেপে সেগুলি উল্লেখ করছি :

(i) উৎপাদন (Production) : মুদ্রাস্ফীতির সময় দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা থাকে এবং দামস্তর বাড়ে। ফলে এই সময় ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসার লাভ করে।

(ii) বিনিয়োগকারী (investors) : যারা শেয়ারে বিনিয়োগ করে তারা লাভবান হয় কারণ মুদ্রাস্ফীতির সময় তারা বেশি হারে লভ্যাংশ পায়। কিন্তু যারা বণ্ডে বা ঋণপত্রে বিনিয়োগ করে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় কারণ তাদের সুদের পরিমাণ নিদিষ্ট। মুদ্রাস্ফীতির সময় দামস্তরের বৃদ্ধির ফলে এই নির্দিষ্ট পরিমাণ সুদের প্রকৃত মূল্য (real value) কমে যায়।

(iii) স্থির আয়ের ব্যক্তিবর্গ (Fixed-income group) : স্থির আয়ের ব্যক্তিদের মুদ্রাস্ফীতির সময় ক্ষতি হয় কারণ দামস্তর বৃদ্ধির ফলে তাদের স্থির আয়ের প্রকৃত মূল্য বা ক্ষয়ক্ষমতা কমে যায়।

(v) শ্রমিক (Workers) : শ্রমিকেরা মুদ্রাস্ফীতির সময় দুটি কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। (ক) সাধারণত মুদ্রাস্ফীতির সময় দামস্তর যে হারে বাড়ে, আর্থিক মজুরি সেই হারে বাড়ে না। ফলে শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরি (real wage) কমে। (খ) দামস্তর বৃদ্ধি ও আর্থিক মজুরি বৃদ্ধির মধ্যে একটা সময় ব্যবধান কাজ করে। আগে দামস্তর বাড়ে, তারপর শ্রমিকেরা আন্দোলনে করলে তখন মজুরি কিছুটা বাড়ে। ফলে শ্রমিকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

(vi) কৃষক (Farmers) : ছোটো চাষিরা মুদ্রাস্ফীতির সময় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ বাজারে বিক্রি করার মতো বেশি বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্ত থাকে না। কিন্তু বেশি দামে তাদের শিল্পজাত দ্রব্য কিনতে হয়। কিন্তু বড় চাষিরা মুদ্রাস্ফীতির সময় লাভবান হয় কারণ মুদ্রাস্ফীতির সময়ে তারা বেশি দামে তাদের বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্ত বিক্রি করার সুযোগ পায়।

(vii) মজুতদার ও কালোবাজারি (Hoarders and black marketeers) : মুদ্রাস্ফীতির সময় মজুতদার ও কালোবাজারিরা লাভবান হয় কারণ তারা তাদের মজুত করা জিনিসপত্র বেশি দামে বিক্রি করার সুযোগ পায়।

উপসংহারে বলতে পারি যে, মৃদু মুদ্রাস্ফীতি অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহায়ক। অনেকে তাই বলেছেন যে, মৃদু মুদ্রাস্ফীতি উন্নয়নের চাকাকে তেল দিয়ে (oils) আরো মসৃণ করে। তবে মুদ্রাস্ফীতি একবার শুরু হলে তা ধাবমান মুদ্রাস্ফীতিতে (run away or hyper-inflation) পরিণত হবার প্রবণতা থাকে। আর ধাবমান মুদ্রাস্ফীতি অর্থনৈতিক উন্নয়নে নানা বাধার ও সমস্যার সৃষ্টি করে। এজন্যই মুদ্রাস্ফীতিকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন হয়।

৮.১৩.৪ মুদ্রাস্ফীতির নিয়ন্ত্রণ

মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের নানা পদ্ধতি আছে। সেগুলিকে সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করা হয় : (ক) রাজস্ব পদ্ধতি, (খ) আর্থিক পদ্ধতি এবং (গ) প্রত্যক্ষ পদ্ধতি। আমরা এই পদ্ধতিগুলি এখন সংক্ষেপে আলোচন করব।

(ক) রাজস্ব পদ্ধতি (Fiscal measures) : সরকারের বাজেটের মাধ্যমে অর্থাৎ সরকারের রেভিনিউ ও ব্যয়ের মাধ্যমে যে সকল পদ্ধতি কাজ করে তাদের একযোগে রাজস্ব পদ্ধতি বলে। মুদ্রাস্ফীতির সময় সরকার নিম্নলিখিত রাজস্ব পদ্ধতি গ্রহণ করে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করতে পারে :

(i) আমরা জানি, কার্যকরী চাহিদা = C + I + G যেখানে G = সরকারি ব্যয়। এখন, কর অপরিবর্তিত রেখে সরকারি ব্যয় কমালে দেশের মোট চাহিদা কমবে এবং মুদ্রাস্ফীতির উপর কিছুটা নিয়ন্ত্রণ আসবে।

(ii) সরকারি ব্যয় অপরিবর্তিত রেখে প্রত্যক্ষ কর বাড়ালে লোকের ব্যয়যোগ্য আয় (= আয় – প্রত্যক্ষ কর) কমবে। ফলে দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা কমবে এবং দামস্তরে স্থিতিশীলতা আসবে অর্থাৎ দামস্তরের উপর ঊর্ধ্বচাপ কমবে।

(iii) অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত অবস্থায় হস্তান্তর প্রদান কমলে লোকের হাতে কম টাকা আসবে। ফলে দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা কমবে।

(খ) আর্থিক পদ্ধতি (Monetary measures) : যে সকল পদ্ধতির দ্বারা দেশের কর্তৃপক্ষ মোট অর্থের এবং ব্যাঙ্ক ঋণের জোগান নিয়ন্ত্রণ করে অর্থনৈতিক কাজকর্মকে প্রভাবিত করে, সেই পদ্ধতিগুলিকে একত্রে আর্থিক পদ্ধতি বলে। মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য টাকার জোগান কমানো প্রয়োজন। টাকার জোগান নিম্নলিখিত ভাবে কমানো যেতে পারে :

(i) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি ব্যাঙ্ক রেট বাড়ায়, তাহলে সুদের হার বাড়বে এবং ব্যাঙ্ক ঋণের পরিমাণ কমবে।

(ii) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি নগদ জমার অনুপাত বাড়ায়, তাহলে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির ঋণদানের ক্ষমতা কমবে। ফলে ব্যাঙ্ক ঋণের পরিমাণ কমবে।

(iii) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক খোলাবাজারে ঋণপত্র বিক্রি করলে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি এবং জনসাধারণ এই সমস্ত ঋণপত্র কিনবে। ফলে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির ঋণ প্রদানের ক্ষমতা কমবে। জনসাধারণের হাতেও অর্থের পরিমাণ কমবে। এই পদ্ধতিকে খোলাবাজারি কার্যকলাপ বলে। ব্যাঙ্ক ঋণ নিয়ন্ত্রণের এই তিনটি পদ্ধতিকে একযোগে পরিমাণমূলক পদ্ধতি বলে।

(iv) নির্বাচনমূলক বা গুণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির দ্বারা অকাম্য ক্ষেত্রে ঋণের সঙ্কোচন ঘটানো যেতে পারে। এর ফলে দেশে দ্রব্যসামগ্রীর মোট চাহিদা কমবে এবং মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রিত হবে।

(গ) প্রত্যক্ষ পদ্ধতি (Direct measures) : কোনো দেশের সরকার মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য সরাসরি কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। এদের প্রত্যক্ষ পদ্ধতি বলে। এরূপ কয়েকটি প্রত্যক্ষ পদ্ধতি হল নিম্নরূপ :

(i) নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার ভোগ বরাদ্দ (rationing) ব্যবস্থা চালু করতে পারে। (ii) ব্যবসায়ীরা যাতে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের কৃত্রিম ঘাটতি তৈরি করতে না পার, তার জন্য সরকার ব্যবসায়ীদের দোকানে মজুত তালিকা টাঙানো বাধ্যতামূলক করতে পারে। (iii) সরকার কালো টাকা নিয়ন্ত্রণের জন্য নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। (iv) সরকার নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সর্বোচ্চ দাম বেঁধে দিতে পারে। (v) বিভিন্ন উপাদানের মালিকের সঙ্গে আলোচনা করে অথবা একতরফাভাবে উপাদানগুলির দাম (খাজনা, মজুরি, সুদ প্রভৃতি) সরকার বেঁধে দিতে পারে। এতে উৎপাদন ব্যয় তথা দ্রব্যের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখা যাবে। (vi) সরকার শ্রমিকদের বর্ধিত মজুরি বিলম্বে প্রদানের নীতিও গ্রহণ করতে পারে।

মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য এই সমস্ত পদ্ধতির মধ্যে কোন্‌টি ভালো বা অধিকতর কার্যকরী? এর উত্তরে বলা যায়, মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের এই পদ্ধতিগুলি একে অপরের পরিবর্ত নয়, বরং তারা একে অপরের পরিপূরক। অধ্যাপক স্যামুয়েলসন মুদ্রাস্ফীতিকে বহুমুখী দানব বলে অভিহিত করেছেন। মুদ্রাস্ফীতি নামক এই বহুমুখী দানবকে বধ করতে হলে সমস্ত পদ্ধতিগুলি একযোগে ব্যবহার করতে হবে। তাহলে আমরা দ্রুত এবং কার্যকরী ফল পাবো।

৮.১৪ ত্বরণ তত্ত্ব এবং এর সীমাবদ্ধতা

ত্বরণ তত্ত্বের মূলকথা হল, কোনো সময়কালে বিনিয়োগের পরিমাণ দেশের আয়বৃদ্ধির বা চাহিদা বৃদ্ধির উপর নির্ভর করে, অর্থাৎ $I = f(\Delta Y)$। এখানে I = বিনিয়োগ এবং ΔY = বাড়তি চাহিদা। আয় বা চাহিদার দ্বারা প্রণোদিত এরূপ বিনিয়োগকে উদ্ভূত বিনিয়োগ (induced investment) বলে। যদি কাম্য মূলধন-উৎপন্নের অনুপাত v হয়, তাহলে ত্বরণ তত্ত্বের মতে, $I = v.\ \Delta Y$। কয়েকটি অনুমানের ভিত্তিতে এই ত্বরণ তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করা যায় :

(i) মূলধন-উৎপন্নের অনুপাত স্থির আছে। যদি কাম্য মূলধন-উৎপন্ন অনুপাতকে v দ্বারা চিহ্নিত করি, তাহলে $K_t = vY_t$ যেখানে K_t = t সময়কালে মূলধনের চাহিদা, Y_t = t সময়কালে পরিকল্পিত উৎপাদনের পরিমাণ।

(ii) ফার্মের লক্ষ্য হল মুনাফা সর্বাধিক করা। সুতরাং, ফার্ম মূলধনের কাম্য পরিমাণের সঙ্গে প্রকৃত পরিমাণকে সমান করতে চাইবে।

(iii) ফার্মের কোনো অলস বা উদ্বৃত্ত উৎপাদন ক্ষমতা নেই।

(iv) উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদা স্থায়ীভাবে বেড়েছে।

এই অনুমানগুলির সাহায্যে ত্বরণ তত্ত্ব নিম্নলিখিত ভাবে নির্ধারণ করা যায়। প্রথমে $(t-1)$ সময়কালে মূলধনের কাম্য পরিমাণ K_{t-1} অর্থাৎ $K_{t-1} = vY_{t-1}$.....(i)। এখন, মনে করি, উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদা স্থায়ীভাবে বেড়ে Y_t হল। এই চাহিদা মেটানোর জন্য ফার্মকে আরো উৎপাদন করতে হবে। সুতরাং, মূলধনের কাম্য পরিমাণও বাড়বে। ফলে মূলধনের চাহিদা K_{t-1} হতে বেড়ে K_t হবে। অর্থাৎ $K_t = VY_t$.......(2)। (2) নং সমীকরণ থেকে (1) নং বিয়োগ করে পাই, $K_t - K_{t-1} = v(Y_t - Y_{t-1})$। এখন $K_t - K_{t-1}$ = বিনিয়োগ = I_t। সুতরাং, আমরা পাই, $I_t = v. \Delta Y$ যেখানে ΔY হল আয়স্তর বা চাহিদার পরিবর্তন। এটিই আমাদের ত্বরণ তত্ত্ব। ধ্রুবক v হল ত্বরক বা মূলধন সহগ।

আমরা ত্বরণ তত্ত্বের তাৎপর্য সংক্ষেপে এভাবে লিখতে পারি :

(i) বিনিয়োগ বা I ধনাত্মক হবে যদি উৎপাদন বাড়ে।

(ii) বিনিয়োগ কমবে যদি উৎপাদন বৃদ্ধির হার কমে।

(iii) বিনিয়োগ শূন্য হবে যদি উৎপাদন স্থির থাকে।

(iv) বিনিয়োগ ঋণাত্মক হবে যদি উৎপাদন কমে।

ত্বরণ তত্ত্বের কয়েকটি সীমাবদ্ধতা আছে। **প্রথমত,** তত্ত্বটি কয়েকটি অবাস্তব অনুমানের ভিত্তিতে গঠিত। যেমন, মূলধন-উৎপন্নের অনুপাত স্থির বলে ধরা হয়। তা না হলে আমাদের এই সরল ত্বরণ তত্ত্ব নির্ধারণ করা যায় না। আবার, ধরা হয়েছে, ফার্মের কোনো উদ্বৃত্ত উৎপাদন ক্ষমতা নেই। উদ্বৃত্ত উৎপাদন ক্ষমতা থাকলে বাড়তি চাহিদা মেটাতে আর বিনিয়োগের দরকার পড়ত না। সেক্ষেত্রে ত্বরণ তত্ত্ব খাটবে না। আবার, ত্বরণ তত্ত্ব খাটবে যদি উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদা স্থায়ীভাবে বেড়ে থাকে। চাহিদার সাময়িক বা মরশুমি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ফার্ম মূলধনের জোগান বাড়বে না।

দ্বিতীয়ত, নতুন মূলধনী দ্রব্য বসানোর সময় ফার্ম ঐ মূলধনী দ্রব্যের খরচ এবং ঐ মূলধনী দ্রব্য থেকে সম্ভাব্য প্রতিদান বিচার করবে। ত্বরণ তত্ত্বে এটি বিচার করা হয়নি।

তৃতীয়ত, দেখা গেছে যে, বিনিয়োগের প্রধান নির্ধারক হল মুনাফা। কিন্তু ত্বরণ তত্ত্বে বিনিয়োগের পিছনে মুনাফার প্রভাবকে বিবেচনা করা হয়নি।

চতুর্থত, ত্বরণ তত্ত্বে ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার ক্ষেত্রে বিনিয়োগের বিষয় বিবেচনা করা হয়নি।

পঞ্চমত, আর্থিক পরিসম্পদের ক্ষেত্রে বিনিয়োগের নীতি কী হবে তা ত্বরণ তত্ত্বে জানা যায় না।

তবু ত্বরণ তত্ত্বের কিছু সত্যতা অবশ্যই আছে। বাড়তি উৎপাদন করতে হলে বাড়তি বিনিয়োগ প্রয়োজন। সুতরাং, দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বাড়লে তা অবশ্যই বিনিয়োগকে উৎসাহিত বা প্রণোদিত করবে।

তবে দুটির মধ্যে সমানুপাতিক সম্পর্ক নাও থাকতে পারে। এছাড়া, ত্বরণ তত্ত্বের সাহায্যে আয়ের বাণিজ্য চক্রজনিত ওঠানামা ব্যাখ্যা করা যায়। বাণিজ্য চক্রের তত্ত্বে তাই ত্বরণ তত্ত্বের বিশেষ স্থান আছে।

৮.১৫ বাণিজ্য চক্র এবং এর বিভিন্ন পর্যায়

কোনো দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক কাজকর্ম, যেমন, আয়, উৎপাদন, নিয়োগ, দামস্তর প্রভৃতির ক্ষেত্রে যে নিয়মিত ও চক্রাকারে উত্থান-পতন ঘটে তাকে বাণিজ্য চক্র (Business Cycle বা Trade Cycle) বলে। এর দুটি অংশ : ঊর্ধ্বগতি ও নিম্নগতি। ঊর্ধ্বগতির আবার দুটি অংশ : দীর্ঘকালীন প্রসার পথের নীচের অংশ উন্নতি ও উপরের অংশ হল সমৃদ্ধি। তেমনি, নিম্নগতির আবার দুটি অংশ—দীর্ঘকালীন প্রসার পথের উপরের অংশ হল অবনতি এবং নীচের অংশ হল মন্দা। ঊর্ধ্বগতির সর্বোচ্চ বিন্দু হল চরম সমৃদ্ধি (Boom), আর নিম্নগতির সর্বনিম্ন বিন্দু হল সংকট (Crisis)। সুতরাং, বাণিজ্য চক্রের 4টি পর্যায় : উন্নতি, সমৃদ্ধি, অবনতি ও মন্দা। আমরা এগুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করব। আমরা ৮.১২ নং চিত্রে বাণিজ্য চক্রের চারটি পর্যায় বা স্তর (phase) দেখিয়েছি।

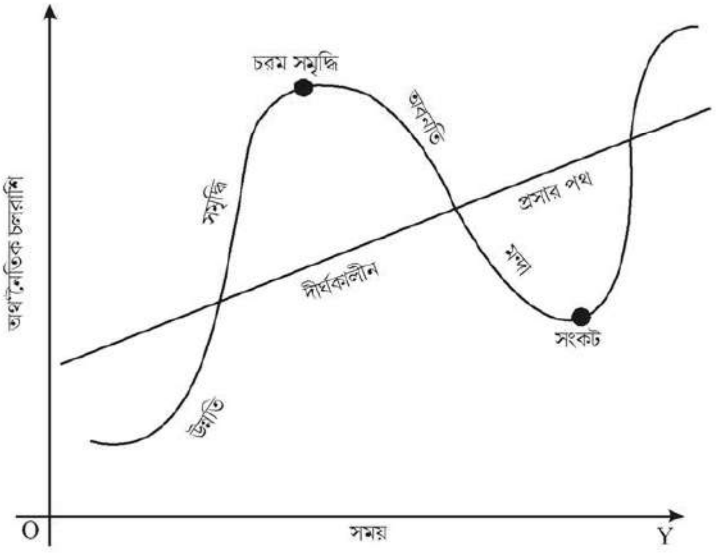

চিত্র ৮.১২

উন্নতি (Revival) : দীর্ঘমন্দার পর এক সময় নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের জোগান ফুরিয়ে যায়। তখন ফার্মগুলি বিনিয়োগের তাগিদ অনুভব করে। ফলে শ্রম নিয়োগ ও কার্যকরী চাহিদা বাড়বে। ফলে আয়স্তর বাড়তে থাকে। এভাবে দেশটিতে উন্নতি বা পুনরুন্নতি শুরু হয়।

সমৃদ্ধি (Prosperity) : কিছুদিন ধরে অর্থাৎ কয়েক বছর ধরে উন্নতি ঘটতে থাকলে অর্থনীতিতে আসে সমৃদ্ধি। শ্রম নিয়োগ বাড়ার ফলে মোট কার্যকরী চাহিদা বাড়ে। বিনিয়োগকারীরা তেজি বাজারের সম্মুখীন হয়। ফলে তারা ব্যাঙ্ক থেকে প্রচুর ঋণ নিয়ে বিনিয়োগ করে। মুনাফা, দামস্তর, চাহিদা, কর্মনিয়োগ

ইত্যাদি স্বাভাবিকের স্তর ছাড়িয়ে যায়।

অবনতি (Recession) : সমৃদ্ধির মধ্যেই অবনতির বীজ লুকিয়ে থাকে। সমৃদ্ধির সময়ে বিনিয়োগকারীরা অতিরিক্ত আশাবাদী হয়ে ওঠে। তারা বিভিন্ন সূত্র থেকে সম্পদ বা মূলধন সংগ্রহ করে অতিরিক্ত বিনিয়োগ করে ফেলে। বাড়তি উৎপন্নের জন্য বাড়তি ব্যয় অত্যধিক হয়ে পড়ে। ফলে ক্রেতারা অতিরিক্ত দামে কিনতে পারে না। অতি বিনিয়োগের ফলে উৎপন্ন বাড়তি দ্রব্যের মজুত বাড়তে থাকে। ফলে শ্রমিক নিয়োগ কমে। বেকারত্ব দেখা দিতে থাকে। এদিকে ব্যাঙ্কগুলি ঋণ পরিশোধের জন্য চাপ দিতে থাকে। ফলে উৎপাদকেরা দাম কমিয়ে দ্রব্য বিক্রি করতে চায়। কিন্তু ইতিমধ্যে নিয়োগ কমার ফলে দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বাড়ে না। অর্থনীতিতে অবনতি শুরু হয়।

মন্দা (Depression) : অবনতি বেশ কিছুদিন ধরে চললে অর্থনীতিতে মন্দা শুরু হয়। এসময়ে কার্যকরী চাহিদা, মুনাফা, দামস্তর ইত্যাদি খুবই কম থাকে। জিনিসপত্রের মজুত বাড়তে থাকে ও দামস্তর কমতে থাকে। কিন্তু বেকারির ফলে লোকের ক্রয়ক্ষমতা থাকে না। এই মন্দাবস্থা চলতে থাকে যতদিন না নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মজুত শেষ হয়। মজুত শেষ হয়ে গেলে ফার্মগুলি আবার বিনিয়োগের তাগিদ অনুভব করে। নিয়োগ ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। ফলে কার্যকরী চাহিদাও বাড়তে শুরু করে। এভাবে আবার পুনরুন্নতি শুরু হয়— বাণিজ্য চক্রের চক্রাকার আবর্তন চলতে থাকে।

বাণিজ্য চক্র নিয়ন্ত্রণ করতে হলে উর্ধ্বগতির সময় এক ধরনের পদ্ধতি এবং নিম্নগতির সময় তার বিপরীত পদ্ধতি গ্রহণ করতে হয়। উর্ধ্বগতি রোধ করতে হলে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য যে সমস্ত রাজস্ব ও আর্থিক পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয় সেগুলি গ্রহণ করতে হবে। আমরা ৮.১৩.৪ বিভাগে এটা আলোচনা করেছি। তেমনি, বাণিজ্য চক্রের নিম্নগতি বা মন্দাবস্থা দূর করতে হলে ঐ পদ্ধতিগুলিই বিপরীত ভাবে ব্যবহার করতে হবে।

৮.১৬ সারাংশ

১. জাতীয় আয় (National Income) : কোনো দেশের জনসাধারণ উৎপাদনের কাজে অংশ করে যে পরিমাণ দ্রব্য ও সেবাকার্য একটি নির্দিষ্ট বছরে উৎপাদন করে তার অর্থমূল্যের সমষ্টিকে জাতীয় আয় বলে।

২. জাতীয় আয়ের বিভিন্ন ধারণা (Different Concepts of National Income) : জাতীয় আয় সংশ্লিষ্ট প্রধান ধারণাগুলি হল : স্থূল জাতীয় উৎপাদন ও নিট জাতীয় উৎপাদন, স্থূল জাতীয় আয় ও নিট জাতীয় আয়, আর্থিক জাতীয় আয় ও প্রকৃত জাতীয় আয় এবং স্থূল অন্তর্দেশীয় উৎপাদন ও নিট অন্তর্দেশীয় উৎপাদন।

৩. জাতীয় আয়ের পরিমাপ (Measurement of National Income) : জাতীয় আয় পরিমাপের

তিনটি পদ্ধতি আছে। **(i) উৎপাদন শুমারি পদ্ধতি :** এতে শেষ উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকার্যের অর্থমূল্য যোগ করে জাতীয় নির্ধারণ করা হয়। **(ii) আয় শুমারি পদ্ধতি :** এই পদ্ধতিতে দেশের খাজনা, মজুরি, সুদ ও মুনাফা যোগ করে জাতীয় আয় পরিমাপ করা হয়। **(iii) ব্যয় পদ্ধতি :** এই পদ্ধতিতে দেশের মোট ভোগ ব্যয় এবং মোট বিনিয়োগ ব্যয় যোগ করে জাতীয় আয় নির্ধারণ করা হয়।

৪. **মূল্য সংযোজিত পদ্ধতি (Value Added Method) :** এই পদ্ধতিতে কোনো দ্রব্যের উৎপাদনের প্রতিটি স্তরে কতটা মূল্য সংযোজিত হচ্ছে তা যোগ করে ঐ দ্রব্যের শেষ উৎপন্ন মূল্য (Value of final product) নির্ণয় করা হয়। ঐ শেষ উৎপন্ন মূল্যগুলিকে যোগ করে জাতীয় আয় পাওয়া যায়। কোনো দ্রব্যের মূল্যের একাধিকবার গণনা পরিহার করতে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে।

৫. **আয়ের বৃত্তাকার প্রবাহ (Circular Flow of Income) :** কোনো অর্থনীতিতে একদিকে দ্রব্যের প্রবাহ এবং বিপরীত দিকে সমমূল্যের যে অর্থের প্রবাহ অনবরত চলতে থাকে তাকেই আয়ের বৃত্তাকার প্রবাহ বলে।

৬. **জাতীয় আয় পরিমাপের সমস্যাবলি (Problems of Measurement of National Income) :** জাতীয় আয় পরিমাপের প্রধান অসুবিধাগুলি হল : ধারণাগত বা তত্ত্বগত অসুবিধা, মূল্যায়নের সমস্যা, একাধিকবার গণনার সমস্যা, হস্তান্তর পাওনার সমস্যা, সঠিক পরিসংখ্যানের সমস্যা, নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহের সমস্যা প্রভৃতি।

৭. **ভোগ অপেক্ষক ও সঞ্চয় অপেক্ষক (Consumption Function and Saving Function) :** কেইন্‌স্‌-এর মতে, কোনো দেশের ভোগ ব্যয় এবং সঞ্চয়ের পরিমাণ সেই দেশের আয়ের স্তরের উপর নির্ভর করে। ভোগ ব্যয় এবং আয়স্তরের গাণিতিক সম্পর্ককে ভোগ অপেক্ষক বলে। তেমনি, সঞ্চয় এবং আয়স্তরের গাণিতিক সম্পর্ককে সঞ্চয় অপেক্ষক বলে।

৮. **ভোগ ব্যয় নির্ধারণকারী বিষয়সমূহ (Factors Affecting Consumption Expenditurte) :** ভোগ ব্যয় নির্ধারণকারী বিষয়গুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় : বস্তুগত বিষয়, মনোগত বিষয় এবং কাঠামোগত বিষয়। বস্তুগত বিষয়গুলির মধ্যে প্রধান হল তরল সম্পদের পরিমাণ, সুদের হার, ঋণের শর্তাবলি, বিজ্ঞাপন ব্যয় প্রভৃতি। মনোগত বিষয়গুলির মধ্যে প্রধান হল প্রদর্শন প্রভাব, আয় ও দাম সম্পর্কে প্রত্যাশা, জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি প্রভৃতি। কাঠামোগত বিষয়গুলির মধ্যে প্রধান হল আয়ের বণ্টন, জনসংখ্যার বয়সের বণ্টন, যৌথ মূলধনি প্রতিষ্ঠানের আর্থিক নীতি প্রভৃতি।

৯. **স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ ও উদ্ভূত বিনিয়োগ (Autonomous Investment and Induced Investment) :** যে বিনিয়োগ আয়ের স্তরের উপর নির্ভর করে না তাকে স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ বলে। অন্যদিকে, যে বিনিয়োগ আয়ের স্তরের উপর নির্ভর করে তাকে উদ্ভূত বিনিয়োগ বলে।

১০. ভোগ ও বিনিয়োগ ব্যয় দ্বারা ভারসাম্য আয় নির্ধারণ (Equilibrium Income Determination by Consumption and Investment) : কেইন্‌স্‌-এর সরল মডেলে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ধারিত হয় যেখানে মোট আয় এবং মোট কার্যকর চাহিদা সমান হয়। বদ্ধ অর্থনীতিতে কোনো সরকারি ব্যয় না থাকলে মোট কার্যকরী চাহিদা = C + I এবং মোট জোগান = জাতীয় আয় = Y। অতএব, ভারসাম্যর শর্ত হল : Y = C + I।

১১. সঞ্চয় ও বিনিয়োগ ব্যয় দ্বারা ভারসাম্য আয়স্তর নির্ধারণ (Determination of Equilibrium Income by Saving and Investment) : কেইন্‌স্‌-এর সরল মডেলে ভারসাম্য আয়স্তর নির্ধারিত হয় সেই বিন্দুতে যেখানে পরিকল্পিত সঞ্চয় (S) ও পরিকল্পিত বিনিয়োগ (I) পরস্পর সমান হয় অর্থাৎ ভারসাম্যর শর্ত হল : S = I

১২. বিনিয়োগ গুণক বা ভারসাম্য আয়ের উপর বিনিয়োগ বৃদ্ধির প্রভাব (Investment Multiplier or Effect of Increase in Investment on Equilibrium Income) : কেইন্‌স্‌-এর সরল আয় ও নিয়োগ তত্ত্বে স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ ব্যয় বাড়লে ভারসাম্য আয়স্তর বাড়ে। স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ ব্যয় এক একক বাড়লে আয়স্তর যত একক বাড়ে তাকেই বিনিয়োগ গুণক বলে। এই বিনিয়োগ গুণকের মান = $\frac{1}{1-MPC}=\frac{1}{MPS}$। MPC যত বড় হয় বা MPS যত ছোট হয়, বিনিয়োগ গুণকের মান তত বড় হয়।

১৩. অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব (Quantity Theory of Money) : অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের মূলকথা হল, পূর্ণ নিয়োগ অবস্থায় এবং টাকার প্রচলন বেগ যদি অপরিবর্তিত থাকে, তাহলে অর্থের জোগান যে হারে বাড়ে, দামস্তরও সেই হারে বাড়ে। দুটি সমীকরণের সাহায্যে এটি দেখা হয়। ফিশার-এর বিনিময় সমীকরণ MV = PT-তে বলা হয় যে, V ও T অপরিবর্তিত থাকলে M যে হারে বাড়ে, P বা দামস্তরও সেই হারে বাড়ে। আর কেম্ব্রিজ সমীকরণ বা নগদ ব্যালান্স সমীকরণে বলা হয়, K এবং Y স্থির থাকলে M যে হারে বাড়ে, P বা দামস্তরও সেই হারে বাড়ে। অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের অবশ্য নানা সীমাবদ্ধতা আছে।

১৪. মুদ্রাস্ফীতি : সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ (Inflation : Definition and Types) : মুদ্রাস্ফীতি হল একটি প্রক্রিয়া যার দ্বারা দেশের সাধারণ দামস্তরের ক্রমাগত বৃদ্ধি ঘটে। এটি একটি ভারসাম্যহীন অবস্থা। বিভিন্ন মাপকাঠিতে মুদ্রাস্ফীতির ভাগ করা হয়। কর্মসংস্থানের ভিত্তিতে মুদ্রাস্ফীতিকে পূর্ণ ও আধা-মুদ্রাস্ফীতি, দামস্তর বৃদ্ধির গতি অনুসারে মুদ্রাস্ফীতিতে মৃদু মুদ্রাস্ফীতি ও ধাবমান মুদ্রাস্ফীতি এবং কারণ অনুসারে মুদ্রাস্ফীতিকে চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি ও ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যখন পূর্ণ নিয়োগ অবস্থায় দ্রব্যসামগ্রীর জোগান বাড়ে না এবং চাহিদা বাড়ার দরুন দামস্তর বাড়তে থাকে সেই অবস্থাকে চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি বলে। অন্যদিকে, উৎপাদনের উপাদানের দাম বৃদ্ধির ফলে উৎপাদন ব্যয় বাড়ার দরুন দামস্তরের যে বৃদ্ধি ঘটে তাকে ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি বলে। বাস্তবে অবশ্য মুদ্রাস্ফীতির এরূপ বিভাজন করা সহজ নয়।

১৫. মুদ্রাস্ফীতির ফাঁক (Inflationary Gap) : পূর্ণ নিয়োগ অবস্থায় দ্রব্যসামগ্রীর মোট চাহিদা ও মোট জোগানের ব্যবধানকে মুদ্রাস্ফীতির ফাঁক বলা হয়।

১৬. মুদ্রাস্ফীতির কারণ ও ফলাফল (Causes and Effects of Inflation) : চাহিদার দিক থেকে মুদ্রাস্ফীতির কারণগুলি হল : জনসংখ্যা বৃদ্ধি, সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি, ঘাটতি অর্থ সংস্থান, কালো টাকা, ব্যাঙ্ক ঋণের প্রসার প্রভৃতি। জোগানের দিকে থেকে কারণগুলি হল : কৃষি উৎপাদনে অস্থিরতা, মজুতদারি, উপাদানের দাম বৃদ্ধি, প্রশাসনিক দাম বৃদ্ধি প্রভৃতি।

মুদ্রাস্ফীতির ফলাফল অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে এবং বিভিন্ন শ্রেণির লোকের উপর বিভিন্ন হয়। মুদ্রাস্ফীতির ফলে উৎপাদন বাড়ে এবং ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারলাভ করে। শেয়ারে বিনিয়োগকারী, বড় চাষি, মজুতদার ও কালোবাজারিরা মুদ্রাস্ফীতির ফলে লাভবান হয়। অন্যদিকে, ঋণপত্রে বিনিয়োগকারী, স্থির আয়ের ব্যক্তিবর্গ, ছোট চাষি এবং শ্রমিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মৃদু মুদ্রাস্ফীতি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহায়ক হলেও ধাবমান বা দ্রুত গতির মুদ্রাস্ফীতি দেশে উন্নয়নের পথে নানা সমস্যার সৃষ্টি করে।

১৭. মুদ্রাস্ফীতির নিয়ন্ত্রণ (Control of Inflation) : মুদ্রাস্ফীতির নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় : রাজস্ব পদ্ধতি, আর্থিক পদ্ধতি এবং প্রত্যক্ষ পদ্ধতি। রাজস্ব পদ্ধতিগুলির মধ্যে প্রধান হল : সরকারি ব্যয় হ্রাস, প্রত্যক্ষ কর বৃদ্ধি, হস্তান্তর আয় হ্রাস প্রভৃতি। আর্থিক পদ্ধতিগুলির মধ্যে প্রধান হল ব্যাঙ্ক রেট বৃদ্ধি, নগদ জামার অনুপাত বৃদ্ধি, খোলা বাজারে ঋণপত্র বিক্রি এবং কিছু নির্বাচনমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি। প্রত্যক্ষ পদ্ধতিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : ভোগ বরাদ্দ ব্যবস্থা, মজুত তালিকা প্রকাশ, দাম নিয়ন্ত্রণ, কালো টাকার নিয়ন্ত্রণ, বর্ধিত মজুরি বিলম্বে প্রদান প্রভৃতি।

১৮. ত্বরণ তত্ত্ব (Acceleration Principle) : ত্বরণ তত্ত্বের মূলকথা হল, কোনো নির্দিষ্ট সময়কালে বিনিয়োগের পরিমাণ দেশের আয় বৃদ্ধির বা চাহিদা বৃদ্ধির উপর নির্ভার করে : $I = v.\Delta Y$ যেখানে $I =$ বিনিয়োগ, v হল মূলধন-উৎপন্নের কাম্য অনুপাত এবং $\Delta Y =$ আয় বা চাহিদার পরিবর্তন। আয় পরিবর্তনের হার যত বেশি হবে, বিনিয়োগের হারও তত বেশি হবে।

১৯. বাণিজ্য চক্র ও তার বিভিন্ন পর্যায় বা স্তর (Trade Cycle and its Different Phases) : কোনো দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক কাজকর্ম, যেমন, আয়, নিয়োগ, দামস্তর প্রভৃতির ক্ষেত্রে নিয়মিত ও চক্রাকারে উত্থান-পতন ঘটে। একেই বাণিজ্য চক্র বলে। এর দুটি অংশ : উর্ধ্বগতি ও নিম্নগতি। উর্ধ্বগতির আবার দুটি স্তর : পুনরুন্নতি ও সমৃদ্ধি। নিম্নগতিরও দুটি স্তর : অবনতি ও মন্দা। সুতরাং, কোনো বাণিজ্য চক্রের পর্যায় বা স্তর চারটি : পুনরুন্নতি, সমৃদ্ধি, অবনতি ও মন্দা। সমৃদ্ধির সর্বোচ্চ বিন্দুকে বলা হয় চরম সমৃদ্ধি এবং মন্দার সর্বনিম্ন বিন্দুকে বলা হয় সংকট। রাজস্ব ও আর্থিক পদ্ধতির দ্বারা বাণিজ্য চক্রকে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।

৮.১৭ অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্নাবলি : প্রতিটি ২ নম্বরের (Short Answer Type Questions : Each of 2 Marks)

১. জাতীয় আয় কাকে বলে?

২. জাতীয় আয় পরিমাপের পদ্ধতি কয়টি ও কী কী?

৩. আয়ের বৃত্তাকার প্রবাহ কাকে বলে?

৪. স্থূল ও নিট জাতীয় উৎপাদন কাকে বলে?

৫. স্থূল ও নিট জাতীয় আয় বলতে কী বোঝেন?

৬. স্থূল জাতীয় উৎপাদন ও স্থূল অন্তর্দেশীয় উৎপাদন কাকে বলে?

৭. ভোগ অপেক্ষক কাকে বলে?

৮. গড় ভোগ প্রবণতা ও প্রান্তিক ভোগ প্রবণতার সংজ্ঞা দিন।

৯. মৌলিক মনস্তাত্ত্বিক নিয়ম কী?

১০. প্রদর্শন প্রভাব কাকে বলে?

১১. বিনিয়োগ গুণক কাকে বলে?

১২. প্রান্তিক ভোগ প্রবণতার সঙ্গে বিনিয়োগ গুণকের সম্পর্ক কীরূপ?

১৩. প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতার অঙ্কে বিনিয়োগ গুণককে প্রকাশ করুন।

১৪. অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব কাকে বলে?

১৫. ফিশার-এর বিনিময় সমীকরণটি লিখুন।

১৬. পরিমাণ তত্ত্বে কেম্ব্রিজ সমীকরণটির রূপটি লিখুন।

১৭. পূর্ণ মুদ্রাস্ফীতি কাকে বলে?

১৮. পূর্ণ মুদ্রাস্ফীতি ও আধা-মুদ্রাস্ফীতি বলতে কী বোঝেন?

১৯. চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির সংজ্ঞা দিন।

২০. স্থিতাবস্থায় মুদ্রাস্ফীতি বলতে কী বোঝেন?

২১. ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি কাকে বলে?

২২. মুদ্রাস্ফীতির ফাঁক কাকে বলে?

২৩. ত্বরণ তত্ত্বের মূলকথা কী?

২৪. বাণিজ্য চক্র কাকে বলে?

২৫. স্বয়ম্ভুত বিনিয়োগ কাকে বলে?

২৬. উদ্ভূত বিনিয়োগের সংজ্ঞা দিন।

২৭. কেইন্‌সীয় ছেদবিন্দু কাকে বলে?

মাঝারি দৈর্ঘ্যের উত্তরের প্রশ্নাবলি : প্রতিটি ৫ নম্বরের (Medium Answer Type Questions : Each of 5 Marks)

১. জাতীয় আয় পরিমাপের উৎপাদন পদ্ধতিটি ব্যাখ্যা করুন।

২. আয় পদ্ধতিতে আপনি জাতীয় আয় কীভাবে পরিমাপ করবেন?

৩. জাতীয় আয় পরিমাপ করার ব্যয় পদ্ধতিটি বর্ণনা করুন।

৪. মূল্য সংযোজিত পদ্ধতিটি সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৫. আয়ের বৃত্তাকার প্রবাহের ধারণাটি বুঝিয়ে বলুন।

৬. জাতীয় আয় পরিমাপের ক্ষেত্রে একাধিকবার গণনার সমস্যা বলতে কী বোঝেন? এই সমস্যা কী ভাবে এড়ানো যায়?

৭. জাতীয় আয় পরিমাপের প্রধান সমস্যাগুলি উল্লেখ করুন।

৮. ভোগ অপেক্ষকের বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করুন।

৯. ভোগ অপেক্ষক দেওয়া থাকলে আপনি সঞ্চয় অপেক্ষক কীভাবে আঁকবেন?

১০. বিনিয়োগ গুণকের কয়েকটি সীমাবদ্ধতা উল্লেখ করুন।

১১. ফিশার-এর বিনিময় সমীকরণটি ব্যাখ্যা করুন।

১২. কেম্ব্রিজ সমীকরণ নগদ ব্যালান্স সমীকরণটি বিশ্লেষণ করুন।

১৩. অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের কয়েকটি সীমাবদ্ধতা উল্লেখ করুন।

১৪. চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির ধারণাটি ব্যাখ্যা করুন।

১৫. ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির ধারণাটি বর্ণনা করুন।

১৬. কোনো দেশে মুদ্রাস্ফীতি কেন ঘটে?

১৭. মুদ্রাস্ফীতির ফাঁক ধারণাটি ব্যাখ্যা করুন।

১৮. ত্বরণ তত্ত্বের সীমাদ্ধতাগুলি উল্লেখ করুন।

১৯. মুদ্রাস্ফীতির ফলাফলগুলি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করুন।

২০. বাণিজ্য চক্রের বিভিন্ন স্তরগুলির বর্ণনা দিন।

২১. স্বয়ম্ভূত ও উদ্ভূত বিনিয়োগের পার্থক্য নির্দেশ করুন।

দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্নাবলি : প্রতিটি প্রশ্ন ১০ নম্বরের। (Long Answer Type Questions : Each of 10 Marks)

১. কোনো দেশের জাতীয় আয় পরিমাপের পদ্ধতিগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

২. কোনো দেশের ভোগ ব্যয় নির্ধারণকারী বিষয়সমূহ সংক্ষেপে উল্লেখ করুন।

৩. ভোগ ও বিনিয়োগ ব্যয় দ্বারা কীভাবে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ধারিত হয়?

৪. সঞ্চয়-বিনিয়োগের সমতার দ্বারা ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ধারণ করুন।

৫. বিনিয়োগ গুণক কাকে বলে? বিনিয়োগ গুণকের মান রেখাচিত্রের সাহায্যে নির্ণয় করুন।

৬. ভোগ অপেক্ষক কাকে বলে? ভোগ ব্যয় রেখা থেকে আপনি কীভাবে সঞ্চয় রেখা অঙ্কন করবেন?

৭. সমালোচনাসহ অর্থের পরিমাণতত্ত্ব বিশ্লেষণ করুন।

৮. মুদ্রাস্ফীতি কাকে বলে? মুদ্রাস্ফীতির ফলাফল সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

৯. মুদ্রাস্ফীতির সংজ্ঞা দিন। মুদ্রাস্ফীতি কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে?

১০. ত্বরণ তত্ত্বের মুলকথা কী? এই তত্ত্বের সীমাবদ্ধতাগুলি উল্লেখ করো।

১১. বাণিজ্য চক্র কাকে বলে? এর বিভিন্ন পর্যায় বা স্তরের বর্ণনা দিন।

১২. চিত্র সহযোগে চাহিদা বৃদ্ধিজনিত ও ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি ব্যাখ্যা করুন।

৮.১৮ নির্বাচিত গ্রন্থতালিকা

১. Sarkhel, Jaydeb (2017) : Macroeconomic Theory, Book Syndicate Pvt. Ltd.

২. Sarkhel, Jaydeb & Seikh Salim (2010) : Economic Principles and Indian Economic Problems, Book Syndicate Private Ltd.

৩. Shapiro, E. (1984) : Macroeconomic Analysis, Harcourt Brace

৪. Rowan, D.C. (1983) : Output, Inflation and Growth, Macmillan

৫. Mankiw, N. G. (2004) : Macroeconomics, Worth Publishers

৬. Ahuja, H. L. (1979) : Advanced Economic Theory, S. Chand & Co.